বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের কথা

* * *

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

'সাহিত্য-পরিক্রমা', 'কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন' প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক

* * *

এ, মুখার্জ্জি এ্যাণ্ড কোম্পানী

২, কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা

ভূমিকা

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে 'বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের কথা'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়াছিল। কিন্তু কাগজ সংগৃহীত না হওয়ার দরুণ এবং দেশের অনিশ্চিত পরিস্থিতির দরুণ গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণ এতাবৎকালের মধ্যে সম্ভবপর হয় নাই। এক্ষণে গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিতরূপে প্রকাশিত হইল। ইহার মধ্যে বহু নূতন পরিচ্ছেদ সংযোজিত করিয়াছি এবং পুরাতন পরিচ্ছেদের অধিকাংশই পুনর্লিখিত হইয়া ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং প্রথম সংস্করণ হইতে বর্ত্তমান নূতন সংস্করণখানি সম্পূর্ণ পৃথক একটি গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থখানির উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে করি।

বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্মেষকাল বৌদ্ধগান ও দোঁহার রচনাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাটি এই গ্রন্থে বিশ্লেষিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙ্গলা কাব্যের স্বরূপও এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে নির্ণীত হইয়াছে।

বৌদ্ধগান ও দোঁহার পরবর্ত্তীকালীন বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসকে মোটামুটি-ভাবে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন—পদাবলী সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, মঙ্গল কাব্য, অনুবাদ-সাহিত্য এবং পল্লী-গীতিকা। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের উল্লিখিত প্রত্যেক বিভাগের দুই-চারিজন করিয়া কবির জীবনী ও তাঁহাদের কাব্যের পরিচয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং তৎসহ বৈষ্ণব সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ-সাহিত্য ও পল্লী-গীতিকা প্রভৃতির বিশেষত্ব, মাধুর্য্য, রসবস্তু ইত্যাদিও এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও পরিণতিসাধনে মুসলমান কবিদিগের দান এবং বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক যুগের যুগসন্ধিকালে আবির্ভূত কবির গান, পাঁচালী গান ও টপ্পা গান রচয়িতাদিগের দানও উপেক্ষা করিবার নহে। সুতরাং সে সকল বিষয়ও এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের আধুনিক যুগের উন্মেষে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুইটি প্রধান ধারা প্রবাহিত ছিল—অর্থাৎ মহাকাব্য রচনার ধারা এবং গীতি-কবিতা রচনার ধারা—তাহাও বিশদভাবে আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থে দেখান হইয়াছে। মহাকাব্য রচয়িতা কবি মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং সেই সঙ্গে গীতিকবি বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আলোচনা সবই এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।

প্রয়োজনমত কবিদিগের তুলনামূলক আলোচনাও এই গ্রন্থে করিয়াছি। গ্রন্থখানিতে বিচ্ছিন্নভাবে মাঝে মাঝে কবিদিগের কাব্যের আলোচনা থাকিলেও উহাদের মধ্যে একটা সংযোগসূত্র রাখিবার চেষ্টা সর্ব্বত্রই আছে। সুতরাং ইহা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গের বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একটা সমগ্র উপলব্ধি হইবে বলিয়াই আশা করি।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সমস্তটাই কাব্য এবং এই গ্রন্থে কাব্য-সাহিত্যের বিশদ ও ধারাবাহিক আলোচনা করায় ইহা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ধারণাই জন্মাইয়া দিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করি। আর আধুনিক যুগে কাব্যের উন্মেষ ও বিকাশের ধারাটিও এই গ্রন্থপাঠে অনুসরণ করিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার চেষ্টা অনেকেই করিয়াছেন। কিন্তু স্বল্প-পরিসরের মধ্যে সাহিত্যের ইতিহাস ও তৎসহ সাহিত্যের রসবস্তুর বিচার-বিশ্লেষণের নিমিত্তই আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস। গ্রন্থখানি বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগীদিগের নিকট সমাদৃত হইলে সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

জন্মাষ্টমী, ১৩৫৪ কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের কথা

বাঙ্গলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

সাহিত্যের গতি নদীর স্রোতের মত। নদী যেমন সম্মুখের দিকে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে বাঁক ফেরে,—সাহিত্যও তেমনি বরাবর সোজা চলে না। সেও নদীর মত মাঝে মাঝে বাঁক ফেরার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ রকমের বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। নূতন বিশিষ্টতায়, নূতন রূপে রূপায়িত হইয়া উঠিবার জন্য নদীর যেমন বাঁক ফেরা—সাহিত্যের বাঁক ফেরার প্রয়োজনও সেইরূপ পুরাতন রূপ বর্জ্জন করিয়া নূতন বিশিষ্টতায় এবং রূপে রূপায়িত হইয়া উঠিবার জন্য।

বাঙ্গলা সাহিত্য বর্ত্তমানে যে সমৃদ্ধি এবং বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে, তাহা ইহার একঘেয়ে বা একটানা গতির ফল নহে। বিভিন্ন যুগে এ সাহিত্য নদীস্রোতের মতই বাঁক ফিরিয়া ফিরিয়া বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিয়াছে, নব নব বিচিত্রতা লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের এই প্রগতির ইতিহাসের যুগবিভাগ করিলে ইহাকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—প্রাচীন যুগ (খ্রীষ্টীয় ৯৫০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দ); মধ্যযুগ (১২০০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ); আধুনিক যুগ (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে)। সাহিত্যের গতি, প্রকৃতি এবং বিশেষত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগকে কয়েকটি উপবিভাগেও ভাগ করা যায়।

মধ্যযুগ—(১২০০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ)

(ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগের যুগসন্ধিকাল (১২০০-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ)

(খ) প্রাক্‌চৈতন্য যুগ বা আদি মধ্যযুগ (১৩০০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ)

(গ) পরচৈতন্য যুগ বা অন্ত্যমধ্যযুগ (১৫০০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ)

আধুনিক যুগ—

(ক) মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের যুগসন্ধিকাল—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ;

(খ) আধুনিক যুগ—১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রবীন্দ্রোত্তর যুগ পর্য্যন্ত।

খ্রীষ্টীয় দশম হইতে ত্রয়োদশ শতক বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ। এই দশম শতক হইতে সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল, একথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি দশম শতকের বহু পূর্ব্বেই হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রাচীন শিলালিপিতে এবং সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্ব প্রভৃতিতে বাঙ্গলা শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হইয়া থাকে। উহা বাঙ্গলা ভাষার উদ্‌ভবের সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু দশম শতকের পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষা সাহিত্যের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল কি না সেকথা জানা যায় নাই,—ব্যবহৃত হইয়া থাকিলেও তাহার কোন নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয় নাই।

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ—অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৯৫০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের চর্য্যাপদসমূহ রচিত হয়। চর্য্যাপদসমূহ বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীত। সিদ্ধাচার্য্যগণের এই সঙ্গীতগুলিই বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

কিন্তু চর্য্যাপদ প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন নহে। চর্য্যা-গীতিসমূহ রচনার সমসাময়িক কালেই এই বঙ্গদেশে যে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতিকবিতা রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহা এই—

ছাড়ু ছাড়ু মইঁ জাইবোঁ গোবিন্দ সহ খেলণ...
নারায়ণ জগহকেরু গোঁসাঈ...

[ছাড়, ছাড়, আমি গোবিন্দের সহিত খেলিতে যাইব। নারায়ণ জগতের গোঁসাই।]

উল্লিখিত পদটি খণ্ডিত। কিন্তু ইহার ভাষা যে প্রাচীনতম বাঙ্গলা ভাষার নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। চর্য্যাপদরচনার সমসাময়িক কালে এইরূপ রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী আরও অনেক রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু সে সকল বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছে। তাহাদের পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি কালগ্রাসে পতিত হইয়া বিলীন হইয়াছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে চর্য্যাপদ এবং রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী ভিন্ন বিষ্ণুর দশাবতারস্তোত্রের যৎসামান্য একটি টুকরাও পাওয়া গিয়াছে। তাহা এই—

জে ব্রাহ্মণের কুলেঁ উপজিআঁ কীতবীৰা জেণেঁ বাহুফরসে খণ্ডিআ পরশরামু দেউ শে মোহর মঙ্গল করউ।

[যিনি ব্রাহ্মণের কুলে জন্মিয়াছিলেন, কীর্ত্তিবীর্য্য যাঁহার দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছিলেন, সেই পরশুরাম আমার মঙ্গল করুন।]

চর্য্যাপদের সহিত উল্লিখিত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদের এবং বিষ্ণুর দশাবতার-স্তোত্রের এই পদটির ভাষাগত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।

প্রাচীনতম বাঙ্গলা সাহিত্যের উল্লিখিত দৃষ্টান্ত ভিন্ন গোপীচাঁদের গানের পালা, ধর্ম্মমঙ্গলের লাউসেনের কাহিনী, লক্ষীন্দর বেহুলার কাহিনী প্রভৃতি হয় ত এই যুগেই ছড়া পাঁচালীর আকারে লোকমুখে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই সকল কাহিনী এ যুগে লিপিবদ্ধ হয় নাই—হইয়া থাকিলেও উহাদের কোন নিদর্শন অদ্যাপি আমাদের হস্তগত হয় নাই।

খ্রীষ্টীয় ১২০০-১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ বাঙ্গলা সাহিত্যের এক যুগসন্ধিকাল। এই যুগে ভারতবর্ষে তুর্কী আক্রমণ সুরু হয়। ইহার স্রোত বাঙ্গলা দেশেও আসিয়া লাগিয়াছিল। ফলে বাঙ্গলার সাহিত্যসৃষ্টির মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছিল। দেশে তখন শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না। এই কারণে এই যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন নিদর্শনই আমাদিগের হস্তগত হয় নাই।

চতুর্দ্দশ শতকের মধ্যভাগে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সুলতানের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া বাঙ্গলায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময় হইতে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়, সাহিত্য-সৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, দেশে জ্ঞান, বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চ্চার সূত্রপাত হয়।

এই যুগটিকে (১৩০০-১৫০০) প্রাক্‌চৈতন্য যুগ নামে অভিহিত করা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার আবির্ভাবের পরে, তাঁহার লোকোত্তর জীবনের প্রভাবে বাঙ্গলা সাহিত্য এক নূতন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রাক্কালে—খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতকে বাঙ্গলা সাহিত্যে যে সকল কাব্যাদি রচিত হইয়াছিল তাহার গুরুত্বও কম নহে।

এই যুগে গৌড়ের মুসলমান সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বহুনিন্দিত 'ভাষা' গৌড়ের মুসলমান সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এই যুগে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। প্রাকৃত বাঙ্গলা এই যুগে আপন মহিমায় ও মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ, তৎপুত্র নসীরুদ্দীন নসরৎ শাহ, নসরৎ শাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফীরুজ শাহ ইঁহারা সকলেই বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং ইঁহাদের প্রত্যেকের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্য পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের সেনাপতি লস্কর পরাগল খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইনি এবং ইঁহার পুত্র ছুটি খাঁ উভয়েই বাঙ্গলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায়ও বাঙ্গলা সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

চণ্ডীদাস এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের এই চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাস নামে খ্যাত। বঙ্গ-সাহিত্যে চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যিনি প্রাক্ চৈতন্যযুগে আবির্ভূত হন, তিনিই বড়ু চণ্ডীদাস নামে পরিচিত। এই বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত একখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে—তাহার নাম "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন"। "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" ভিন্ন বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত কতকগুলি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলীই বাঙ্গলা গীতিকবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন।' গীতিকবিতার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব, যে অনাবিল সুর এবং কবির একান্ত আত্মগত আবেগ থাকে—সে সকলই আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পাই।

চণ্ডীদাসের পরেই রামায়ণের কবি কৃত্তিবাসের নাম করিতে হয়। কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করেন। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ হইলেও ইহাতে মৌলিক কল্পনা এবং বর্ণনা ছিল।

চণ্ডীদাস এবং কৃত্তিবাস ভিন্ন এই যুগে মালাধর বসু নামে এক কবির আবির্ভাব হয়। মালাধর বসুর বাস ছিল বর্দ্ধমানের কুলীন গ্রামে। কবির উপাধি ছিল গুণরাজ খান—গৌড়েশ্বর সামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের নিকট হইতে ইনি এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যতদুর জানা গিয়াছে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য কৃষ্ণলীলাবিষয়ক প্রথম বাঙ্গলা কাব্য এবং সমগ্র বাঙ্গলা সাহিত্যে সন-তারিখযুক্ত প্রথম গ্রন্থ। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে কবিগণ শুধুমাত্র নিজেদের ভণিতাটুকু উল্লেখ করিয়া কবিতা বা কাব্যের উপর তাঁহাদের অধিকারটুকু বজায় রাখিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের কাব্য রচনার কাল অথবা তাঁহাদের জীবনকথা এক প্রকার গোপনই রাখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে দেখা যায় যে কবি বলিতেছেন—

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে গ্রন্থ সমাপন ॥

এই যুগে শ্রীখণ্ড নিবাসী যশোরাজ খান নামেও এক কবি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবি যশোরাজ খানও গৌড়ের সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার একটি পদে হুসেন শাহের প্রশংসা করিতেছেন—

শ্রীযুত হুসন জগত-ভূষণ সোহ এরস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভণে যশোরাজ খান ॥

এই যুগে বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বা বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী রচিত হয়। সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী নামে তিন জন কবি এই যুগেই মহাভারতের অনুবাদ করেন।

এই যুগে আবির্ভূত কবিদিগের মধ্যে একমাত্র চণ্ডীদাসে মৌলিক সৃজনী-প্রতিভা লক্ষিত হইয়া থাকে। বিজয় গুপ্ত লৌকিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। মালাধর বসু, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি অনুবাদকাব্য রচনা করেন।

ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইলে অনুবাদের প্রয়োজন আছে। সেইজন্য প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সাহিত্যের প্রথম যুগে মৌলিক রচনা অপেক্ষা অনুবাদই প্রাধান্য লাভ করে। বাঙ্গলা সাহিত্যের বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। স্বাধীন সৃজনী-প্রতিভা অপেক্ষা অনুবাদ এবং অনুকরণের মধ্য দিয়াই প্রাক্‌চৈতন্যযুগের বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের বিকাশ লাভ হইয়াছিল।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছিল। বাঙ্গলা সাহিত্য এই যুগে সকল প্রকার গতানুগতিকতা হইতে মুক্ত হইয়া, সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হইয়াছিল। নদীতে জোয়ার আসিলে যেমন তাহার দুই কূল প্লাবিত হইয়া যায়—চৈতন্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের গতিবেগও তদ্রূপ সাহিত্যের ক্ষীণ ধারাটিকে স্ফীত করিয়া তুলিয়া সকলকে স্তব্ধ ও বিস্মিত করিয়া দিল। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে এলিজাবেথীয় যুগ যে গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া আছে, বাঙ্গলা সাহিত্যে চৈতন্যযুগও তদ্রূপ। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাঙ্গলায়

এক অভিনব ভক্তিধারার প্লাবন আনিয়াছিল, সেই ভক্তিরসে দীক্ষিত হইয়া এ যুগের কবিগণ কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

জীবনচরিত-সাহিত্য এ যুগের অন্যতম সৃষ্টি। শ্রীচৈতন্যদেবের এবং তাঁহার পার্ষদগণের জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া এই যুগে কয়েকখানি জীবনী কাব্য রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে গোবিন্দ দাসের কড়চা, জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত—এই কয়খানি কাব্যে চৈতন্যদেবের অলৌকিক জীবন-কাহিনী নানাভাবে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে। 'গোবিন্দদাসের কড়চা' গোবিন্দদাস কর্ম্মকার নামক শ্রীচৈতন্যদেবের জনৈক সহচর কর্ত্তৃক রচিত। ইহার ভাষা ও বর্ণনা সরল ও সুন্দর। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বহু ঐতিহাসিক তথ্য আছে। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ভাগবতের আদর্শে রচিত। লোচনদাস পদকর্ত্তা কবি ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার রচিত "চৈতন্যমঙ্গল"-খানিতে কল্পনার আতিশয্য ঘটিয়াছে; শ্রীচৈতন্য-দেবের জীবনচরিত দেবলীলায় পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতে একাধারে জীবন চরিত, বৈষ্ণব দর্শন এবং ভক্তিতত্ত্ব সরল ভাষায় বর্ণিত। গ্রন্থখানি অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। চৈতন্যদেবের পার্ষদ ভক্তদিগের জীবন-চরিতও এই যুগে রচিত হইয়াছিল। ভক্তি রত্নাকর, প্রেমবিলাস, অদ্বৈত প্রকাশ প্রভৃতি চরিত-কাব্যে চৈতন্যদেবের পার্ষদ ভক্তদের জীবনী লিখিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল ইহার পদাবলী সাহিত্য। সেই পদাবলীসাহিত্য এই যুগে বিশেষ সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইয়াছিল। চৈতন্য-পূর্ব্বযুগেও বাঙ্গলা পদাবলী ছিল। কিন্তু মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত প্রেম ও ভক্তিধর্ম্ম এই পদাবলীসাহিত্যকে যেন নূতন মন্ত্রে, নূতন সুরে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছিল। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতি বহু পদকর্ত্তার দ্বারা এযুগের পদাবলী সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পদাবলী-সংগ্রহ সাহিত্যও এই যুগের অন্যতম সাহিত্য সম্পদ। আউল মনোহর দাসের সঙ্কলিত 'পদসমুদ্র', শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র', বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি পদাবলী-সংগ্রহ বিখ্যাত।

মঙ্গল-কাব্যগুলিও এই যুগে বৈষ্ণব পদাবলীর পাশাপাশি গড়িয়া উঠিতেছিল। ধর্ম্মঠাকুরের সেবক লাউসেনের কাহিনী অবলম্বন করিয়া

কয়েকখানি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রচিত, খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল ষোড়শ শতকে রচিত, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে রচিত এবং রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ বা ধর্ম্মপূজা-পদ্ধতি ষোড়শ শতকের রচনা।

কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও শ্রীমন্ত সওদাগরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও এই যুগের রচনা। যে সকল চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। মাধবাচার্য্য মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী—কিন্তু মাধবাচার্য্যের কাব্যে যাহা অস্পষ্ট হইয়াছে বা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই, কবিকঙ্কণের কাব্যে তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কবিকঙ্কণের বর্ণনা সুন্দর এবং স্বাভাবিক, বিশেষত দুঃখের বর্ণনায় এবং বাস্তব চিত্র অঙ্কনে তাঁহার ন্যায় কোন অধিকতর দক্ষ শিল্পী মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন নাই।

কয়েকখানি রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদও এই যুগে হয়। এই যুগের রামায়ণ রচয়িতাদিগের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—কবিচন্দ্র, জগৎরাম ও রামপ্রসাদ বন্দ্য, শিবচন্দ্র সেন প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে কোন কোন কবি সমগ্র রামায়ণের, কোন কবি রামায়ণ সংক্ষিপ্ত করিয়া অথবা উহার কাহিনীবিশেষ বর্ণনা করিয়া কাব্য রচনা করেন। চন্দ্রাবতী নামে জনৈকা মহিলা কবির রামায়ণও এই যুগেই রচিত হয়।

মহাভারতের অনুবাদকদিগের মধ্যে রামায়ণের কবি কবিচন্দ্র এবং ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস প্রভৃতি কবির নাম করিতে হয়। কাশীরাম দাসের মহাভারতও এই যুগের রচনা।

এই সকল কবির সমবেত চেষ্টায় বাঙ্গলা অনুবাদ-সাহিত্য পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। আলাওল নামে এক মুসলমান কবির রচনার দ্বারাও এ যুগের অনুবাদ সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল। আলাওল রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবি ছিলেন। এই কবির রচিত রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক পদাবলীও পাওয়া গিয়াছে। সেই পদাবলী ভাবের গভীরতায়, অনুভূতির প্রগাঢ়তায় এবং বর্ণনার চাতুর্য্যে অপরূপ মাধুর্য্যমণ্ডিত।

এই যুগে বাঙ্গলা সাহিত্যের আর একটি ধারা লোকচক্ষুর অন্তরালে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল—বাঙ্গলার লোকসাহিত্যের এক চমৎকার বিকাশ

এই যুগেই ঘটিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের গীতিকা এ যুগের অনুপম সৃষ্টি ও উজ্জ্বল কীর্ত্তি। 'ময়মনসিংহ গীতিকা' এই লোকসাহিত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন।

অন্ত্য-মধ্যযুগের যে সকল কবির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শাক্ত পদাবলী রচয়িতা রামপ্রসাদের নাম এবং অন্নদামঙ্গল রচয়িতা ভারতচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামপ্রসাদ কাব্য রচনা করিয়াছেন—তাঁহার 'কালিকামঙ্গল' বিখ্যাত কাব্য; তিনি শ্যামাসঙ্গীতের আদি কবি, আগমনী গানের ও বিজয়াগানের আদি কবি। রামপ্রসাদের খ্যাতি তাঁহার কাব্যের উৎকর্ষের জন্য নহে, তাঁহার কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভক্তিবিষয়ক সঙ্গীতগুলি—শ্যামা-সঙ্গীত, আগমনী গান ও বিজয়াগান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' মঙ্গলকাব্য জাতীয় কাব্য। ইহা তিনটি কাব্যের সমষ্টি—অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর। ভারতচন্দ্র খণ্ড কবিতা রচনা করেন, সত্যনারায়ণের একখানি পাঁচালী রচনা করেন। তাঁহার রচনা অলঙ্কারবহুল এবং রচনার অন্যতম গুণ ভাষা ও ছন্দের মাধুর্য্য। তাঁহার রচনায় খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের সহিত সংস্কৃত এবং আরবী পারশী শব্দের যেন একটা হরগৌরীমিলন হইয়া গিয়াছে। ভারতচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ ছন্দকুশল কবি। নানাবিধ সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গলায় প্রবর্ত্তিত করিয়া তিনি বাঙ্গলা কাব্যের ছন্দসম্ভার বাড়াইয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের 'কালিকামঙ্গলে'র অন্তর্গত গানগুলি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার নিদর্শন।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা অনুশীলন করিলে কতকগুলি বিশেষত্ব চোখে পড়ে।

প্রথমতঃ, এই যুগের সাহিত্য শুধুমাত্র পদ্যসাহিত্য। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্য অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে যে, সকল সমাজের সাহিত্যই প্রথমে পদ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—গদ্য চিন্তা ও যুক্তির পরিণতির সঙ্গে উদ্ভূত হয়। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল, তেমনি সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দতরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল।" বাঙ্গলা সাহিত্যেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। কারণ, মানুষ আগে অনুভব করিতে শিক্ষা করে, পরে সে চিন্তা করিতে শিক্ষা করে। পদ্য অনুভবের ভাষা,—অনুভূতির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দে গানে উহা উৎসারিত হয়। গদ্য চিন্তা ও যুক্তির ভাষা—তাই দেখি

বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্যসাহিত্যের উন্মেষ চিন্তা ও যুক্তির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালেই হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ, এই যুগের সাহিত্যের বিষয়বস্তু অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং গতানুগতিকতা এযুগের সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ। ইউরোপীয় কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সেখানে কবিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শে কাব্য রচনা করিয়াছেন—একজন কবির কল্পনা যে বিষয়কে অবলম্বন করিয়া পল্লবিত হইয়াছে, বা একজন কবির কল্পনা যে পথে গিয়াছে, অন্য এক পরবর্ত্তী কবির কল্পনা সেই পথ অনুসরণ করে নাই। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের বিষয়বস্তু গতানুগতিকতা-দোষে দুষ্ট। লৌকিক ধর্ম্মসাহিত্য—মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি, অনুবাদ, জীবনচরিতসাহিত্য এবং পদাবলীসাহিত্য—এই কয়টির মধ্য দিয়াই কবিগণের কবিপ্রতিভার বিকাশ-লাভ হইয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য রচয়িতা বহু কবি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এক কবির পর আর এক কবি—এইরূপে বহু কবি মিলিয়া একই মঙ্গলকাব্যের কাহিনীকে পল্লবিত করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অনুবাদ গ্রন্থগুলিরও বহু কবি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী বহু কবি কর্ত্তৃক বিভিন্ন-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কেবল বড় বড় কাব্যগুলির রচনায় এই অনুকরণবৃত্তি লক্ষিত হয় না। কাব্যের অংশ রচনায়ও অনুকরণপ্রিয়তা লক্ষিত হয়। পদাবলী সাহিত্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া বর্ণিত হইলেও এবং বহু কবি কর্ত্তৃক এই প্রেমলীলা বর্ণিত হইলেও, একথা বলিতে হয় যে, একমাত্র বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়া প্রাচীন কবিদিগের সৃজনীপ্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিষয় এক হইলেও বিভিন্ন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমের লীলাবৈচিত্র্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাই দেখি, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া—কেহ বা দুঃখের কবি, কেহ বা সুখের কবি, বসন্তের কবি। কেহ বা উপমা দ্বারা রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি ও প্রেমলীলাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কেহ বা সহজভাবে, সরল কথায় ছবিটি ফুটাইয়াছেন। কাহারও পদাবলীতে আনন্দের লীলাচাঞ্চল্য, কাহারও পদাবলী বেদনায় সমুজ্জ্বল, দুঃখে মহীয়ান্—নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যেও বিচ্ছেদের আশঙ্কায় পরিপূর্ণ। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে যথার্থই বলিয়াছেন—"প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র

বৈষ্ণব পদে স্বাধীনতার বায়ু খেলা করিয়াছে। অন্য সকল কাব্যরচনায়ই এক কবি অন্য কবির প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করিয়া অগ্রসর হন নাই।"

তৃতীয়তঃ, এই যুগে কবিদিগের জীবনী এবং কাল সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ অতি সামান্যমাত্রই জানা যায়।

খ্রীষ্টীয় ১৮০০-১৮২৫ সাল বাঙ্গলা সাহিত্যের এক যুগসন্ধিকাল। এই যুগে কবিওয়ালাদিগের গান, পাঁচালীগান, টপ্পাগান প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। বিবিধ যাত্রার পালাও এই যুগে রচিত হয়। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে রাম বসু, আজু গোঁসাই, এণ্টনী ফিরিঙ্গি, হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, রাম্সু, নৃসিংহ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

টপ্পারচয়িতাদিগের মধ্যে রামনিধি গুপ্ত, পাঁচালীকারদিগের মধ্যে দাশরথি রায়ের, এবং যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে গোপাল উড়ের নাম বিশেষ বিখ্যাত। ইঁহাদের কবিতার মধ্যে মাঝে মাঝে কবিত্ব ও কল্পনার স্ফুরণ দেখা গেলেও, কবির গান রচয়িতা কিংবা টপ্পা ও পাঁচালীগান রচয়িতা-দিগকে প্রথম শ্রেণীর কবিমর্য্যাদা দান করা যায় না। কারণ, এই যুগে আবির্ভূত কোন কবির কবিতায় ভাবের গাঢ়তা বা গঠনের পারিপাট্য ছিল না। উপরন্তু উহাদের অধিকাংশই হয় অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট অথবা অনুপ্রাস-বহুল ছিল। কবির গান রচয়িতাদিগের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। যে কারণে কবির গানের মধ্য দিয়া উচ্চাঙ্গের কবিত্বরস কিংবা কল্পনাবিলাস প্রকাশ পায় নাই, রবীন্দ্রনাথ তাহার বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"পূর্ব্বকালের গানগুলি হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত—সুতরাং স্বতঃই কবির আদর্শ সেখানে অত্যন্ত দুরূহ ছিল। সেইজন্য রচনার কোন অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না। তার ভাব, ছন্দ রাগিণী, সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং নৈপুণ্য ছিল। তখন কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতৃগণের শ্রবণ করিবার অব্যাহত অবসর ছিল। তখন গুণিসভায় গুণাকর কবির গুণপনা-প্রকাশ সার্থক হইত।

"কিন্তু ইংরাজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্ব্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনায় অবসর,

যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্ম্মক্লান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদ-উত্তেজনা চাহিত। তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি শুধু কবির গান রচয়িতাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কবির গান, টপ্পা এবং পাঁচালী গান রচয়িতা—সকলের সম্বন্ধেই একথা খাটে। কারণ এযুগের সকল গীতিরচয়িতাই জনসাধারণের চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত রচনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই সকল গীতির মধ্যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরস উৎসারিত হয় নাই।

বাঙ্গলা সাহিত্যের এই যুগসন্ধিকালের অবসানে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১১-১৮৫৮) কবি-প্রতিভার বিকাশ হয়। গুপ্তকবির মধ্যেই আধুনিকতার উন্মেষ দেখা গিয়াছিল। গুপ্ত কবির মধ্যে যুগসন্ধিকালের কবিওয়ালা, টপ্পাগানরচয়িতা প্রভৃতিদিগের প্রভাব ছিল—তাঁহাদের মতই ইঁহার কবিতায় শব্দাড়ম্বর এবং যমকানুপ্রাসের বাহুল্য। আবার আধুনিকতার উপকরণও তাঁহার কাব্যে বর্ত্তমান।

গুপ্ত কবিতে যে আধুনিকতার উন্মেষ, তাহা রঙ্গলাল, মাইকেল, হেম, নবীন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিতে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। রঙ্গলাল, মাইকেল, হেম, নবীন প্রভৃতি যে যুগে আবির্ভূত হন, সেই যুগে আমরা আখ্যায়িকামূলক কাব্যরচনার এবং মহাকাব্যরচনার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি। ইঁহারা সকলেই আখ্যায়িকামূলক কাব্য অথবা মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, খণ্ডকবিতাও রচনা করিয়াছেন। প্রচ্ছন্ন গীতিকবিতার সুর ইঁহাদের মহাকাব্য ও আখ্যায়িকামূলক কাব্যের মধ্য দিয়া বাজিয়াছে। ঠিক এই যুগেই খাঁটি গীতিকবিতার সুরটিকে লালন করিয়া কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী প্রকাশ করেন। এই যুগে মহাকাব্যে ও উপাখ্যানকাব্যে যে প্রচ্ছন্ন গীতিকবিতার সুর অনুরণিত হইতেছিল তাহাই আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া বিহারীলালের মধ্য দিয়া পূর্ণপরিণতভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। সেই সুর রবীন্দ্রনাথকে কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিল—রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রোত্তর কবিগণের গীতি-কবিতার বেণুবীণানিক্কণে বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্য প্লাবিত হইয়া গেল।

বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন

বৌদ্ধগান ও দোঁহা

ধর্ম্মবিষয়কে অবলম্বন করিয়াই সকল দেশের সাহিত্যের উন্মেষ হইয়াছে। ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়াই সাহিত্যের উদ্ভব এবং পরিপুষ্টি। সেইজন্য সাহিত্যের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া জার্ম্মান দার্শনিক ফিকটে (Fichte) বলিয়াছেন—"Literature is the expression of a religious idea." বাঙ্গলা সাহিত্যের বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের সাধনতত্ত্বজ্ঞাপক চর্য্যাপদগুলিই বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এগুলি খ্রীষ্টীয় ৯৫০-১২০০-র মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

নেপালের রাজদরবারের পুঁথিশালায় এই গীতিগুলি অলক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঐ পুঁথিশালা হইতে এই গানগুলি আবিষ্কার করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে "হাজার বছরের পুরান বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা" এই নামে উহা প্রকাশ করেন। প্রাচীনতম বাঙ্গলা সাহিত্যের এই আবিষ্কার শাস্ত্রী মহাশয়কে অমর করিয়া রাখিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত বৌদ্ধগানের মুখপত্রে এই গীতিসমষ্টির নামকরণ করিয়াছেন "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়"। কিন্তু "চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়" নামটি অশুদ্ধ। গীতিগুলির সংলগ্ন যে বিশদ টীকা পাওয়া গিয়াছে, সেই টীকাকারের মতে এই পদ-সংগ্রহের নাম "আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়"। সুতরাং "আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়" এই নামটিকেই শুদ্ধ বলিয়া ধরিতে হইবে।

চর্য্যার ভাষা বাঙ্গলা। চর্য্যাপদে ষষ্ঠী বিভক্তিতে -এর,-অর বিভক্তির ব্যবহার, চতুর্থীর বিভক্তি -রে, সপ্তমীতে -ত, উত্তরপদ মাঝ, অন্তর, সাঙ্গ প্রভৃতি, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে যথাক্রমে ইল, ইব যোগ; ক্রিয়ার বিশেষণ গঠনে -অন্ত, সংযোজক অব্যয় -ইআ, নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় -ইলে, কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়ায় -ইঅ, আছ ধাতুর ব্যবহার—এমনি বহু দৃষ্টান্তের দ্বারা চর্য্যার ভাষা যে বাঙ্গলা, তাহা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সহিত চর্য্যার ভাষার শব্দগত ও ব্যাকরণগত সাদৃশ্যও চর্য্যাগানের ভাষা যে বাঙ্গলা, তাহা প্রমাণ করিতেছে। চর্য্যার ছন্দ অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত গ্রন্থে ২৪টি কবির রচিত ৪৬টি সম্পূর্ণ পদ এবং একটি খণ্ডিত পদ অর্থাৎ সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ আছে। পদকর্ত্তাদের নাম—লুইপাদ, কুক্কুরীপাদ, বিরূঅপাদ, গুণ্ডরীপাদ, চাটিলপাদ, ভুসুকুপাদ, কাহ্নুপাদ, কামলিপাদ, ডোম্বীপাদ, শান্তিপাদ, মহিত্তাপাদ, বীণাপাদ, সরহপাদ, তন্ত্রীপাদ, শবরপাদ, আর্য্যদেবপাদ, ঢেণ্ঢণপাদ, দারিকপাদ, ভাদেপাদ, তাড়কপাদ, কঙ্কণপাদ, জয়নন্দীপাদ, ধামপাদ, লাড়ীডোম্বীপাদ। ইঁহাদের মধ্যে লুইপাদ আদি সিদ্ধাচার্য্য। সেই হিসাবে ইনিই আদি চর্য্যাপদরচয়িতা। কাহ্নুপার ১২টী চর্য্যা আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর কোন পদকর্ত্তার ভণিতায় এতগুলি চর্য্যা পাওয়া যায় নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে চর্য্যাগুলি সেকালের সঙ্কীর্ত্তনের পদ। চর্য্যাগীতি-গুলি যে রাগরাগিণী সহকারে গীত হইবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল, সে প্রমাণও আমরা পাইয়াছি। প্রত্যেকটি পদের প্রারম্ভে উহা কোন রাগিণীতে গীত হইবে তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া আছে।

চর্য্যাগানগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায় সহজিয়া সিদ্ধাচার্য্য নামেও খ্যাত। গানগুলির মধ্যে সহজধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়াস আছে। যদিও গানগুলির অর্থকে, গানগুলির ভিতরকার দার্শনিক তত্ত্বকে, উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য প্রত্যেক গানের শেষে সংস্কৃত টীকা আছে, তথাপি ইহার বিষয়বস্তু এত জটিল ও হেঁয়ালিপূর্ণ যে, উহাদিগের অর্থ সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট নহে। তথাপি এই সকল চর্য্যায় যতটুকু অর্থ বুঝা যায়, তাহাতেই এই গানগুলির বিশিষ্ট মাধুর্য্যের আভাস পাওয়া যায়। চর্য্যাগানে কবিকল্পনার স্ফূর্ত্তি বা আবেগ কিছুই নাই। অনেক স্থলেই প্রচলিত কোন একটা ধাঁধা অথবা প্রবাদবাক্য কবির উপজীব্য। কিন্তু তথাপি পরিমিত শব্দ-যোজনায় এবং শ্বাসাঘাতযুক্ত দৃঢ়বদ্ধ ছন্দ চর্য্যাগীতি-গুলিকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও শ্রুতিসুখকর করিয়াছে। স্থানে স্থানে অল্প কথায় ছোট ছোট চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে সকল চিত্র স্পষ্ট এবং মনোহর।

চর্য্যাগানের সর্ব্বত্র না হইলেও মধ্যে মধ্যে কবিকল্পনার সমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। এগুলি ধর্ম্মসঙ্গীত, সুতরাং সাধন-মার্গের দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশই রচয়িতাদিগের উদ্দেশ্য। কবিত্বপ্রকাশ বা কল্পনাবিলাস রচয়িতাদিগের উদ্দেশ্য না হইলেও চর্য্যা গীতিতে মধ্যে মধ্যে কবিত্বের পরিচয় যে না পাওয়া গিয়াছে, এমন নহে। শবরপাদের একটি পদে আমরা কবিকল্পনার সমাবেশ দেখি।

উঁচা উঁচা পাবত, তহিঁ বসই শবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ শবরী, গীবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত শবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহরি।
নিঅ ঘরণী ণামে সহজ সুন্দারী॥
নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী শবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা, সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নইরামণি দারী পেহ্ম পোহাইলী রাতি॥

উঁচু উঁচু পর্ব্বত, সেখানে ব্যাধবালিকা বাস করে। ব্যাধবালিকা ময়ূরের পুচ্ছপরিহিতা, তাহার কণ্ঠে গুঞ্জাফুলের মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, দোহাই তোমার! গোল করিও না। আমি তোমার গৃহিণী—নাম সহজ সুন্দরী। নানা তরুবর মুকুলিত হইল রে—গগনেতে তাহার ডাল লাগিল। কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারিণী শবরী একেলা এ বন খুঁজিতেছে। তিন ধাতুর খাট পড়িল, শবর তুই মহাসুখে শয্যা বিছাইলি। নায়ক শবর! তুই নায়িকা নৈরামণিকে লইয়া প্রেমে রাত পোহাইলি।

চর্য্যাগীতির এই পদটিতে পরকীয়া-তত্ত্বও রূপ পাইয়াছে।

অন্যত্র চর্য্যাকার লিখিতেছেন—

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥

ইহা যেন রবীন্দ্রনাথের—

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী।
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি'॥

এই দুই পংক্তিরই প্রতিধ্বনি।

শুধু যে ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে চর্য্যাগানগুলির উপযোগিতা রহিয়াছে তাহা নহে। ইহার মধ্যে যে সকল প্রবাদবাক্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে এবং প্রচলিত বাঙলা প্রবাদবাক্যে তাহার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। চর্য্যাগুলি দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু রসহীন নহে। চর্য্যা-গানে ছন্দ, অলঙ্কার, ভাব, রস প্রভৃতি রসানুভূতির প্রচুর উপকরণ সঞ্চিত আছে।

বৈষ্ণব কবিতা

বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বৈষ্ণব কবিতা। বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহা "বসন্তকালের অপর্য্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মত। যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য্য।" সত্যই ভাবে, ভাষায় এবং গঠননৈপুণ্যে বৈষ্ণব কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সেই অনুবাদ ও অনুকরণের মধ্যে একমাত্র বৈষ্ণব কবিতায় স্বাধীন কল্পনা ও বর্ণনার পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। বৈষ্ণব কবিতার মধ্য দিয়াই মধ্যযুগের বঙ্গের কবিগণের মৌলিক কবিপ্রতিভা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল।

কবিতা মানুষের হৃদয়াবেগ প্রকাশের বাহন। মানুষের এই হৃদয়াবেগ প্রবল হইয়া উঠে ,ভগবানের প্রতি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির ভক্তি-প্রকাশের আগ্রহে এবং নরনারীর প্রণয়লীলা পরিব্যক্ত করিবার আকুতিতে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমাস্পদ কল্পনা করিয়া তাঁহার সহিত আরাধিকা-শিরোমণি রাধিকার প্রণয়লীলার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ ভগবানকে শুধুমাত্র কান্তারূপে কল্পনা করিয়া তৃপ্তি পান নাই। তাঁহারা সকল প্রকার মানব সম্পর্কের ভিতরে ভগবানের প্রেমের প্রকাশ ও লীলা দেখিতে পাইয়াছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বৈষ্ণব ধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করার চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।" এইরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর বা কান্তা ভাব—এই পাঁচটি ভাবে ভগবানের আরাধনা করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতায়

এই পাঁচটি রস উৎসারিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনও সখারূপে, কখনও যশোদার 'পরাণের পরাণ নীলমণি'-রূপে, কখনও কান্তাভাবে কল্পিত হইয়াছেন। তবে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ভক্ত ও ভগবানের ভিতর যেটুকু ব্যবধান আছে, ঐ সকল সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত রূপ যেটুকু আছে, তাহা মধুর বা কান্তা ভাবে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন জীবের একান্ত আপনার, প্রিয় হইতেও প্রিয়তর। ঈশ্বরকে সেখানে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ ও বেদনার মধ্যে আনিয়া অন্তরঙ্গরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। সুতরাং বৈষ্ণব কবিতায় সকল প্রকার সম্বন্ধের মধ্য দিয়া ভগবানের সহিত রস-সম্বন্ধ কল্পিত হইলেও এই মধুর ভাবের কল্পনার মধ্য দিয়াই বৈষ্ণব কবিদিগের কল্পনা ও কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমগীতিকার মধ্য দিয়া বৈষ্ণব কবিগণ কল্পনা ও কবিত্বের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। জীবনে যত প্রকার রসানুভূতি আছে তন্মধ্যে নরনারীর প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই প্রেমেরই লীলাবৈচিত্র্য আমরা দেখিয়াছি। পূর্ব্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, প্রেমাস্পদের জন্য বিরহিণীর বেদনাতুর হৃদয়ের মর্ম্মভেদী ক্রন্দন, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া পদাবলীর নায়িকা শ্রীরাধিকার প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর দ্বারা মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে একটা অনির্ব্বচনীয়তা সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু কি অদ্ভুত প্রেরণার ফলে পদাবলী সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী, তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি ও তৎপ্রচারিত প্রেমধর্ম্মের সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক। যদিও বিদ্যাপতি এবং বড়ু চণ্ডীদাস প্রাক্‌চৈতন্য যুগে আবির্ভূত হইয়া পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগে যদিও পদাবলী রচিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল, তথাপি একথা বলিতে হয় যে, চৈতন্য প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম প্রচারের পর বৈষ্ণব কবিতা যেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, উপলব্ধির গভীরতায় ও প্রকাশ-বৈচিত্র্যে উহা যেরূপ অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছিল চৈতন্য-পূর্ব্ব যুগে তাহা হয় নাই। পদাবলী সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য পরবর্ত্তী যুগেই হইয়াছিল। কারণ শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে রাধাভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয়। মেঘদর্শনে তাঁহার কৃষ্ণভ্রম হইত, তমাল তরুকে তিনি কৃষ্ণভ্রমে আলিঙ্গন করিতেন, যিনি

কৃষ্ণনাম করিতেন তাঁহারই পায়ে আত্মনিবেদনের নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইতেন। ইহা রাধিকারই আলেখ্য। বৈষ্ণব কবিগণ এই আলেখ্য দেখিয়া রাধার আলেখ্য আঁকিয়াছেন, চৈতন্যদেবের প্রেমবিহ্বলতা দেখিয়া রাধার প্রেমের আর্ত্তি ও আকুলতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। চৈতন্যদেবের ভক্তিবিহ্বল জীবন বৈষ্ণব কবিদিগকে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল। তাই বৈষ্ণব কবিতায় রাধার চিত্র অত স্পষ্ট হইয়াছে।

বৈষ্ণব কবিতায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা—ভগবান ও ভক্ত হৃদয়ের প্রেম-লীলা বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে মানবীয় প্রেমের সুরও মিশিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণ আত্মার আত্মীয় বলিয়া, তাঁহার মধ্যে এতটুকুও ঐশ্বর্য্যভাব নাই বলিয়া, আমরা রাধাকৃষ্ণলীলায় মানুষেরই কামনা, ব্যথা, বেদনা ও নৈরাশ্য দেখিতে পাই।

বৈষ্ণব সাধকগণ মনে করেন যে, সমস্ত পদাবলী সাহিত্যটাই ভগবানের লীলা। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা নরনারীর প্রেমলীলা নহে—ইহা তাঁহাদের মত। বৈষ্ণব কবিতার কোনি কোনটিতে অবশ্য তত্ত্বের গন্ধ থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার মধ্যেও যে মর্ত্ত্যবাসী নরনারীর তপ্ত প্রেমতৃষা ভাষা পাইয়াছে একথাও সত্য। তাই এযুগের কবি বৈষ্ণব কবিকে প্রশ্ন করিয়াছেন—

> শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
> পূর্ব্বরাগ অনুরাগ মান-অভিমান ;
> অভিসার প্রেমলীলা বিরহ-মিলন, বৃন্দাবন-গাথা
> এ কি শুধু দেবতার ? এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
> দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের প্রতি রজনীর আর
> প্রতি দিবসের তপ্ত তৃষা ?

বাস্তবিক বৈষ্ণব পদাবলীর এমন অনেক পদ আছে যেখানে রাধাকৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া পার্থিব প্রেমই উৎসারিত হইয়াছে, এমন অনেক পদ আছে যেখানে রাধাকৃষ্ণের নাম পর্য্যন্ত কবিগণ করেন নাই। সেই সকল পদে সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের প্রেমিক প্রেমিকার বাহির ও অন্তর্জ্জগতের সৌন্দর্য্য অপরূপ ভাষা পাইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পদাবলীতে বেশ একটা সার্ব্বজনীন আবেদন বা universal appeal লক্ষিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব পদাবলীতে সকল দেশের ও সকল কালের প্রেমিক-প্রেমিকার অনুভূতি ভাষা পাইয়াছে একথা বলা যাইতে পারে।

পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধিকার প্রেম বহু অবস্থার মধ্যে বহুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সম্ভোগ এই সকল কবিতার প্রধান সুর বা শেষ কথা নহে। বরং এই বৈষ্ণব গীতি-কবিতাসমূহের মধ্যে প্রেমের অসীম দুঃখের যে গভীর সুর তাহাই ক্রমাগত ধ্বনিত হইয়াছে। কারণ রাধিকার প্রেম Infinite passion—এ প্রেমের তৃপ্তি হইতে পারে না। এ প্রেমে মিলনের মধ্যেও বিচ্ছেদের সুরটি বাজিয়া উঠিয়া প্রেমিক-প্রেমিকাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। যেমন—

এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি ॥—চণ্ডীদাস

অন্যত্র— এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি ॥
দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥—চণ্ডীদাস

বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাসেও এমনিতর মিলনের মধ্যেও মাথুরের সকরুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়!
সোই পীরিতি অনু- রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ,—
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলুঁ,—
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল ॥
কত মধু-যামিনী রভসে গমায়লুঁ,—
ন বুঝলুঁ কৈসন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ,—
তব হিয় জুড়ন ন গেলি ॥—বিদ্যাপতি

কোরে রহিতে কত দূর হেন মানয়ে।
তেঞি সদাই লয় নাম ॥—জ্ঞানদাস
কোরে রহিতে যো মানয়ে দূর।
সো অব কৈসন ভিন ভিন ঝুর ॥—গোবিন্দদাস

প্রেমাস্পদকে নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে পাইয়াও এ প্রেম বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ব্যাকুল। নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়াও রাধিকা যেন শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে পাইলেন না, চিনিতেও পারিলেন না,—তাই এ প্রেমে রাধিকার অন্তরে গভীর অতৃপ্তি ও বিচ্ছেদব্যথা জাগিয়া উঠিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিতা দেহকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিলেও বৈরাগ্য ও দুশ্চর তপস্যাকে বরণ করিয়া উহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। রাধিকার প্রেম মহাযোগিনীর তপস্যা। প্রেমাস্পদকে লাভ করিবার জন্য তিনি দুশ্চর তপস্যা করিয়াছেন। রাধিকার প্রেম মাত্র দেহের সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই—দেহাতীতের স্পর্শ পাইবার জন্য সে প্রেম ব্যাকুল, রূপ হইতে রূপাতীতের পথে সে প্রেম যাত্রা করিয়াছে।

বৈষ্ণব গীতি-কবিতায় অনেক জায়গায় দেহজ সৌন্দর্য্যের কথাই নাই। যেমন,

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল,
চরণ চপল গতি লোচন লেল।
অব সব খনে রহু আঁচরে হাত।
লাজে সখীগণ না পুছয়ে বাত ॥
শুনইতে রস-কথা থাপই চিত—
যৈসে কুরঙ্গিনী শুনয়ে সঙ্গীত ॥
শৈশব-যৌবন উপজল বাদ।
কেও না মানয়ে জয় অবসাদ ॥
অব ভেল যৌবন বঙ্কিম দিঠ
উপজল, লাজ, হাস ভেল মীঠ ॥
খনে খনে দশন ছটাছট হাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস ॥
চঙকি চলয়ে খনে খনে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥

এখানে রাধিকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনসৌন্দর্য্যের কথা নাই। যৌবনস্পর্শে শ্রীরাধিকার মন যে নবীন ও চঞ্চল হইয়াছে তাহা তাঁহার অপাঙ্গ দৃষ্টিতে, চরণের গতিতে আর সলজ্জ ভাবে ও হাস্যে প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে শ্রীরাধিকা যেন ইংরেজ কবি কীটসের Nymph of the downward smile and sidelong glance! এই রাধিকার "সদ্যবিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে। আপনার সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে। তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে প্রকাশ করিবে কি গোপন করিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না।" —রবীন্দ্রনাথ।

বৈষ্ণব কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই রাধিকার অন্তর্জ্জগতের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষিত হইয়াছে। কাব্যে নায়িকার রূপবর্ণনা সর্ব্বদেশের ও সকল কালের প্রচলিত রীতি। অন্যান্য কাব্যে দেখা যায় যে, নায়িকার রূপ—তাহার আকর্ষণী শক্তির কথা সাধারণভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—অথবা তাহার দেহের দুই একটি প্রধান প্রধান অঙ্গের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবির দৃষ্টি গিয়াছে রূপের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের দিকে—তাহারও অন্তরালে; বাহিক রূপের অন্তরালে যে সরলসুন্দর প্রণয়বিহ্বল হৃদয়টুকু আছে, বৈষ্ণব কবিরা তাহারও সৌন্দর্য্য আমাদের সম্মুখে খুলিয়া মেলিয়া ধরিয়া দেখাইয়াছেন।

একটা উদাহরণ দিই। শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোন যুবতী-সন্দর্শনে গিয়াছেন একথা কল্পনা করিয়া অভিমানিনী রাধিকা বলিতেছেন—

সই কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয়॥

যুবতী হইয়া শ্যাম ভাণ্ডাইয়া
এমতি করিল কে ?
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে ॥

এখানে দেখিতেছি অভিমানিনী রাধিকা আর কোন অভিশাপ-বাণী খুঁজিয়া পান নাই। অন্তরের প্রচ্ছন্ন বেদনা ব্যক্ত করিয়া তিনি শুধুমাত্র বলিয়াছেন—আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে। ইহার মধ্যে রাধিকার অন্তর্জ্জগতের অবর্ণনীয় ক্লেশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 'আমার পরাণ যেমতি করিছে'—এই অল্প কয়টি কথায় কবি রাধিকার অন্তর্জ্জগতের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। রাধিকার সমস্ত হৃদয়টুকু এই সামান্য কয়টি কথায় আমরা দেখিতে পাইয়াছি—তাঁহার বেদনার তীব্রতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতার ভিতর দিয়া প্রেম যে ভাবে রূপায়িত হইয়াছে, একমাত্র ময়মনসিংহ গীতিকা ভিন্ন আর অন্য কোন কাব্যের ভিতর দিয়া তাহা তেমনভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। পদাবলীর নায়িকা শ্রীরাধিকার মত প্রেমিকা বিশ্বসাহিত্যে আর নাই। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনমাত্রেই তাঁহার অন্তরে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে। একদিন ক্ষণিক দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি দেখিয়াছেন। তাহার পর হইতে কৃষ্ণপ্রেমে তিনি তন্ময়। তাই প্রেমাস্পদকে দেখিবার জন্য, তাঁহার সহিত মিলনের জন্য তাঁহার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা—ক্ষণিক অদর্শনে অশান্ত তৃষ্ণা ও অপরিতৃপ্তি। প্রগাঢ় প্রণয় অশেষ মিনতিতে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যেও বিচ্ছেদের আশঙ্কা ও ব্যাকুলতা ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার বৈশিষ্ট্যই এই। শ্রীরাধিকার প্রেম শত দুঃখেও ম্লান হয় নাই, বরং আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রেম কোন প্রতিদান আশা করে না, একান্ত নিবেদনেই এ প্রেমের চরম সার্থকতা। বেদনায় সমুজ্জল, দুঃখে মহীয়ান রাধিকার প্রেম আপন মহিমায় নিজেকে এক অপার্থিব লোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলী বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতা। প্রেমের উন্মেষ, মিলন ও বিচ্ছেদ—ইহার মধ্য দিয়া কবিদিগের একান্ত আত্মগত অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবের গভীরতায়, বর্ণনায় ঐশ্বর্য্যে, ছন্দের ঝঙ্কারে বৈষ্ণব কবিতা যেন সৌন্দর্য্যের নির্ঝর। বৈষ্ণব কবিতাকে সমুদ্রগামী নদীর সহিত তুলনা

করা হয়। নদী যেমন পার্থিব সৌন্দর্য্যের পথ বাহিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে সহসা অসীমের বুকে—দুর্জ্ঞেয় দুরধিগম্য সত্যের বুকে বিলীন হয়, বৈষ্ণব কবিতাও তদ্রূপ পার্থিব প্রেম-গীতি শুনাইতে শুনাইতে, পরিচিত পথ দিয়া লইয়া গিয়া আমাদিগকে এক অপরিচিত জ্যোতির্ম্ময় লোকে পৌঁছাইয়া দেয়। তখন বৈষ্ণব কবিতায় যে সুর ধ্বনিত হইতে থাকে, পার্থিব কামনা বাসনা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আধুনিক গীতিকবিতায় ও বৈষ্ণব গীতিকবিতায় পার্থক্য এইখানে। আধুনিক গীতিকবিতায় বৈচিত্র্য আছে, আধুনিক গীতিকবিদিগের কল্পনা সর্ব্বাশ্রয়ী। কিন্তু বৈষ্ণব গীতিকবিদিগের উপলব্ধির গভীরতা ও কল্পনার অতলস্পর্শিতাই বিশেষত্ব। বৈষ্ণব কবিদিগের এই উপলব্ধির গভীরতা বা কল্পনার অতলস্পর্শিতা কবিতায় ফুটাইতে না পারিয়া এ যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"বাঁশরী বাজাতে চাই
বাঁশরী বাজিল কই!"

সত্যই, বৈষ্ণব কবিতায় যে সুর বাজিয়াছে, আধুনিক গীতিকবিতায় সে সুর বাজে নাই। রবীন্দ্রনাথের মত অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন গীতিকবিও তাঁহার বাঁশরীতে বৈষ্ণব গীতিকবিতার সুরটুকুকে ধ্বনিত করিতে পারেন নাই।

বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভাবধারা মুক্তিলাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহারই প্রভাবে বাঙ্গালীর চিত্ত সরসসুন্দর, উন্নত, ধর্ম্মানুগত এবং ভাবপ্রবণ হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বাঙ্গলাদেশে শাক্ত কবিদিগেরও শ্যামাসঙ্গীতের আবির্ভাব হইয়াছে এবং অবশেষে ইহারই প্রভাবের সহিত ইউরোপীয়—বিশেষ করিয়া ইংরেজি গীতিকাব্যের প্রভাব সম্মিলিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গলা কাব্য সাহিত্যকে ভারতের সকল প্রভাষার অপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে এবং বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারেও বঙ্গসাহিত্যকে একটি উচ্চ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আধুনিক কবিগণ এই বৈষ্ণব কবিতার গীতমাধুর্য্য ও পদলালিত্যকেই লালন করিয়া নূতন যুগের উপযোগী নূতনতর কাব্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি

বাঙ্গালী ভক্ত এবং ভাবুকের নিকট চণ্ডীদাসের পদাবলী যেমন প্রিয়, বিদ্যাপতির পদাবলীও তাঁহাদিগের নিকট তেমনি প্রিয়। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র যেমন চণ্ডীদাসের সুমধুর গান শোনা যায়, বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের গানও তেমনি বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর নিকট বিশেষ পরিচিত। কিন্তু বিদ্যাপতি বাঙ্গালী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মিথিলার অধিবাসী এবং মৈথিলী ভাষায় তিনি তাঁহার পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও আমরা তাঁহাকে বাঙ্গলার প্রাচীন কবিশ্রেণী হইতে অপসারিত করিতে পারিব না। মিথিলা-বাসী হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির যশ সুপ্রাচীনকালেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কতকগুলি কারণ আছে।

বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলা বাঙ্গলারই এক অংশ ছিল। তখনকার বাঙ্গলা দেশের সীমা এখনকার বাঙ্গলা দেশের চেয়ে অনেক বড় ছিল। সমগ্র মিথিলা তখন বাঙ্গলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন মিথিলা ও বঙ্গদেশের মধ্যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠতাও ছিল। সে যুগে বাঙ্গলা ও মিথিলার মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান চলিত। বিদ্যাপতির সময়ে বহু বাঙ্গালী ছাত্র মিথিলায় গিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসিতেন, আবার অনেক মৈথিলী ছাত্র বাঙ্গলায় আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। যে সকল বাঙ্গালী ছাত্র অধ্যয়ন করিতে মিথিলা যাইতেন, তাঁহারা দেশে ফিরিবার সময়ে বিদ্যাপতির বহু পদ বাঙ্গলাদেশে আমদানী করিয়া প্রচার করিতেন। বাঙ্গলায় বিদ্যাপতির মৈথিলী কবিতার এইরূপ প্রচারে কোনরূপ বাধাও ছিল না। কারণ তখন বাঙ্গলা এবং মৈথিলী এই দুই ভাষা প্রায় একরূপ ছিল, এই দুই ভাষার অক্ষরেও বিশেষ সাদৃশ্য ছিল।

এইজন্য বাঙ্গালীরা সহজেই মৈথিলী বুঝিত এবং মিথিলাবাসীরাও সহজেই বাঙ্গলা বুঝিত। ফলে বঙ্গের জয়দেব মিথিলায় এবং মিথিলার বিদ্যাপতি বঙ্গে পরিচিত হইলেন।

বাঙ্গলা চিরকাল বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন দেশ, রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী এদেশে অতিশয় অনুরাগ ও ভক্তির সহিত পঠিত হইয়া থাকে। তাই বিদ্যাপতির মাধুর্য্য-বিশিষ্ট এবং প্রেমপ্রবণ-হৃদয়ের ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারা অভিসিঞ্চিত পদাবলী বাঙ্গালীর কোমল অন্তরে সহজেই একটি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছিল।

চৈতন্যদেব বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদসমূহ শ্রবণ করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মিথিলাবাসী হইয়া বাঙ্গলাদেশে বিদ্যাপতির কবিতা প্রচারিত হইয়া পড়ায় ইহাও একটি অন্যতম কারণ। চৈতন্যদেব বাঙ্গলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিলে তাঁহার ভক্তগোষ্ঠী তাঁহাকে তাঁহার প্রিয় পদসমূহ গান করিয়া শুনাইতেন। তিনি বিদ্যাপতি, জয়দেব এবং চণ্ডীদাসের গীত শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। তাই চৈতন্যচরিতামৃত নামক চৈতন্য-জীবনীতে পাই—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥

চৈতন্যদেব ভালবাসিতেন বলিয়া তাঁহার ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে ও বাঙ্গলার বৈষ্ণব-সমাজে বিদ্যাপতির পদাবলীর খুব প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল।

বাঙ্গলা পদাবলীর উপর সুপ্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যাপতির যথেষ্ট প্রভাব। বিদ্যাপতির মত পদরচনা করিবার নিমিত্ত এক সময়ে বাঙ্গালীর মনে এমন অদম্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল যে, বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষার অনুকরণে একটি বাঙ্গলা-মৈথিলী-মিশ্রিত নূতন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। সে ভাষার নাম ব্রজবুলি। গোবিন্দদাস প্রভৃতি বাঙ্গালী পদকর্তাগণ খুব সফলতার সহিত ব্রজবুলিতে শত শত পদরচনা করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে বিদ্যাপতির কাব্যরসের প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল কারণে বিদ্যাপতি বাঙ্গলাদেশে অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি চিরদিন বাঙ্গলার আপন কবি বলিয়া পরিচিত থাকিবেন। বিদ্যাপতির উপর আমাদের একটা ভালবাসার আধিপত্যও জন্মিয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় বাঙ্গালী-হৃদয়, তেমনি কোমল, তেমনিই ভাবপ্রবণ। এ সম্বন্ধে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন—বিদ্যাপতির সমাধিস্তম্ভ উঠিতে বিস্ফীতেই উঠিবে, মৈথিলগণই তাঁহাকে লইয়া গর্ব্ব করিবেন। তবে আমাদের একটা ভালবাসার আধিপত্য আছে, বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু, সুখ ও প্রেমের

কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে আমরা বাঙ্গালীর ধুতি-চাদর পরাইয়া মিথিলার বড় পাগড়ী খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে আমাদের করিয়া ফেলিয়াছি। সেইরূপেই তিনি আমাদেরই থাকিবেন। ...এ শুধু ভালবাসার বলপ্রয়োগ। ঐতিহাসিক এ আব্দার নাও মান্য করিতে পারেন।

মিথিলার অন্তর্গত বিস্ফী নামক গ্রামে 'ঠাকুর' উপাধিধারী এক ব্রাহ্মণ-বংশে বিদ্যাপতির জন্ম হয়। বিদ্যাপতি বৈষ্ণব-কবিতা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ। তিনি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মহারাজ শিবসিংহের সহিত বিদ্যাপতির এমন হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল যে, রাজা তাঁহাকে তাঁহার জন্মভূমি বিস্ফী গ্রামখানি দান করিয়াছিলেন। এই দান কেবল বন্ধুত্বের নিদর্শন নহে, কবির কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পুরস্কারও বটে। বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। একটি পদে কবি তাঁহার আত্মপরিচয় প্রদানের ছলে বলিতেছেন—

জনমদাতা মোর গণপতি ঠাকুর
মৈথিলী দেশে করুঁ বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ
কৃপা করি লেউ নিজ পাশ॥
বিসফি গ্রাম দান করল মুঝে
রহতহি রাজ-সন্নিধান।

আমার জন্মদাতা গণপতি ঠাকুর, মিথিলা দেশে আমার বাস। পঞ্চগৌড়েশ্বর রাজা শিবসিংহ আমায় কৃপা করিয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থান দিয়াছেন—আমায় তিনি বিস্ফী গ্রাম দান করিয়াছেন, আমি রাজসন্নিধানে রহিয়াছি।

বিদ্যাপতির পিতা গণপতি ঠাকুর পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন এবং শিবসিংহের পিতার অগ্রজ মহারাজ গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' গ্রন্থে ইনি রাজা গণেশ্বরের প্রশংসাগীতি গাহিয়াছেন। বিদ্যাপতির অন্যান্য পূর্বপুরুষগণও পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা বহু ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ রাজাদের প্রধান সহায় ও পরামর্শদাতাও ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যাপতি পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বংশপরম্পরায় রাজসভাসদের এবং

সভাপণ্ডিতের পদ অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন। বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন, কাজেই তিনি নিজেও অনেক রাজার অধীনে রাজসভাসদ ও পণ্ডিত ছিলেন। প্রথম কীর্ত্তিসিংহ, তারপর দেবসিংহ, তারপর শিবসিংহ, তারপর পদ্মসিংহ, তারপর হরসিংহ, তারপর নরসিংহ দেব, তারপর ধীরসিংহ।

যে বংশে বাগ্‌দেবী বীণাপাণির নিত্য আরাধনা হইত, পুরুষানুক্রমে দেবী সরস্বতীর সাধনা হইত, সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যাপতি যে তাঁহার কবিত্ব আর পাণ্ডিত্যের যশে সমগ্র ভারতকে ছাইয়া ফেলিবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি? বিদ্যাপতির যশ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত।

বিদ্যাপতির জন্মকাল সঠিকভাবে জানা যায় নাই, জানিবার উপায়ও নাই। তবে কবি তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে যে সকল রাজাদের নাম করিয়াছেন, তাহা হইতে এইটুকু জানা গিয়াছে যে, তিনি নিশ্চয় ১৩৫৮ হইতে ১৪৫৮ এই একশত বৎসরের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে চতুর্দ্দশ শতকের বা পঞ্চদশ শতকের কবি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইনি বাঙ্গলার আদি কবি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক। প্রবাদ আছে যে, গঙ্গাতীরে এই দুই কবির মিলন হইয়াছিল।

বিদ্যাপতি সংস্কৃতে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কবিতা সংস্কৃত কবিগণের দ্বারা প্রভাবিত। সংস্কৃত কাব্যের ভাব, অলঙ্কার, ঋতুবর্ণনারীতি প্রভৃতি বিদ্যাপতি তাঁহার স্বকীয় বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী ও বর্ণনাভঙ্গীর দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি মহারাজ শিবসিংহের আদেশে 'পুরুষপরীক্ষা' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ছাড়া বিদ্যাপতি আরও কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ইতিহাস লিখিয়াছেন—'কীর্ত্তিলতা' ও 'কীর্ত্তিপতাকা' তাঁহার ইতিহাস-গ্রন্থ। এই গ্রন্থ দুইখানিতে কবি তাঁহার আশ্রয়দাতা রাজাদের—যেমন কীর্ত্তিসিংহ, শিবসিংহ প্রভৃতির রাজ্যকাল বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থ দুইখানি গানের আকারেই রচিত। তবে ভাষা আগাগোড়া মৈথিলী নয়। কোথাও সংস্কৃত, কোথাও প্রাকৃত, কোথাও অপভ্রংশ, কোথাও মৈথিলী—এই বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে তাঁহার 'কীর্ত্তিলতা' এবং 'কীর্ত্তিপতাকা' গ্রন্থ দুইখানি রচিত। তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থগুলি যেমন নিখুঁত, তাঁহার ইতিহাস-গ্রন্থ দুইখানিও তেমনি অনিন্দ্য। কবি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। অথচ তাঁহার এমন সংযম যে, কল্পনার আতিশয্যে অথবা

ভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি কোথাও ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করিয়া ফেলেন নাই। ভাবের উচ্ছ্বাসে ঐতিহাসিক তথ্য কোথাও চাপা পড়ে নাই।

বিদ্যাপতি প্রধানতঃ কবি। কবি হিসাবেই বাঙ্গালীর নিকট তিনি পরিচিত। বাঙ্গালীর নিকট তাঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কবিতাবলী বড় প্রিয়। কিন্তু কবি কেবল রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা করেন নাই। তিনি শিবের বন্দনা করিয়াও কবিতা রচনা করিয়াছেন—

আন চান গান   হরি কমলাসন

সবে পরিহরি হমে দেবা।

ভক্ত বছল প্রভু   বান মহেসর

ঈ জানি কইলি তুঅ সেবা॥

চন্দ্র, অন্য দেবগণ, কমলাসন হরি এ সকলকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। বাণ মহেশ্বর প্রভু ভক্তবৎসল—ইহা জানিয়া আমি তোমার সেবা করিয়াছি। কিন্তু বিদ্যাপতির কোনরূপ গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তাঁহার নিকট হরি এবং হর দুই দেবতাই এক। তিনি বলিয়াছেন যে, হরি এবং হর উভয়েরই এক শরীর, কিন্তু দুইটি বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু তাঁহাদের নাম হইয়া যায় বিভিন্ন। কখনও তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন, কখনও তিনি কৈলাসে থাকেন। যখন বৈকুণ্ঠে, তখন তিনি নারায়ণ, যখন কৈলাসে, তখন সেই দেবতাই শূলপাণি মহেশ্বর।

এক শরীর লেল দুই বাস।

খনে বৈকুণ্ঠে খণহি কৈলাস॥

ভণই বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী।

ও নারায়ণ ও শূলপাণি॥

শিব-সঙ্গীতে বিদ্যাপতির ভক্তি প্রকাশ পাইতে পারে—তাঁহার শিবভক্তির নিদর্শনস্বরূপে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ আজিও মিথিলাদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কবিত্ব উৎসারিত হইয়াছে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কবিতায়। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কবিতাই বিদ্যাপতির প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই শ্রেণীর কবিতা রচনায় তিনি সৌন্দর্য্যের কবি।

তাঁহার কবিতা উপমা ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত, যৌবনের আনন্দ-চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ। কবি কীট্‌সের নিকট যেমন "A thing of beauty is a joy for ever", বিদ্যাপতির নিকটে সুন্দরী রাধিকাও তদ্রূপ। কবি কীট্‌সের

মত বিদ্যাপতিও সৌন্দর্য্যকে বেদনা হইতে, দুঃখ হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কবিতায় সুখের মধ্যেও দুঃখ, মিলনের মধ্যেও বিচ্ছেদের আশঙ্কা। কিন্তু বিদ্যাপতিতে যেখানে সুখ, সেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই,—বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মিলনানন্দ কখনও ব্যাহত হয় নাই। সেইজন্য বিদ্যাপতির কবিতায় নবীনতা। বিদ্যাপতিতে বসন্তের পুষ্পপ্রাচুর্য্য, দেহজ সৌন্দর্য্যের কথাই অধিক। বিদ্যাপতি যে বৃন্দাবনের আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন সেখানে—

নব নব বিকসিত ফুল।
নবল বসন্ত নবল মলয়ানিল;
মাতল নব অলিকুল॥

নবাগত কোকিলের আগমনে এবং তাহাদের গানে এই বৃন্দাবন পরিপূর্ণ এবং এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মধ্যে 'বিহরই নবল কিশোর'। এই বৃন্দাবনে বেদনার লেশমাত্র নাই।

কবির মানস-দুহিতা রাধিকাও আনন্দের সৃষ্টি। রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত হইয়া উঠিতেছেন। অকস্মাৎ সৌন্দর্য্যের বান ডাকিয়া তাঁহার দেহলতা প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। বার বার তিনি নিজের রূপ নিজে সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধা ও বিস্মিতা হইয়া যাইতেছেন। বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় বিদ্যাপতি রাধিকার আনন্দোজ্জ্বল রসঘন মূর্ত্তিটিকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

খনে খন নয়ন কোন অনুসরই।
খনে খন বসন-ধূলি তনু ভরই॥
খনে খন দশনক ছটাছট হাস।
খনে খন অধরক আগে করু বাস॥
চৌঙকি চলয়ে খনে, খনে চলু মন্দ।
মনমথ-পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলিত হেরি হেরি থোর।
খনে আঁচর দেই, খনে হয় ভোর॥

ক্ষণে ক্ষণে রাধিকার নয়ন কটাক্ষ হানিবার জন্য কোণের দিকে যাইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে স্রস্ত বসন ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া অঙ্গে ধূলি ভরিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে দশনের হাস্যচ্ছটা অধরের আগে বাস করে। কখনও তিনি চমকিয়া চলেন, কখনও মন্দ গতিতে চলেন। ইহা মন্মথের প্রথম পাঠ। মুকুলিত স্তনযুগল

তিনি অল্প অল্প দর্শন করেন, কখনও তাহা অঞ্চলে ঢাকেন। কখনও তাহা দেখিয়া বিহ্বলা হইয়া থাকেন।

রাধিকার জীবনে যখন "শৈশব যৌবন দরশন ভেল", তখন 'প্রকট হাস অব গোপত ভেল' এবং—

চরণ-চপল-গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥

আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রতিমা এই রাধিকার শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শন হইল। তখন তিনি বলিতেছেন—

এ সখি কি পেখলুঁ এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি সপন সরূপ॥

*　　　*　　　*

পুন হেরইতে হমে হরল গেয়ান॥

শ্রীকৃষ্ণও রাধিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ। উভয়ের মিলন ঘটিল। এই মিলনে ছিল অপরূপ তন্ময়তা ও নিবিড়তা। উভয়ের প্রেমে ছিল বিলাস, ছিল মাধুর্য্য। কিন্তু এমনি মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন। মিলনের আশায় একদিন যে রাধিকা সোল্লাসে বলিয়াছিলেন—

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহু করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ করি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদী বনাব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
আলিপনা দেওব মোতিম হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচ ভার॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাঁহে কিঙ্কিনী সুঝম্প॥
দিশি দিশি আনব কামিনী-ঠাট।
চৌদিকে পসারব চাঁদক হাট॥

সেই রাধিকা কৃষ্ণবিরহে কাতরা হইয়া পড়িলেন। বিদ্যাপতির রাধিকার প্রেমের তন্ময়তা এবং নিবিড়তা যত, তাঁহার বিরহব্যথাও তদ্রূপ নিবিড়।

বিদ্যাপতির বিরহব্যথিতা রাধিকা দুঃখে মলিন, অভিমানে সমুজ্জ্বল এক অপরূপ অশ্রুসিক্ত মূর্ত্তি।

বৃন্দাবনের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই বিদ্যাপতির রাধিকা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন।—

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল শূন ভেল॥
রোদতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥
অব সেই যমুনা-কূলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে॥

রাধিকার বিরহ-বিশীর্ণা দেহলতা ধূলায় লুটাইতেছে। সখীগণ সান্ত্বনা দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু রাধিকা কাতরস্বরে বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিয়া কি আমাকে জীবিত দেখিতে পাইবেন?—

হেম কর কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করব মাধবী মাসে।
অঙ্কুর তপন- তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে॥

চন্দ্রকিরণে যদি পদ্ম দগ্ধ হয়, তবে বৈশাখ মাসে কি করিবে? রৌদ্রতাপে যদি অঙ্কুর দগ্ধ হয়, তাহা হইলে জলবর্ষী মেঘ কি করিবে? এই নব যৌবন বিরহে কাটাইয়া যদি ব্যর্থ করিব, তবে প্রিয়তমের সে স্নেহ কি করিবে?

বিরহিনী রাধিকাকে সান্ত্বনা দিয়া সকলে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের মনোমধ্যে রাধিকার আসন। শ্রীকৃষ্ণ দূরে গেলেও তাঁহার জন্য রাধিকার অধীরা হওয়া সাজে না। কারণ প্রিয়ের মনোমধ্যে যাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, সেখানে দূরত্বের ব্যবধানে প্রেম ব্যাহত হয় না। তাহা যদি হইত, তবে সূর্য্য কমলিনীর প্রিয়তম হইত কিরূপে? কিন্তু এই বাক্যে রাধিকার মন প্রবোধ মানিতে চাহে না। তিনি বলেন—

জো জন মন মাহ সো নহ দূর।
কমলিনী-বন্ধু হোয় জৈসে সূর॥

ঐসন বচন কহয় সব কোয়।
হমর হৃদয় পরতীত নহি হোয়॥

কারণ— জকর পরশ-বিসলেষ জর আগি।
হৃদয়ক মৃগমেদ শোভ নাহি লাগি॥
সে যদি দূরহি বরতহি বাস।
হা হরি, শুনতহি লাগ তরাস॥

যাহার স্পর্শ-বিশ্লেষ হইলে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, বক্ষের মৃগমদ শোভা পায় না, সে যদি দূরে বাস করে, হে হরি! (এ কথা) শুনিলেই ত্রাসের সঞ্চার হয়।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবার সময়ে রাধিকার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আগামী কালই ফিরিয়া আসিবেন। সরলা রাধিকা তাহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু 'কাল', 'কাল' করিয়া অপেক্ষায় রাধিকার কত দিন কাটিয়া গেল। তবু শ্রীকৃষ্ণ ফিরেন না দেখিয়া রাধিকা আক্ষেপ করিলেন—

কালিক অবধি কইএ পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল॥
ভেল প্রভাত কহত সবহি।
কহ কহ সজনি কালি কবহি॥
কালি কালি করি তেজল আশ।
কন্ত নিতান্ত ন মিলল পাশ॥

কালিকার সীমা করিয়া মাধব গেল—বলিয়া গেল কাল আসিবে। প্রত্যহ গৃহপ্রাচীরে আমি লিখিয়া রাখি 'কাল আসিবেন', কিন্তু এখন লিখিতে লিখিতে দেয়াল ভরিয়া গিয়াছে—অর্থাৎ বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। সকলেই বলিতেছে প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু সেই 'কাল' কবে আসিবে বল। 'কাল', 'কাল' করিয়া আমি আশা ত্যাগ করিয়াছি, মাধব অতিশয় নির্দ্দয়, তিনি আমার পাশে আসিয়া এখনও মিলিত হইলেন না।

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ফিরেন না দেখিয়া আশাহতা রাধিকা আক্ষেপ করিয়াছেন—

সজনি, কে কহ আওব মধাই ?
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নহি পতিয়াই॥

এখন তখন করি দিবস গমাওল
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরস গমাওল
ছোড়লুঁ জীবনক আশা॥

সজনি, কে বলে মাধব আসিবে? বিরহ-সমুদ্র কিরূপে পার হইব?—আমার বিরহের কি অবসান হইবে? এ বিশ্বাস আমার হয় না। এখন তখন করিয়া দিবস কাটাইলাম, দিবস দিবস করিয়া মাস গেল, মাস মাস করিয়া বৎসর অতিবাহিত হইল, এখন জীবনের আশা ত্যাগ করিলাম।

বিরহিনী রাধিকা অভিমান ভরে শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়াছেন। কিন্তু এই অভিশাপে জ্বালা নাই। আছে শুধু রাধিকার অন্তর্জ্জগতের অবর্ণনীয় ক্লেশ। তিনি বলিতেছেন—

সায়রে তেজব পরাণ।
আন জনমে হোয়ব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥

কৃষ্ণবিরহে আমি সাগরে প্রাণ ত্যাগ করিয়া পরজন্মে কানুরূপে জন্মাইব। কানু যখন রাধা হইবেন তখন তিনি বিরহের যে কি জ্বালা তাহা উপলব্ধি করিবেন।

প্রেমের বিকাশ হইতে না হইতে রাধিকাকে বিরহতাপে দগ্ধ হইতে হইল বলিয়া তাঁহার দুঃখের সীমা নাই।—

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল,
ন ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ-চাঁদ উদয় জৈসে যামিনী,
সুখ-লব ভৈ গেল নিরাশা॥
সখি হে, অব মোহে নিঠুর মধাই,—
অবধি রহল বিসরাই॥

প্রেমের অঙ্কুর জন্মলাভ করিতে না করিতে আতপ-তপ্ত হইল, তাহাতে দুটি পাতাও গজাইতে পারিল না! প্রতিপদের চাঁদের মত আমার সুখ-কণা মিলাইয়া গেল! হে সখি! মাধব আমার প্রতি নিষ্ঠুর। তিনি আমার নিকট ফিরিয়া আসিবার সময়ের অবধি (সীমা) বিস্মৃত হইয়া রহিলেন!

রাধিকা কৃষ্ণের বিচ্ছেদ ক্ষণমাত্রও সহিতে পারিতেন না। কৃষ্ণের সহিত বিচ্ছেদের আশঙ্কায় রাধিকা তাঁহার বক্ষে বসন চন্দন এবং হার পরিতেন না। মিলনে যাঁহার এমনি আগ্রহ, বিচ্ছেদের আশঙ্কা যাঁহার এত প্রবল—সেই রাধিকার প্রিয় আজ কত নদী-গিরির ব্যবধানে গিয়াছেন। এই কথা স্মরণ করিয়া রাধিকা মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

চীর চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥

রাধিকার এ দুঃখের সীমা নাই।

এমনি দুঃখের মধ্যে রাধিকা কালযাপন করিতেছেন। তখন বর্ষা আসিল। আকাশ মেঘে মেঘে সমাচ্ছন্ন। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, বর্ষাগমে ময়ূর উতলা হইয়া নাচিতেছে—বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি। এমনি দিনে প্রিয়মিলনের নিমিত্ত বিরহীজনের কাতরতা বিশেষ বর্দ্ধিত হয়। অথচ এমন দিনে কৃষ্ণ নাই। সেইজন্য রাধিকা খেদ করিয়া বলিতেছেন —

সখি হে, হমর দুখক নাহি ওর রে।
ঈ ভর ভাদর মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর॥

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

কৃষ্ণবিরহে সমস্ত বৃন্দাবন রাধিকার নিকট শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান।

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরী॥

বিরহিণীর আকুল ক্রন্দন শুধু বর্ষাগমেই উদ্বেল হইয়া উঠে নাই, বসন্তাগমেও বিরহিণীর এই ক্রন্দন অতি করুণভাবেই উৎসারিত হইয়াছে।

সাহর মজর ভমর গুঞ্জর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন
নিঠুর কন্ত ন আব॥

সহকার মঞ্জরিত হইল, ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, কোকিল পঞ্চম গাহিতেছে। দক্ষিণ পবনে বিরহ-বেদন বাড়িতেছে, (কিন্তু) নিষ্ঠুর কান্ত ত আসিতেছেন না।

বর্ষা বসন্ত ঋতু রাধিকার বিরহ-বেদনা, প্রিয়মিলনের জন্য ব্যাকুলতা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে।

অতঃপর আমরা পাই বিদ্যাপতি বিরহানন্তর মিলনের পদ। বিরহের পদে বিদ্যাপতির যেমন শ্রেষ্ঠতা, বিরহানন্তর মিলনের পদ রচনায়ও তেমনি বিদ্যাপতি প্রথম শ্রেণীর কবি।

বহুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিয়া রাধিকার সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছেন। ইহাতে রাধিকার আর আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। এখন তাঁহার সকল দুঃখ অভিমান দূরে গিয়াছে। তিনি সোল্লাসে বলিয়াছেন—

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়নু
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥

চন্দ্রের কিরণ, বসন্তের বাতাস আর কোকিলের রব বিরহিণী রাধিকার অন্তরে এতদিন বড় দুঃখ দিয়াছিল। কিন্তু আজ প্রিয়ের সঙ্গে পুনর্মিলনের দিনে তিনি বলিতেছেন—

সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ বান হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

কারণ—

কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।

বিদ্যাপতির উপমা বড় সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য্যের কবি। সৌন্দর্য্য বর্ণনায় তিনি তাঁহার স্বকীয় সৌন্দর্য্যবোধ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞান উভয়ই

ব্যবহার করিয়াছেন। উপমার সাহায্যে তিনি অনেক স্থলেই সৌন্দর্য্যের একটি পরিষ্কার চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। বিদ্যাপতির উপমা সম্বন্ধে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন—"উপমার যশে ভারতবর্ষে মাত্র কালিদাসেরই একাধিপত্য। যদি দ্বিতীয় একজনকে কিছু ভাগ দিতে আপত্তি না থাকে তবে বোধ হয় বিদ্যাপতির নাম করা অসঙ্গত হইবে না।" সত্যই উপমা-প্রয়োগের নিপুণতায় বিদ্যাপতি কবি কালিদাসের উত্তরাধিকারী। সৌন্দর্য্য-বর্ণনাচ্ছলে বিদ্যাপতি কথায় কথায় উপমা প্রয়োগ করিতেছেন। যেমন—

গোধূলি পেখল বালা
যব মন্দির বাহর ভেলা
নব জলধরে বিজুরী রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলা ॥

গোধূলির অন্ধকারে রাধিকাকে দেখিলাম যখন তিনি গৃহের বাহির হইলেন। দেখিয়া মনে হইল, সন্ধ্যার অন্ধকারের গায়ে গৌরী রাধার রূপ যেন নবমেঘের গায়ে বিদ্যুৎরেখার ভ্রম উৎপাদন করিয়া গেল।

কবি স্নানান্তে জলসিক্তা রাধিকার কেশগুচ্ছের বর্ণনা করিয়াছেন। সে সৌন্দর্য্যও উপমার সাহায্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে।—

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখল সিনানক বেলা ॥
চিকুর গলয় জলধারা।
মেহ বরিখ জনি মোতিম হারা ॥

আজ আমার শুভদিন, স্নানের সময়ে আমার রাধিকা দর্শন হইল। তাঁহার কেশ বহিয়া জলধারা পড়িতেছে, দেখিয়া মনে হইল মেঘ যেন মুক্তাহার বর্ষণ করিতেছে।

অন্যত্র—

কেশ নিঙ্গারইত বহ জলধারা।
চামরে গলয় জনি মোতিম হারা ॥
অলকহি তীতল তহি অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মনোলোভা ॥

নীরে নীরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুরে মণ্ডিত জনি পঙ্কজ পাতা॥

গৌরবর্ণা সুন্দরীকে স্নান করিয়া যাইতে দেখিলাম। কোথা হইতে সে রূপ চুরি করিয়া আনিল। তাহার কেশ হইতে জলধারা বহিতেছে, চামরে যেন মুক্তাহার ছিন্ন হইয়া ঝরিতেছে। আর্দ্র অলকাবলী জলসিক্ত হওয়াতে অত্যন্ত শোভা হইয়াছে। যেন মধুলোলুপ কমলকে অলিকুল ঘিরিয়াছে। অর্থাৎ, অলকদাম জলসিক্ত হইয়া মুখের উপর আসিয়া পড়াতে বোধ হইল যেন কমল (মুখ) ভ্রমরনিকরে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। জল লাগিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ ও অঞ্জনশূন্য যেন পদ্মপত্র সিন্দূরে মণ্ডিত হইয়াছে। রাধিকা দুই হাত জুড়িয়া তাঁহার মুখ ঢাকিতেছেন। দেখিয়া মনে হয় যেন কাম চম্পকদামের (=অঙ্গুলি) দ্বারা শারদ চন্দ্রের (মুখ) পূজা করিল।

জোড়ি ভুজ যুগ মোড়ি বেঢল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ-চন্দ॥

রাধিকার রূপ একগাছি সু-গ্রথিত পুষ্পমালিকার মত—

ধনী অলপ বয়সী বালা,
জনু গাঁথনি পুহপ মালা।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ যেমন উপমার সাহায্যে ব্যক্ত হইয়াছে, রাধিকার পূর্ব্বরাগও উপমার দ্বারা কবি ফুটাইয়া তুলিতেছেন।

কি কহব হে সখি কানুক রূপ।
কে পতিয়ায়ব সপন-সরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী রেহ॥

হে সখি! কানুর রূপের কথা কি বলিব! স্বপ্নস্বরূপ সে রূপে কে বিশ্বাস করিবে? জলধরের ন্যায় শ্যামল তাঁহার দেহ। সেই দেহে তিনি পীত বসন পরিয়া আছেন। দেখিয়া মনে হইতেছে, উহা যেন মেঘের কোলে বিদ্যুতের রেখার মত শোভা পাইতেছে।

বিদ্যাপতির উপমা-প্রয়োগনৈপুণ্য বিস্ময়কর। কিন্তু অনেক স্থলে উপমার আধিক্যে সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিকতা ঢাকা পড়িয়াছে।

বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্যতম বিশেষত্ব এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার পদাবলীতে রাধা-কৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করিয়া পার্থিব প্রেমই উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার এমন অনেক পদ আছে যেখানে রাধা-কৃষ্ণের নাম পর্য্যন্ত কবি উল্লেখ করেন নাই। সেই সব পদে সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের প্রেমিক-প্রেমিকার রূপটি রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-দর্পণ হইতে কবির কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। ঐ শ্রেণীর পদাবলীতে মর্ত্ত্যবাসী প্রেমিক-প্রেমিকার ব্যথা-বেদনা, আশা-আনন্দ যেন ভাষা পাইয়াছে। ঐ সকল কবিতায় একটা সার্ব্বজনীন আবেদন বা Universal appeal আছে।

বিদ্যাপতির কবিতার মধ্য দিয়া একাধারে তাঁহার কবিত্ব ও গভীর ঈশ্বর-ভক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদটি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥

কবি বলিতেছেন, জন্ম হইতে আমি তোমার রূপ দেখিতেছি, কিন্তু আজিও নয়ন পরিতৃপ্ত হইল না। তোমার মধুর বোল শ্রবণে শুনিলাম, তথাপি শ্রবণের পরিতৃপ্তি হইল না। কবি বলিতে চাহেন, সেই অনাদি অনন্ত পুরুষকে নিত্যকাল দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না। এই বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার যে মধুর ভাষা নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, তাহা শ্রবণ করিয়াও আমাদের শ্রবণের পরিতৃপ্তি হয় না। এই পদটি অতীন্দ্রিয় ভাবের দ্যোতক।

এই পদে যে প্রেম বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে একটা গভীর অতৃপ্তির ভাব জাগিয়া উঠিয়া পদটিকে অতীন্দ্রিয় ভাবের দ্যোতক করিয়া তুলিয়াছে। এখানে প্রেমের অসীম দুঃখের যে গভীর সুর, তাহাই ধ্বনিত হইতেছে। এ প্রেম Infinite passion—ইহার তৃপ্তি হইতে পারে না। সেই জন্য পাশ্চাত্য কবি Doune তাঁহার Lover's Infiniteness কবিতায় বলিয়াছেন—

Dear, I shall never have thee all.

কবি ব্রাউনিঙও বলেন যে, প্রেমের মধ্যে—

Only I discern—
Infinite passion, and the pain
Of finite hearts that yearn.

Two in the Campagna.

বিদ্যাপতির পদাবলী উহাদের অতুলনীয় আন্তরিকতা, গভীরতা ও মর্ম্মস্পর্শিতার জন্ত চিরকাল কাব্যরসিকগণের সমাদর পাইতে থাকিবে। কোনও প্রসিদ্ধ প্রতীচ্য লেখক বলিয়া গিয়াছেন—যাহা মানুষের হৃদয় হইতে বাহির হয়, তাহা সহজেই মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে। সত্যই, যে কথাটি আমাদের আন্তরিক, উহা কিছুতেই মর্ম্মস্পর্শী না হইয়া পারে না। বিদ্যাপতির পদাবলী তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে উৎসারিত হইয়াছে। সুতরাং সেগুলি যে আমাদিগের একান্ত মর্ম্মস্পর্শী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি আছে।

চণ্ডীদাস

চণ্ডীদাস বাঙ্গলার আদি কবি। তিনি বাঙ্গলার কাব্যকুঞ্জের আদি পিক। ইঁহার গানে সমস্ত বাঙ্গালী মুগ্ধ। চণ্ডীদাসের নাম জানেন না এমন বাঙ্গালী নাই বলিলেও চলে।

চণ্ডীদাসের গান ভক্ত ও ভাবুক সকলের নিকটেই প্রিয়। চণ্ডীদাসের কবিতা অসংখ্য। যেমন তাহার ভাবের সৌরভ, তেমনি তাহার গঠনের পারিপাট্য। ভাবের গভীরতায়, ভাষার মাধুর্য্যে ও ছন্দের ঝঙ্কারে সেগুলি অপূর্ব্ব। তাই বাঙ্গালী ভক্ত, ভাবুক ও জনসাধারণ সকলেই তাঁহার কবিতার রসাস্বাদন করিয়া মুগ্ধ। এই সকল কবিতা 'পদাবলী' নামে খ্যাত। পদাবলীসমূহ রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত।

কিন্তু যে চণ্ডীদাসের এত খ্যাতি, তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোনও তথ্য আজও জানা যায় নাই। তাঁহার যেটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার কাব্য হইতে অথবা প্রচলিত কিম্বদন্তী হইতে। রাঢ়দেশের বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণবংশে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়। চণ্ডীদাসের পিতামাতার নাম জানা যায় নাই। কেবল এইটুকু জানা গিয়াছে যে, তাঁহার পিতা নান্নুরের 'বিশালাক্ষী' বা 'বাশুলীর' পূজারী ছিলেন। চণ্ডীদাসও তাঁহার পিতার পর বাশুলীর পুরোহিত হইয়াছিলেন।

'বাশুলী' বীণাপাণি বা সরস্বতীরই নামান্তর। চণ্ডীদাসের উপাস্যা দেবী 'বাগীশ্বরী'—'বাশুলী' বা 'বিশালাক্ষী' নান্নুরে আজিও পূজা পাইতেছেন। এই মূর্তি চতুর্ভুজা। দুই হাতে তিনি বীণা বাজাইতেছেন। তাঁহার বাকী দুই হস্তের এক হস্তে পুস্তক, অপর হস্তে জপমালা।

চণ্ডীদাস যে বাশুলী দেবীর মন্দিরে বসিয়া জগজ্জননীর পূজা করিতেন, সে মন্দির আর নাই। সেখানে একটি ঢিপি বর্ত্তমান আছে; এই ঢিপির প্রতি পরমাণুতে চণ্ডীদাসের স্মৃতি বিজড়িত। এই ঢিপির উত্তরে বর্ত্তমান বাশুলী দেবীর মন্দির।

চণ্ডীদাস সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। শোনা যায়, চণ্ডীদাস নাকি লেখাপড়া জানিতেন না। কিন্তু একথা ঠিক নহে। তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কাব্য অনুশীলন করিলেই দেখা যায় যে, তিনি একাধারে কবি ও অসাধারণ পণ্ডিত। ভাগবতে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি তাঁহার কাব্যে বহু সংস্কৃত পদের কোমলতা সম্পাদনপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বেশ ভাল করিয়াই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক কাব্যে আমরা জয়দেবের অনেক গীতের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। এই কাব্যে কবির স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকসমূহও অপূর্ব্ব ও অনুপম।

চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ ছিলেন—বৈষ্ণব ছিলেন না। তবু তিনি রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং বৈষ্ণব সমাজে তাঁহার কাব্য বিশেষ সমাদৃত। ইহার কারণ, তাঁহার পদাবলীতে অনুভূতির গাঢ়তা আছে, আর আছে গভীর ঈশ্বরভক্তি। এই জন্য মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাঁহার পদাবলী শ্রবণ করিতে বড় ভালবাসিতেন।

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥ চৈতন্যচরিতামৃত,
আদিখণ্ড ॥

কবির জীবনকথা যেটুকু জানা গিয়াছে, তাহা বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু কবির প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কাব্যে। তাঁহার অসংখ্য খণ্ড খণ্ড পদ বা কবিতা পাওয়া গিয়াছে। আর পাওয়া গিয়াছে তাঁহার একখানি খণ্ডিত কাব্য। কাব্যখানির নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'। এই সকল উপকরণের মধ্য দিয়া

চণ্ডীদাসের কবি-হৃদয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—এই সকল রচনাবলীর মধ্য দিয়া কবির বর্ণনা-শক্তি ও অনুভূতি উপলব্ধি করিতে হয়। তাঁহার কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, সেগুলি যেমন মধুর তেমনি সরল—সেগুলিতে সহজ কথার মধ্য দিয়া গভীর ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাধাকৃষ্ণের কথা লইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলী রূপ পাইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহ—তাঁহাদের জীবন-লীলাই চণ্ডীদাস পদাবলীর উপজীব্য।

চণ্ডীদাস স্বভাবকবি। কবির বর্ণনা সহজ সরল। তাঁহার কবিতা আড়ম্বরবিহীন—তাই তাঁহার কবিতার ভাব আমাদের হৃদয়ের দ্বারে গিয়া পৌঁছায় অতি সহজেই। উপমা, অলঙ্কার প্রভৃতির বাহুল্যে তাঁহার কবিতার মাধুর্য্য কখনও ম্লান হয় নাই।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনা বিশেষত্বমণ্ডিত। চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। এইখানে বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার কল্পনা ও বর্ণনাভঙ্গীর পার্থক্য। বিদ্যাপতি সুখের কবি। বিদ্যাপতির রাধিকায় আমরা পাই প্রেমের চাঞ্চল্য, আনন্দের লীলা-লাস্য। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধিকায় বৈরাগ্য। বিদ্যাপতির রাধিকা নব-অনুরাগের উচ্ছলতা ও আবেগে সমুজ্জ্বল। আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি তিনি। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধিকায় স্তব্ধতা ও প্রগাঢ়তা, বেদনা ও করুণ কোমলতা। চণ্ডীদাসের রাধিকায় আমরা বয়ঃসন্ধির বর্ণনা পাই নাই—দেহজ সৌন্দর্য্যের কথা সেখানে নাই, সম্ভোগ চণ্ডীদাস পদাবলীর প্রধান সুর বা শেষ কথা নহে,—সে প্রেম অপার্থিব। চণ্ডীদাসে মাথুরের সকরুণ কথাটুকু অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী হইয়া বাজিয়াছে। বিদ্যাপতি বসন্তের কবি। তাঁহার কাব্যে হয় বিরহ, না হয় মিলন—ইহাই পাই। বিদ্যাপতির বিরহিণী রাধিকা কৃষ্ণ মিলনের জন্য কাতরা হইয়া পড়িয়াছেন। সেইজন্য বিরহানন্তর মিলনে বিদ্যাপতির রাধিকার আনন্দ যেন শতধারায় উচ্ছলিত হইয়া বাহির হইয়াছে। কিন্তু চণ্ডীদাসে মিলনের মধ্যেও বিরহের সকরুণ রাগিণী শুনিতে পাই—সেখানে নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যেও বিচ্ছেদের আশঙ্কা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কারণ রাধিকার প্রেম Infinite passion। এ প্রেমের তৃপ্তি হইতে পারে না। তাই—

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

চণ্ডীদাসের রাধিকার প্রেমে বেদনা আছে, কিন্তু অভিশাপ নাই। রাধিকার প্রেম মহাযোগিনীর তপস্যা—

বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা।

চণ্ডীদাসের রাধিকায় এই যোগিনী মূর্ত্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কারণ কবি জানেন যে, বেদনার মধ্য দিয়া, তপস্যার মধ্য দিয়া যে প্রেমের উপলব্ধি হয়, সেই প্রেম হইতেছে "The worship of the heart that heaven rejects not"।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয় ভাব পরিলক্ষিত হয়। পার্থিব প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে চণ্ডীদাসের পদাবলী সহসা সুর চড়াইয়া একটা অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে গিয়া পৌছিয়াছে।

চণ্ডীদাসের রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবামাত্রই কৃষ্ণপ্রেমে কাঙ্গালিনী হইয়াছেন। শ্যামের নাম শুনিয়া তাঁহার প্রতি তিনি আকৃষ্টা হইয়া বলিতেছেন—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

অতঃপর রাধিকা তাঁহার নিবিড় কুন্তল খুলিয়া তাহারই মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিরীক্ষণ করেন। আকাশের নীলিমার প্রতি, মেঘের প্রতি তিনি ধ্যানদৃষ্টিতে চাহিয়া বিভোর হইয়া থাকেন। ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠনীলিমাও তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে করাইয়া দেয়। তাই—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।

এবং— আউলাইয়া বেণী ফুলয়ে গাঁথনি
দেখয়ে খসায়া চুলি।
হসিত বদনে চাহে মেঘ পানে,
কি কহে দু হাত তুলি॥
এক দিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীখনে।

এইরূপে চণ্ডীদাসের রাধিকার আমরা একটা ধ্যানলীনতা, সাধিকার ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করিয়াছি। ইহার পর মিলন। সেই মিলনে, সেই প্রেমে কত বিহ্বলতা, কত অনুযোগ, কত অভিমান, কত মান! প্রগাঢ় প্রণয় অশেষ মিনতিতে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমের কথা বলিতে গেলে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া যায়, মন প্রেমে পরিপূর্ণ। তাই আশঙ্কায় তিনি বলিতেছেন—

গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি।

রাধিকা কতবার তাঁহার মনকে দমন করিতে চাহেন। কিন্তু অবাধ্য মন,—

যত নিবারয়ে তায়, নিবার না যায়।
আন পথে ধাই তবু কানু পথে ধায়॥

রাধিকার প্রেম চিরন্তন। শত দুঃখেও তাহা ম্লান হয় নাই, বরং আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রেম কোন প্রতিদান আশা করে না—একান্ত নিবেদনেই এ প্রেমের সার্থকতা। তাই বেদনায় সমুজ্জ্বল, দুঃখে মহীয়ান্ রাধিকার প্রেম আপন মহিমায় নিজেকে এক অপার্থিব লোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধিকার প্রেম দেহকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিলেও বৈরাগ্য ও দুশ্চর তপস্যাকে বরণ করিয়া উহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। রাধিকার প্রেম দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, দেহাতীতের স্পর্শ পাইবার জন্য এই প্রেম ব্যাকুল, তাই রূপ হইতে রূপাতীতের পথে এ প্রেম যাত্রা করিয়াছে।

চণ্ডীদাসের অসংখ্য পদাবলী ভিন্ন তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামক যে কাব্যখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, এই কাব্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত পদাবলীর রাধাকৃষ্ণলীলার বেশ একটু পার্থক্য আছে। পদাবলীর রাধিকা রাজা বৃষভানুর দুহিতা। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রাধিকা বৃষভানুনন্দিনী নহেন। তিনি সাগর গোয়ালার কন্যা, তাঁহার মাতার নাম পদুমা বা পদ্মা। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধিকা সাধারণ গোপবালা। সখীদিগের সহিত তিনি হাটে দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যান

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী অভিন্না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও তদ্রূপ। কিন্তু পদাবলীতে তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার পূর্ব্বরাগ নাই। শুধু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধিকা প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরূপা। শ্রীকৃষ্ণই প্রথমে রাধিকার প্রতি অনুরক্ত এবং দানছলে তিনি হাটে রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন। কিন্তু রাধা কৃষ্ণপ্রেম ক্রমাগতই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। চণ্ডীদাস-পদাবলীর নায়িকা রাধিকার কর্ণে শ্যামনাম মধুবর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু বড়ায়ির শত চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে পরিহার করিয়া চলিয়াছেন। পদাবলীর রাধিকার মত তিনি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর থাকেন না। কিন্তু শেষে শ্রীরাধা কৃষ্ণানুরক্তা বিগতলজ্জা নারী। তখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে রাধিকা ব্যাকুলা হইয়া বলিতেছেন—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নঈ কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়াই সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পদে নিশিবোঁ আপনা॥

যে রাধিকা পূর্ব্বে বারংবার বলিয়াছিলেন যে "কাল কাহ্নাঞি তোক বড় ডরাওঁ", সেই রাধিকা শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণের সহিত মিলনলোলুপা। বংশীরব তাঁহার বিরহ জাগাইয়া দেয়—

বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ
কাহ্নু গেলা কোন দিশে।
তা বিণি সকল অন্তর দহে
যেন বেআপিল বিষে॥

প্রচলিত চণ্ডীদাস—পদাবলীতে আছে—

কি লাগিয়া ডাকরে বাঁশী আর কিবা চাও।
বাকি আছে প্রাণ আমার তাহা লৈয়া যাও॥

এই পদটি যেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের উল্লিখিত অংশসমূহের প্রতিধ্বনি মাত্র। পৃথিবীর সমস্ত গীতি-কবিতার করুণা ও মর্ম্মস্পর্শী ব্যাকুলতায় যেন এই সকল পদের সৃষ্টি। প্রেমের আহ্বানে এবং প্রেমকে মহিমান্বিত করিবার জন্যই

জগতের সকল সুর ও সৌন্দর্য্যের উদ্ভব। মুরলীরব সেই প্রেমের আহ্বান।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কবির কল্পনাভঙ্গীতে, বর্ণনারীতিতে আরও অনেক বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। এই কাব্যে ব্রজের রাখাল নাই, সুবল সখা নাই, ললিতা বিশাখা নাই। এই সকল বিশেষত্ব চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের ভাবধারার নিদর্শন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যখানিকে চৈতন্যপূর্ব্ব যুগের রচনা বলিয়া আমাদের প্রতীতি জন্মে। ভাগবতাদি পুরাণে এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রভৃতি চৈতন্য-পূর্ব্বযুগের গ্রন্থাদিতে রাধার সখীগণের নামকরণ হয় নাই। ভাগবতে, গীতগোবিন্দে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সখীগণ রাধার প্রণয়নিবেদনের সহায়ক নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়ায়ি রাধিকার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, রাধার সখীগণ নহে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চণ্ডীদাসের পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের অপূর্ব্ব সম্মিলন। কিন্তু পদাবলীতে চণ্ডীদাসের বাণী সহজ, সরল, সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চণ্ডীদাসের উপর ভাগবত এবং জয়দেবের অসীম প্রভাব। কবি অনেক স্থানে ভাগবতের কাহিনী অথবা জয়দেবের সংস্কৃত পদাবলীর অনুবাদ করিয়া তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস সম্ভোগের কবি। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সম্ভোগের লেশমাত্র নাই—তাহা আমরা দেখিয়াছি। পদাবলীতে চণ্ডীদাস উপমা, অলঙ্কার পভৃতির বাহুল্যে সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিক রূপটিকে ক্ষুণ্ণ করেন নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে উপমার প্রয়োগ-বাহুল্য লক্ষিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন এবং চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদাবলীর মধ্যে ভাবের ও অলঙ্কারের উল্লিখিতরূপ বৈষম্য দ্বারা একথা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচয়িতা চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস একই কবি নহেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। একজনের আবির্ভাব হইয়াছিল প্রাক্‌চৈতন্য যুগে। ইনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি চণ্ডীদাস। ইনি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস নামে খ্যাত। অপরজন পরচৈতন্যযুগে আবির্ভূত হন। ইনি দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাস এই ভণিতায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চৈতন্যপূর্ব্বযুগের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রকট হইয়া আছে। দীন বা দ্বিজ চণ্ডীদাসে পরচৈতন্যযুগের বৈষ্ণবধর্ম্মের আভাষ সুস্পষ্ট হইয়া আছে। পদাবলীর এই

চণ্ডীদাস চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হইয়া পদরচনা করেন। তাই রাধার স্থান সেখানে উচ্চে—তিনি ভক্তিভাবের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেবেরই প্রতিবিম্ব।

শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে রাধাভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। তিনি মেঘ দর্শন করিয়া কৃষ্ণভ্রমে অচেতন হইতেন, তমাল তরুকে কৃষ্ণভ্রমে আলিঙ্গন করিতেন। বিদ্যুৎ-বিকীর্ণ আকাশ যখন প্রবল বারিবর্ষণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহার মধ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবেন, এই আশায় বিপদসঙ্কুল পথে অভিসার-যাত্রা করিয়াছেন। কৃষ্ণের নাম যিনি করিয়াছেন, তাঁহারই পায়ে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের এই জীবন চণ্ডীদাস প্রভৃতি পরচৈতন্যযুগে আবির্ভূত বৈষ্ণব কবিদিগকে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল। কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রগাঢ় প্রেম ও প্রেমের বৈচিত্র্য তাঁহারা মহাপ্রভুর জীবন হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং বলিতে হয় দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী-সাহিত্য চৈতন্য জীবনেরই ইতিহাস। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাসে চৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণব-প্রেমধর্ম্মের প্রভাব আদৌ নাই।

বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবির আবির্ভাব স্বীকৃত হওয়ায় এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বিচারের আবর্ত্তে পড়িয়া এই সমস্যার জটিলতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের এবং পদাবলীর চণ্ডীদাসের কবিত্ব রস আস্বাদন করিলে আমাদের অন্তঃকরণ সকল সমস্যা বিস্মৃত হইয়া স্বতঃই বলিয়া উঠে "আজ তুমি কবি শুধু নহ আর কেহ"।

গোবিন্দদাস

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে যে সকল বৈষ্ণব পদকর্ত্তার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে গোবিন্দদাসের নাম প্রথমেই করিতে হয়। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্যগণ গোবিন্দদাসের পদামৃতমাধুরী আস্বাদন করিয়া পুলকিত হইতেন। ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী একটি পদে লিখিয়াছেন—

ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা—
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্ব-গুণ,
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥

গোবিন্দদাস সত্যই দ্বিতীয় বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির অনুকরণকারীদিগের মধ্যে তিনিই অগ্রণী। তবে স্থানে স্থানে তিনি বিদ্যাপতিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদাবলী অপূর্ব্ব। যেমন তাঁহার ভাষার লালিত্য, ছন্দের বৈচিত্র্য, পদবিন্যাসের চাতুর্য্য তেমনিই তাহার আলঙ্কারিকতা ও ভাব-প্রকাশের কৌশল। গোবিন্দদাস পদ রচনা করিতে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ব্রজবুলি। তিনিই ব্রজবুলি সৃষ্টির পথপ্রদর্শক এবং তাঁহারই হস্তে ব্রজবুলি চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই ব্রজবুলি বাঙ্গলা ও মৈথিলী ভাষার সংমিশ্রণে জাত একটি কৃত্রিম ভাষা। ইহা বিদ্যাপতির সমসাময়িক মৈথিলী ভাষা হইতে উদ্ভূত এবং বাঙ্গলা ভাষার রসসম্ভারে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই ব্রজবুলির উদ্ভব হয় এবং আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত এই কৃত্রিম ভাষায় রচনা হইয়া আসিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণ এই ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাসকে টানিয়া আনিয়াছেন।

ব্রজবুলি কৃত্রিম ভাষা হইলেও গোবিন্দদাস এই কৃত্রিম ভাষায় যে অপরূপ লালিত্য ও ধ্বনিমাধুর্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এই ভাষা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকেও ব্রজবুলিতে কাব্য রচনায় আকৃষ্ট করিয়াছিল। কৃত্রিম একটি ভাষায় রচনা করিতে হইলে বিশেষ চাতুর্য্যের প্রয়োজন। চাতুর্য্যের দ্বারা যে কতখানি মাধুর্য্যের সৃষ্টি করা যায়, গোবিন্দদাসের পদাবলী তাহার উৎকৃষ্ট-তম নিদর্শন। গোবিন্দদাস ব্রজবুলি ভিন্ন বাঙ্গলাতেও কয়েকটি পদ রচনা করিয়াছেন।

গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভা বিদ্যাপতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক স্থলে রচনার লালিত্যে, ছন্দের ঝঙ্কারে ও অনুপ্রাস ইত্যাদি বিবিধ অলঙ্কারের প্রয়োগে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন।

গোবিন্দদাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পদাবলী ব্যতীত সংস্কৃতে 'সঙ্গীতমাধব' নামক নাটক এবং 'কর্ণামৃত' নামক কাব্য রচনা

করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদাবলীতেও সংস্কৃত কবিদিগের প্রভাব দেখা যায়। বহু সংস্কৃত কবির অলঙ্কার তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, অনেক সংস্কৃত কবিপ্রৌঢ়োক্তি তাঁহার কাব্যে রহিয়াছে। ছন্দ ও পদলালিত্যের জন্য গোবিন্দদাস জয়দেবের কাছেও ঋণী। বৈষ্ণব দর্শন ও অলঙ্কার সম্বন্ধেও তাঁহার অসীম জ্ঞান ছিল। এইরূপ পাণ্ডিত্য ও স্বীয় কবিত্ব শক্তির সাহায্যে তিনি তাঁহার কাব্যের বিষয়কে অধিকতর সুষ্ঠু করিয়া তুলিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের কবিত্বের প্রধান উপভোগ্য বিষয় হইতেছে অনুপ্রাস ঝঙ্কারের সাহায্যে অতুলনীয় শব্দচিত্র রচনা।

বিদ্যাপতির মত গোবিন্দদাস সম্ভোগের কবি—আনন্দের লাস্য, উল্লাস তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইয়াছে। গোবিন্দদাস অভিসারের কবি। জ্যোৎস্নাভিসার, দিবাভিসার, গ্রীষ্মাভিসার, তিমিরাভিসার প্রভৃতি অভিসারের এত বৈচিত্র্য কাহারও পদে লক্ষিত হয় না। তাঁহার অভিসারের পদে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য রাধার যে কি অসীম আকুতি, তাহা প্রতিটি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রিয়মিলনের জন্য তাঁহাকে কণ্টকাকীর্ণ পথে যাইতে হইবে, পিচ্ছিল পথে যাইতে হইবে, অন্ধকার পথ অতিক্রম করিতে হইবে। সুতরাং গৃহেই 'দুতর পন্থ-গমন ধনী সাধয়ে'। কণ্টক পুঁতিয়া তাহার উপর তিনি চলা অভ্যাস করিতেছেন, পদযুগলের নূপুর-শব্দ গোপন করিবার জন্য কাপড়ের দ্বারা তাহা বাঁধিয়া নিঃশব্দে চলা অভ্যাস করিতেছেন, কলসী হইতে জল ঢালিয়া পিচ্ছিল পথে গমন অভ্যাস তিনি করেন, রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহাকে অভিসার করিতে হইবে, তাই রাত্রি জাগরণ তিনি অভ্যাস করিতেছেন। হাতের কঙ্কণ দিয়া সাপের ওঝার কাছ হইতে তিনি সাপের মুখ বন্ধ করিবার ও সর্পকে বশীভূত করিবার মন্ত্র ও ঔষধ লইতেছেন। গুরুজনের কথা তিনি বধিরার মত শ্রবণ করেন। পরিজনের নিন্দা শুনিয়া তিনি হাস্য করেন।

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।

দুতর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥
কর যুগে নয়ন মুন্দি চলু ভাবিনী
তিমির পয়ানক আশে।
মণি কঙ্কণ-পণ ফণি-মুখ-বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে ॥
গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগুধি সম হাস
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

গোবিন্দদাসের বাৎসল্যরসের কবিতা, গোষ্ঠবিহারের পদ এবং গৌরচন্দ্রিকার পদও অপরূপ। রূপানুরাগ, রূপোল্লাস, রসালস্য, প্রেমবিহ্বলতা, মোহমাদকতা ও মিলনাকুলতাও গোবিন্দদাসের পদাবলীতে সুষ্ঠু রূপ পাইয়া অপূর্ব্ব ভাষায় ও ছন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অলঙ্কার প্রয়োগের পারদর্শিতায় গোবিন্দদাস বঙ্গসাহিত্যে অপরাজেয়। গোবিন্দদাসের অলঙ্কার বা মণ্ডনশিল্পে এতটুকু অস্বাভাবিকতা বা কৃত্রিমতা নাই। স্বাভাবিকতা তাঁহার কবিতার অলঙ্কারকে অপরূপ মর্য্যাদায় মণ্ডিত করিয়াছে। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার দুইয়েতেই তাঁহার পদাবলী সমৃদ্ধ।

ছন্দের হিল্লোল গোবিন্দদাসের পদাবলীর একটি বিশেষত্ব। হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার ছন্দকে হিল্লোলিত করিয়াছেন। এই নিমিত্তই তিনি ব্রজবুলিতে পদরচনা করেন। তাঁহার অনেক পদে অর্থালঙ্কার না থাকিলেও, অন্য কোন মাধুর্য্য না থাকিলেও শুধুমাত্র ছন্দ হিল্লোলে তাহা শ্রুতিসুখকর সঙ্গীতধর্ম্মী। যেমন—

নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ ॥
প্রেম-আকুল গোপ গোকুল কুলজ কামিনী কন্ত।
কুসুম-রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল কুঞ্জ মন্দির সন্ত ॥
গণ্ড-মণ্ডল লোল কুণ্ডল উড়ে চূড়ে শি-খণ্ড।
কেলি তাণ্ডব তাল পণ্ডিত বাহু দণ্ডিত দণ্ড ॥

কঞ্জ লোচন কলুষ-মোচন শ্রবণ রোচন ভাষ।
অমল কমল চরণ কিসলয় নিলয় গোবিন্দদাস ॥

অভিসারের নিম্নোদ্ধৃত পদটিতেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন-ব্যাকুলতা অপূর্ব্ব ছন্দোহিল্লোলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তঁহি অতি দূরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস সুরধুনি পার ॥

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। গুরুর উপযুক্ত শিষ্যত্বও তিনি করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ বহু পদ গোবিন্দদাস পূর্ণ করিয়া গুরুর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে নরহরি দাস বলিয়াছেন—

অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিদ্যাপতি পহুঁ পরলোকে করিলা গমন।
গুরুর আদেশ-ক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে সে সকল করিল পূরণ ॥

"প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেলা—ন ভেল যুগল পলাশা"—প্রভৃতি বিদ্যাপতির বহু বিখ্যাত পদ গোবিন্দদাস পূরণ করেন।

শ্রীরাধিকার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য গোবিন্দদাস অতিশয় দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের পদাবলীর শুধু মণ্ডন-শিল্পই অসাধারণ নয়। তাঁহার রাধিকার পরিকল্পনাও বিশেষত্ব মণ্ডিত। গোবিন্দদাস রাধিকার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে শরীরিণী বলিয়া মনে হয় না। কবি অনেক ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র রাধার রূপের লাবণ্য-দ্যুতিটুকুকে ফুটাইয়া তুলিয়া তাঁহার স্থূল দেহাংশটুকুকে হরণ করিয়া লইয়াছেন। রূপের দীপ্তি রাধিকার দেহ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া দেহাতীত এমন একটা কবি-কল্পনায় পর্যবসিত হইয়াছে, যাহা সৌন্দর্য্যের ভাবপ্রতিমা—যাহার সহিত শরীরীর প্রণয় সম্ভব নহে। রাধাকে অবলম্বন করিয়া কবির মানসলোকের সৌন্দর্য্যকল্পনা এই শ্রেণীর পদে ব্যক্ত হইয়াছে। যেমন—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ্গ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল-উতপল-বন ভরই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ-কুমুদ পরকাশ॥

যেখানে যেখানে রাধিকার ক্ষীণ অঙ্গজ্যোতি নির্গত হয়, সেখানে সেখানে বিদ্যুতের দ্যুতি খেলিয়া যায়। যেখানে যেখানে তাঁহার অরুণ চরণের পাদক্ষেপ পতিত হয়, সেখানে সেখানে যেন স্থলপদ্ম স্খলিত হয়। যেখানে তাঁহার ভ্রূভঙ্গ চপলতা পতিত হয়, সেখানে কালিন্দীর হিল্লোল যেন উছলিয়া উঠে। যেখানে তাঁহার চঞ্চল দৃষ্টি পড়ে, সেখানে নীল পদ্মের বন যেন ঝলমল করিয়া উঠে। তাঁহার মধুর হাস্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িলে মনে হয় কুন্দ ও কুমুদ ফুল যেন প্রকাশ পাইল।

রাধিকার এ সৌন্দর্য্য বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য। কবির বর্ণনাকৌশলে সৌন্দর্য্যের কল্পনাটুকু এই পদে রূপ পাইয়াছে। গোবিন্দদাসের এই পদে বিদ্যাপতির—

যঁহা যঁহা পদযুগ ধরই।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
যঁহা যঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরি-তরঙ্গ॥
যঁহা যঁহা নয়ন-বিকাশ।
তঁহি তঁহি কমল পরকাশ॥
যঁহা লহু হাস সঞ্চার।
তঁহি তঁহি অমিয় বিথার॥
যঁহা যঁহা কুটিল কটাখ।
তঁহি তঁহি মদন শর লাখ॥

এই পদের ভাব ও ভাষার প্রভাব আছে। ইংরেজ কবি মিলটনের 'প্যারাডাইস লষ্ট' কাব্যেও এইরূপ সৌন্দর্য্যকল্পনা আছে—

Grace was in all her steps,
Heaven in her eye,
In every gesture dignity and love.

চণ্ডীদাসের রাধিকার প্রেমে প্রগাঢ়তা আছে, বিদ্যাপতিতে আছে যৌবনের আনন্দোচ্ছ্বাস ও চাঞ্চল্য, গোবিন্দদাসে আছে প্রেমের তীব্রতা ও প্রেমের জন্য দুঃসহ ত্যাগস্বীকার। দুঃসহ ত্যাগের মধ্য দিয়া গোবিন্দদাসের রাধিকার প্রেম সার্থক ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরের প্রকৃতিতে দুর্যোগময়ী রাত্রি আসিল কি না "ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত" হইল কি না, সূচীভেদ্য অন্ধকার আসিল কি না, রাধিকার তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। চণ্ডীদাসের রাধিকার মত গোবিন্দদাসের রাধিকার প্রেম মহাযোগিনীর তপস্যা। প্রেমাস্পদকে লাভ করিবার জন্য রাধিকা দুশ্চর তপস্যা সুরু করিয়াছেন। অভিসারের যাত্রাপথ দুর্গম ও বন্ধুর। তাই সংশয়াকুল কবি রাধিকাকে প্রশ্ন করেন—'সজনি কৈসে করবি অভিসার?' কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি রাধিকাকে এমন আকুল করিয়াছে যে, সম্মুখের বিপদসঙ্কুল অনিশ্চিতের পথ অতিক্রম করার জন্য তিনি সাধনা করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদে মাঝে মাঝে মিলনের মধ্যেও বিচ্ছেদের সুরটি বাজিয়া উঠিয়া রাধিকার প্রেমকে অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে—

দুহুঁ কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।—চণ্ডীদাস
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন ন গেল॥—বিদ্যাপতি

গোবিন্দদাসের পদেও এইরূপ Infinite Passion বা প্রেমের অতৃপ্তির সুরটুকু বাজিয়া উঠিয়া রাধিকাকে মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছে—

কোরে রহিতে যো মানয়ে দূর।
সো অব কৈসন ভিন ভিন ঝুর॥ গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাসের অভিসারের পদ যেমন অপূর্ব্ব, তাঁহার বিরহের পদও

তেমনি মাধুর্য্যমণ্ডিত। গোবিন্দদাসের অঙ্কিত বিরহিণী রাধিকা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

যো যদি জানিতাম পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া॥
কেন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল॥

অন্যত্র—

যাহক লাগি গুরু-গঞ্জনে মন রঞ্জলুঁ
দুরজনে কিয়ে নাহি কেল
যাহক লাগি কুলবধূ বরত সমাপল
লাজে তিলাঞ্জলি দেল।

সজনি জানিনু কঠিনু কঠিন পরাণ,
ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরাণ॥

বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইবেন ইহা শুনিয়াও তাঁহার কঠিন প্রাণ বাহির হইল না দেখিয়া রাধিকা এই আক্ষেপোক্তি করিতেছেন। বিরহিণীর এই ক্রন্দন, এই বেদনা হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া গভীরভাবে আলোড়িত করিয়া তুলে। কারণ অলঙ্কারের দ্বারা এখানে রাধিকার বেদনার তীব্রতা এতটুকু আচ্ছন্ন হয় নাই, ঢাকা পড়ে নাই। প্রাকৃতিক প্রতিবেশের মধ্যে বিরহিণীকে স্থাপনা করিয়া প্রিয়মিলনের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতাটুকুকে ফুটাইয়া তোলা যায়। যেমন বিদ্যাপতির—

ঈ ভর ভাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

কিংবা—

সাহর মঞ্জর ভ্রমর গুঞ্জর।
কোকিল পঞ্চম গাব॥

দখিন পবন বিরহ-বেদন।
নিঠুর কন্ত ন' আব॥

অথবা চণ্ডীদাসের—

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ॥

* * * *

কেমনে বঞ্চিবো রে বরিষা চারি মাস।
এ ভরা যৌবন কাহ্নু করিল নিরাস॥

অন্যত্র—

চারিদিকে তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।
আম্র ডালে বসি কুয়িলী কুহলে
লাগে বিষ বাণ ঘাএ॥

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসে এইরূপ বর্ষা ও বসন্তের আগমনে রাধিকার বিরহ-জ্বালা বাড়িয়া উঠিয়া তাঁহাকে প্রিয়মিলনের জন্য ব্যাকুলা করিয়াছে। কিন্তু গোবিন্দদাস তাঁহার রাধামূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে কোন প্রাকৃতিক প্রতিবেশের সৃষ্টি করেন নাই, অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্য দ্বারা রাধিকাকে আবৃত করিয়া দেখান নাই। তথাপি বেদনায় আতুর, দুঃখে ম্রিয়মান যে নারী-মূর্ত্তিটি গোবিন্দদাসের তুলিকার রেখায় আকারময়ী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রত্যেক ভাবুক-হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিবে।

গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকার পদও অপূর্ব্ব। এই শ্রেণীর পদে অলঙ্কারের বাহুল্য নাই। গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকার পদের বিশেষত্ব উহার স্বাভাবিকতা। গৌরাঙ্গের ভাবমূর্ত্তি গোবিন্দদাসের কবিতায় পরিস্ফুট। গোবিন্দদাস ভক্ত কবি ছিলেন। গৌরচন্দ্রিকায় ও প্রার্থনাসঙ্গীতে গোবিন্দদাসের ঐকান্তিকী ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ভক্তির আবেগে বা উচ্ছ্বাসে গৌরাঙ্গের লীলামাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

গোবিন্দদাসের উপর বিদ্যাপতির মত চণ্ডীদাসের কল্পনা ও বর্ণনাভঙ্গীর প্রভাবও ছিল। রাধার মধ্যে তিনি যেখানে তপস্বিনীর একাগ্রতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, নিবিড় মিলনের মধ্যেও যেখানে বিচ্ছেদের সুরটিকে বাজিয়া

উঠিতে দেখিয়াছেন—সেখানে চণ্ডীদাসের প্রভাব। আবার রাধার আনন্দমূর্ত্তি বিদ্যাপতির কাব্য হইতে প্রতিফলিত। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির কল্পনাভঙ্গী গোবিন্দদাসের প্রতিভা দ্বারা মণ্ডিত হইয়া অপরূপ বিশিষ্টতায় রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও গোবিন্দদাসের কল্পনা ও বর্ণনার মৌলিকতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

জ্ঞানদাস

পরচৈতন্যযুগে আবির্ভূত পদরচয়িতাগণের মধ্যে জ্ঞানদাস একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র লীলাকাহিনী অপূর্ব্ব ভাষায়, ছন্দে এবং কল্পনাভঙ্গীতে মণ্ডিত হইয়া উৎসারিত হইয়াছে। চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগের পদাবলী শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রেমলীলার আবেগ ও অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। জ্ঞানদাসের পদাবলীতেও মহাপ্রভুর জীবনদর্পণ হইতে রাধাভাব প্রতিফলিত হইয়া যেন একটি প্রত্যক্ষ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কবির পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কল্পনাসর্ব্বস্ব নহে, তাহা বাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহার রাধিকা

সখী কাঁধে হাত দিয়া অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবনে প্রবেশিল শ্যাম জয় দিয়া॥

যেন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল শ্রীচৈতন্যদেবেরই প্রতিমূর্ত্তি।

গোবিন্দদাসের পদাবলীতে যেমন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই উভয় কবির প্রভাব লক্ষিত হয়, তেমনি জ্ঞানদাসেও বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস—উভয় কবির প্রভাবই বর্ত্তমান। তবে চণ্ডীদাস অপেক্ষা বিদ্যাপতির প্রভাবই গোবিন্দদাসে অধিক। জ্ঞানদাসে বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের প্রভাব অধিক।

বর্ণনার প্রাঞ্জলতায় এবং অলঙ্কারের স্বাভাবিকতায় চণ্ডীদাসের পদাবলী অপরূপ। জ্ঞানদাসের কবিতায় তাহাই প্রধান আকর্ষণ। চণ্ডীদাসের মত জ্ঞানদাসে প্রাণের সহজ সরল অনুভূতি স্বাভাবিক অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া

প্রকাশ পাইয়াছে। কোনরূপ কৃত্রিমতায় তাহা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অলঙ্কার-বাহুল্য পরিত্যাগ করিয়া, তাবার কৃত্রিম উচ্ছ্বাস বর্জ্জন করিয়া জ্ঞানদাস রাধার চিত্তের আকুলতাকে মর্ম্মস্পর্শী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও নিবেদনের পদরচনায় জ্ঞানদাসের অপরূপ নিপুণতার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। বিরহের পদরচনাতেও জ্ঞানদাস কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহার পূর্ব্বরাগের পদে এমন একটা উদ্বেগ, এমন একটা আকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহা অলঙ্কারের বিপুল বর্ণচ্ছটা ভিন্নও এক রসঘন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যথা—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥

রাধিকার অন্তরে প্রণয়-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে যে মর্ম্মস্পর্শী বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে তাহা উল্লিখিত পদে ভাষা পাইয়া রাধিকার মূর্ত্তিটিকে যেন সজীব করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার প্রিয়মিলনের নিবিড়তা ও আকুলতা এখানে যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে।

আলো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর কূলে।
চিত মোর হরিয়া নিল কালিয়া নাগর ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

এখানেও পূর্ব্বরাগের অন্তর্গূঢ় বেদনা রাধিকার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে বেদনার সমুজ্জ্বল এক অপরূপ নারীমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত করিয়াছে।

জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদাবলীতেও এইরূপ একটা বেদনার সুর ঝঙ্কৃত হইয়া তাঁহার পদাবলীকে এক অপূর্ব্ব বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিয়াছে।

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥

জ্ঞানদাসের নিবেদনের পদেও আত্মসমর্পণের জন্য যে ঐকান্তিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও অপূর্ব্ব। শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগে নিমগ্ন হইয়া রাধিকা বলিতেছেন—

তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বর ধরী॥

* * *

তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি॥

কারণ—'এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ' শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে রাধিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

জ্ঞানদাস সহজ ভাষায় সরলভাবে রাধিকার অন্তর্জ্জগতের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের পদাবলীতে রাধিকার দেহজ সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাঁহার অন্তর্জ্জগতের সৌন্দর্য্যই বেশী প্রকট হইয়া আছে। কাব্যে নায়িকার রূপ-বর্ণনা সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের প্রচলিত রীতি। সকল দেশের কাব্য-সাহিত্যে দেখা যায় যে, নায়িকার রূপ—তাহার আকর্ষণী-শক্তির কথা সাধারণভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অথবা তাহার দেহের দুই একটি প্রধান অঙ্গের বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবির দৃষ্টি গিয়াছে রূপের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের দিকে—তাহারও অন্তরালে বাহ্যিকরূপের অন্তরালে যে প্রেমবিহ্বল হৃদয় আছে, বৈষ্ণব কবিগণ তাহার সৌন্দর্য্যও উদ্‌ঘাটিত করিয়া আমাদিগের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাস রাধিকার দেহজ রূপের বর্ণনায় ব্যাপৃত না হইয়া অন্তর্জ্জগতের ব্যথা-বেদনার রূপই উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন।

জ্ঞানদাসের বিরহবিষয়ক কোন কোন পদে বিদ্যাপতির বিরহবিষয়ক পদের ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়া সেই সকল পদকে অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার বিরহিণী রাধিকা বলিতেছেন—

মাধব কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি দিবস গোঙাইতে জীবন ভেল অতি ভার॥
পন্থ নেহারিতে নয়ন আঁধাওল দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল বরিখে বরিখে কত ভেল॥
আওব করি করি কত পরবোধব অব জীউ ধরই না পার।
জীবন-মরণ চেতন-অচেতন নিতি নিতি তনু ভেল ভার॥

বিরহিণীর এই ক্রন্দন বড় করুণ। এই পদটিতে রাধিকার যে আর্ত্তি ফুটিয়াছে তাহা শুধু রাধার নহে, ইহা নিখিল মানবের বেদনা। এই শ্রেণীর পদে একটা সার্ব্বজনীন আবেদন (universal appeal) রহিয়াছে।

জ্ঞানদাস বাঙ্গলায় ও ব্রজবুলিতে—উভয় ভাষাতেই পদরচনা করিয়াছেন। তাঁহার ব্রজবুলির পদে পাণ্ডিত্য ও রচনা-পারিপাট্যের পরিচয় আছে। কিন্তু তাঁহার বাঙ্গলা পদাবলীতে কবির প্রাণের আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কৃত্রিমতার বা অস্বাভাবিকতার লেশ তাহাতে নাই।

বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে জ্ঞানদাস ছন্দ, উপমা, বর্ণনাভঙ্গী প্রভৃতির আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের ব্রজবুলিতে বিদ্যাপতির প্রভাব। কিন্তু তাঁহার খাঁটি বাঙ্গলা ভাষায় রচিত পদে চণ্ডীদাসের কল্পনাভঙ্গী, বর্ণনা-রীতি, এমন কি ভাষার প্রভাব অনুভূত হয়। চণ্ডীদাসের রাধিকার প্রেমে যে ঐকান্তিকতা এবং আকুতি ফুটিয়াছে, জ্ঞানদাসে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের হৃদয়াবেগের আতিশয্য জ্ঞানদাসে লক্ষিত হয়। তবে জ্ঞানদাসে শুধুমাত্র অনুকরণ বা প্রভাব নাই। তাঁহার পদাবলীতে স্বকীয়তা এবং মাধুর্য্যও যথেষ্ট আছে—মৌলিক কবিকল্পনা ও বর্ণনাভঙ্গী যে জ্ঞানদাসে ছিল, তাহা অনস্বীকার্য্য।

চণ্ডীদাস দুঃখের কবি—বিদ্যাপতি সুখের কবি। জ্ঞানদাসে এ দুইয়েরই মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির মত তিনি সম্ভোগ-মিলনের কথাও গাহিয়াছেন, আবার মাথুরের সকরুণ রবও তাঁহার পদাবলীতে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের মত মিলনের মধ্যেও বিচ্ছেদের সুর জ্ঞানদাসে বাজিয়াছে। জ্ঞানদাসের রাধিকা—

হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া
চন্দন না মাখে অঙ্গে।

এবং—

কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে
তেঁঞি সদাই লয় নাম।

মিলনের মধ্যেও এইরূপ একটা বিচ্ছেদের সুর বাজিয়া উঠিয়া জ্ঞানদাসের রাধিকার অনুরাগের ভাবগভীরতা অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

রাধাপ্রেমের সূক্ষ্ম বৈচিত্র্যের কথা অবশ্য জ্ঞানদাসে তেমন ফুটে নাই। ভাব অথবা বর্ণনার বৈচিত্র্য গোবিন্দদাসে যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, জ্ঞানদাসে তাহা নাই। প্রেমের সূক্ষ্মত্ব গোবিন্দদাস যেরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, জ্ঞানদাসে তাহার অভাব। কিন্তু অনাড়ম্বর ভাষায় প্রেমের আকুতি ও আর্ত্তিকে যে কতখানি মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তোলা যাইতে পারে, জ্ঞানদাসের পদাবলী তাহার উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

অনুবাদ-সাহিত্য

কৃত্তিবাস ও বাঙ্গলা রামায়ণ

ভাষা ও সাহিত্যের সৌন্দর্য্যসাধনের জন্য মৌলিক কাব্যরচনার যেমন প্রয়োজন আছে, অনুবাদ-সাহিত্যের তেমনি প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজন মিটাইবার নিমিত্ত বঙ্গ-সাহিত্যে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ হইয়াছিল। বাঙ্গলায় উল্লিখিত যে তিনখানি সংস্কৃত-গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছিল, তাহার কোনটিই মূল গ্রন্থের অন্ধ অনুকরণে পর্য্যবসিত হয় নাই। অনুবাদ করিতে গিয়া কবিগণ কোথাও কোথাও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, কোথাও বা অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। অনুবাদের মধ্য দিয়াও কবিগণের কল্পনাস্রোত ও কবিত্ব অবাধে উৎসারিত হইয়া অনূদিত কাব্যগুলিকে পল্লবিত ও পুষ্পিত করিয়া তুলিয়াছে।

অনূদিত কাব্যসমূহের মধ্যে রামায়ণ কাব্যখানি বাঙ্গালীর নিকট বিশেষ প্রিয়। আদি কবি বাল্মীকির কবিবীণায় যে রামায়ণ গান সর্ব্বপ্রথম উৎসারিত হইয়াছিল, বাঙ্গলায় কৃত্তিবাসই তাহার প্রথম অনুবাদক। কৃত্তিবাস বাঙ্গলার চিরপ্রিয় কবি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ-কথা দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ-অন্তঃপুর পর্য্যন্ত সবিশেষ অনুরাগের সহিত পঠিত হইতেছে। লোকস্মৃতির কষ্টিপাথরেই কবিত্বের অন্যতম পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় কবি কৃত্তিবাস উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সুদীর্ঘ চারি শত বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি কৃত্তিবাসের স্মৃতি সকলের অন্তরে অম্লান রহিয়াছে। যুগে যুগে বাঙ্গলার উপর দিয়া কত দুর্য্যোগ গিয়াছে—কত বিজাতীয় অত্যাচারে দেশ বিধ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কৃত্তিবাসের যশ এতটুকু হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার রামায়ণ-গাথা আজিও সকলের মুখে মুখে শোনা যায়। ইহাতে রামায়ণকাব্যের জনপ্রিয়তা ও কবির শ্রেষ্ঠত্ব উভয়ই প্রমাণিত হয়। তিনি কাব্যলক্ষ্মীর বরমাল্য লাভ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার রচিত চির-নবীন রামায়ণ-গাথা আজিও আমাদের আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছে। রামায়ণী-শিক্ষার মহোচ্চ আদর্শে তিনি বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। রামায়ণ হইতে আমরা রাজধর্ম্মের, সতীত্বের,

ভ্রাতৃপ্রেমের এবং সত্যপালনের উজ্জ্বল আদর্শ লাভ করিয়াছি। উল্লিখিত মহোচ্চ আদর্শসমূহ বঙ্গের সমাজকে চিরকাল অকল্যাণের পথ হইতে কল্যাণের পথে চালনা করিয়াছে ও করিতেছে। এইজন্য বঙ্গের সারস্বত-কুঞ্জের মহাকবি কৃত্তিবাসের মহাবীণা চিরদিন ঝঙ্কৃত হইতে থাকিবে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের হুবহু অনুবাদ নহে। কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিতে গিয়া তাঁহার কল্পনাকে বাল্মীকি-প্রদর্শিত পথে চালিত করেন নাই। কবি অনেক স্থানেই বাল্মীকি-প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে তাঁহার কল্পনাকে প্রবাহিত করাইয়াছেন—নূতন ভাবে চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনা-বর্ণনা করিয়াছেন। রামায়ণে কৃত্তিবাসের কল্পনা, কবিত্বশক্তি, সৃজনীপ্রতিভা ও চরিত্র- চিত্রণশক্তি চমৎকারভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

রামের প্রতি ভক্তির উদ্রেক করাই রামায়ণ কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত কৃত্তিবাস অন্ধভাবে বাল্মীকির অনুকরণ করিয়া রাম-চরিত্র অঙ্কন করেন নাই।

রামচন্দ্রের চরিত্র-বর্ণনায় কৃত্তিবাস অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন, যাহা বাল্মীকি বলেন নাই। বাল্মীকি-রামায়ণে রামচরিত্রের বিশেষত্ব—তিনি বীর। কঠোরতায় ও দৃঢ়তায় তিনি এক বিশাল পুরুষ। আবার, তাঁহার চিত্ত "মৃদুনি কুসুমাদপি"—শিরীষ ফুলের মত কোমল। বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্রের চিত্রে এইরূপ কোমলতা ও কঠোরতার অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটিয়াছে। বাল্মীকি-চিত্রিত এই রামচন্দ্রে এবং কৃত্তিবাসের রামচন্দ্রে অনেক প্রভেদ। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে রামচন্দ্রের যে চিত্রটি আঁকিয়াছেন, উহাতে রামচন্দ্রের কেবল শ্যামসুন্দর পল্লবের মত স্নিগ্ধ-কোমল ভাবটুকুই সরস-সুন্দর হইয়া ফুটিয়াছে। তাঁহার বীরত্ব ও বৈরাগ্যের মহিমা কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্জ্জিত হইয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণে আছে যে, কৌশল্যা রামের বনবাস উপলক্ষ্যে বনগত পুত্রকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—"রাম পুষ্পবৎ কোমল উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা-সুখ উপভোগ করিত, এখন নিজের বজ্রের মত বাহুর উপর মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে কিরূপে?" রামচন্দ্রকে কঠোর করিয়া চিত্রিত করিবার নিমিত্ত বাল্মীকি বলিয়াছেন যে, গুহকের আশ্রমে রামচন্দ্র তাঁহার কঠিন পরিঘোপম বাহুকে উপাধান করিয়া তৃণশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বাহু-নিপীড়নে তথাকার তৃণগুলি শুকাইয়া গিয়াছিল। মূল রামায়ণে

রামচন্দ্র কুসুমকোমল নহেন। তিনি ঊনষোড়শবর্ষে হরধনু ভঙ্গ করিবার সামর্থ্য রাখিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহার ভয়াবহ বীরমূর্ত্তি দেব-দানবের অন্তরেও ভয়ের সৃষ্টি করিত। মারীচ তাঁহার ভয়াবহ মূর্ত্তি ভুলিতে পারে নাই। তাই সে রাবণের নিকট বলিয়াছিল—"বৃক্ষে বৃক্ষে আমি করাল মৃত্যুসদৃশ ধনুষ্পাণি রামচন্দ্রের মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি।" রামচন্দ্রকে বীরত্বের মহিমায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্যই বাল্মীকি রামচন্দ্রকে এইরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে বাল্মীকির রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় বীর—শৌর্য্যে ও বীরত্বে তিনি অদ্বিতীয়। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্রের বীরত্ব-মহিমা তেমন ফুটে নাই। ফুটিয়াছে রামচন্দ্রের কুসুম-সুকুমার মূর্ত্তিটি। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্রের বীরত্ব-মহিমা খানিকটা হ্রাস পাইয়াছে বটে, কিন্তু কাব্যশ্রী তাঁহাকে অধিকার করিয়া করুণকোমল সরসসুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। কৃত্তিবাস বলিয়াছেন, রামচন্দ্রের "নবনী জিনিয়া তনু অতি সুকোমল।" তাঁহার বাহু কিশলয়ের মত কোমল। কৃত্তিবাস তাঁহাকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বনে বনে বিচরণ করিতে দেখেন নাই। তিনি দেখিয়াছেন—"ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে।"

কি কারণে কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের বীরত্বের মহিমা বর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে কুসুমকোমল করিয়া গড়িলেন, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। বাঙ্গালী নিজে কুসুমকোমল। কৃত্তিবাস বুঝিয়াছিলেন যে, কুসুমকোমল বাঙ্গালীর নিকট রামচন্দ্রের ক্ষত্রিয় বীরের কঠোর মূর্ত্তি তেমন হৃদয়গ্রাহী হইবে না। কিন্তু রামচরিত্রের শিরীষ কুসুমের মত যে কোমলতা, তাহা বাঙ্গালীকে নিশ্চয় মুগ্ধ করিবে। এইজন্যই কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম 'বজ্রাদপি কঠোর' নহেন। তিনি কোমলতার প্রতিমূর্ত্তি। এই কোমলতার জন্যই রামচরিত্র আমাদের নিকট এত প্রিয়; কঠোরতা এবং বীরত্বের মহিমার জন্য নহে। কৃত্তিবাস যদি রামচন্দ্রকে কেবল বীরত্বের মহিমায় মহিমান্বিত করিতেন, তাহা হইলে রামায়ণ আমাদের নিকট এত প্রিয় হইত কিনা সন্দেহ। কৃত্তিবাসে অনেক স্থলেই নূতনত্ব আছে। কবির স্বকপোলকল্পিত কল্পনায় রামায়ণের বহু অংশই এক অপরূপ মধুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কৃত্তিবাসে মূলের অনুসরণও আছে। তিনি মূল রামায়ণকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া রামায়ণ রচনা করেন নাই।

বাল্মীকি রামায়ণে পিতৃভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, রাম-লক্ষ্মণ-ভরতের সৌভ্রাত্র ও ত্যাগ, প্রজানুরঞ্জন, পতিভক্তি প্রভৃতির যে উচ্চতম আদর্শ বর্ত্তমান, তাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণেও খুব সফলতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে।

চরিত্রচিত্রণে ও ঘটনাবর্ণনায় কবি কৃত্তিবাস সবিশেষ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রত্যেকটি চরিত্র আপন আপন বিশেষত্বে মনোহর। তাঁহার অনুবাদ সরস। (এই কারণে বাঙ্গালীর নৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম-জীবনের উপর ইহা অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মানুষের কল্পনায় যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু সুন্দর—প্রেম, ভক্তি, প্রীতি ও সত্যপালন, এ সমস্তই কৃত্তিবাসী রামায়ণে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।)

(আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণ 'করুণার অশ্রুনির্ঝর'। যেমন বাল্মীকি-রামায়ণের, তেমনি কৃত্তিবাসী-রামায়ণের বিশেষত্ব—করুণ রসের প্রাধান্য। কৃত্তিবাস বাল্মীকির অনুসরণ করিয়া তাঁহার কাব্যখানিকেও করুণ-রস-প্রধান করিয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্রের বীরত্ব-মহিমা বর্ণিত হইলেও, করুণ-রসই প্রধান হইয়া সমগ্র রামায়ণখানিকে বিয়োগাত্মক-কাব্যের মহিমা দান করিয়াছে। রামচন্দ্রের বনবাস, দশরথের পুত্রশোক, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাসের দুঃখ, রাবণের সীতাহরণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ভরতের সন্ন্যাসব্রত ধারণ করিয়া দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্যশাসন—এ সমস্তই করুণ-রসের উৎস। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—'রামায়ণ করুণার অশ্রু-নির্ঝর।')

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অধিকাংশ কবির জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিবার উপায় নাই। কারণ কবিগণ তাঁহাদের জীবনী সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা কোন আত্মজীবনী রচনা করিতেন না। অন্য কেহও কবিগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত না। কিন্তু কবিগণ সাধারণতঃ তাঁহাদের কাব্যে ভণিতা দেওয়ার ছলে, অথবা প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভণিতা হইতে কবির সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জানা যায় যে, তিনি বিচক্ষণ কবি ছিলেন। তিনি বহু স্থানেই বলিয়াছেন—'কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।' কৃত্তিবাস পণ্ডিতও ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে ॥

রামায়ণের ভণিতা ভিন্ন কৃত্তিবাসের পরিচয় জানিবার আর একটি উপকরণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা কবির আত্মবিবরণ। কবি একটি বিবরণীতে স্বীয় জীবনের কতকগুলি কথা বলিয়া রামায়ণ রচনার কারণ প্রভৃতি নির্দেশ করিয়াছেন। কবির এই আত্মবিবরণীটি বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে অমূল্য। এই আত্মবিবরণী হইতে জানা যায় যে, কৃত্তিবাস মুখটি ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের নিবাস ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রাম। কৃত্তিবাসের প্রপিতামহের নাম নরসিংহ ওঝা—ওঝা নবাব-দত্ত উপাধি। ইঁহার পিতামহের নাম ছিল মুরারি ওঝা—

কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যাঁর কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী ॥

নরসিংহ পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গের অধীশ্বর বেদানুজ নামক রাজার তিনি মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু মুসলমান-বিজয়ের উপদ্রবের সময়ে নরসিংহ ওঝা বাধ্য হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ফুলিয়ায় গিয়া বাস করেন। ফুলিয়া তখন সমৃদ্ধ স্থান।

কৃত্তিবাসের জন্মকাল—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ-মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

রামায়ণে কবির এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া জ্যোতিষিক গণনার দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে তাঁহার জন্ম ১৩২০ শকের ১৬ই মাঘ রবিবার, ইংরেজি ১৩৯৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখ।

দ্বাদশ বৎসর বয়সে কৃত্তিবাসের বিদ্যারম্ভ হয়—

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥
বৃহস্পতিবারে ঊষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার ॥

এবং বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ এক পণ্ডিতের নিকট তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন—

ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যা সমাপন ॥

শিক্ষান্তে গুরুদেবের শুভ-আশীর্ব্বাদ লইয়া ইনি গুরুগৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। কৃত্তিবাসের পাণ্ডিত্যের যশ এই সময়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছেল—

গুরুস্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ-বিশেষে ॥

তদনন্তর কবি কৃত্তিবাস রাজার সভাকবি হইবার প্রত্যাশায় গৌড়েশ্বর সম্ভাষণে যাত্রা করেন। এই গৌড়েশ্বর কে ছিলেন তাহা কৃত্তিবাস বলেন নাই। তবে ইনি বোধ হয় রাজা দনুজমর্দ্দন গণেশ ছিলেন, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। যাহা হউক, রাজ-সন্দর্শনে যাত্রা করিয়া কৃত্তিবাস সে যুগের রীতি অনুযায়ী দ্বারীর হাত দিয়া গৌড়েশ্বরকে পাঁচটি শ্লোক প্রেরণ করিলেন—

দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥

রাজা তাঁহার শ্লোক পাঠ করিয়া প্রীত হইলেন এবং দ্বারীকে দিয়া তাঁহাকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তখন নয় দেউড়ি অতিক্রম করিয়া কৃত্তিবাস সিংহাসনোপবিষ্ট রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আরও সাতটি শ্লোক পাঠ করিলেন। তখন সভায় তাঁহার কবিত্বের সবিশেষ প্রশংসা হইল। রাজা ও রাজসভাসদগণ মালাচন্দনের দ্বারা কবিকে অর্চ্চনা করিলেন। রাজা তাঁহাকে পট্টবস্ত্র পুরস্কার দিলেন।—

খুসী হইয়া মহারাজ দিল পুষ্পমালা ॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ॥

এবং—

সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিত এইরূপে গৌড়েশ্বরের রাজসভায় অশেষরূপ সম্মান ও গৌরব লাভ করিয়া রামায়ণ রচনায় অনুরুদ্ধ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং রামায়ণ রচনায় মনোযোগী হইলেন।

কৃত্তিবাস ভারতের অমর কাব্য রামায়ণ বাঙ্গলায় রচনা করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। তিনি প্রকৃত কবি ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন যে সরস্বতীর আশীর্ব্বাদে তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি উৎসারিত

হইয়াছিল। তবেই তিনি রামায়ণ রচনায় সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন—

সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দ নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী-প্রসাদে শ্লোক মুখ হইতে স্ফুরে॥

কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণখানি গানের আকারে রচনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রামায়ণের অনেক স্থানেই আপনার রচনাকে পাঁচালী গীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

কৃত্তিবাস রচে গীত অমৃত সমান।

এবং

কৃত্তিবাস কবির সঙ্গীত সুধাভাণ্ড।
সমাপ্ত হইল গীত এ অযোধ্যাকাণ্ড॥

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনকালে রামায়ণ সুরসংযোগে গীত হইত। প্রাচীনকালের সে সুর আমরা হারাইলেও এখনও সুর করিয়া রামায়ণ পাঠের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এখনও দেখা যায় পল্লী-অঞ্চলের লোকেরা তাহাদের শত ছিন্ন রামায়ণখানি লইয়া বিশেষ অনুরাগ ও ভক্তির সহিত সুর করিয়াই পাঠ করে।

বঙ্গদেশে কৃত্তিবাস ভিন্ন আরও অনেক কবি বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাব্য বাল্মীকি রামায়ণের অংশবিশেষের অনুবাদ—কাহারও বা সমগ্র রামায়ণ কাহিনীরই অনুবাদ। কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী যুগে অন্যান্য আরও বহু রামায়ণ রচনা হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের এতখানি জনপ্রিয়তার কারণ কি, সে সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন মনোমধ্যে স্বভাবতঃই জাগিয়া উঠে।

বৈষ্ণবীয় কোমলতা কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। বাঙ্গলা দেশ বৈষ্ণবভাবাপন্ন। সুতরাং বৈষ্ণবভাবাপন্ন এই দেশে কৃত্তিবাসী রামায়ণের বৈষ্ণবীয় মৃদুতা ও কারুণ্য বাঙ্গালীর চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছে, কৃত্তিবাসের কাহিনী বাঙ্গালীর চক্ষে অশ্রুর বন্যা বহাইয়া হৃদয়কে ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়াছে। রাক্ষসগণের যুদ্ধক্ষেত্রকেও কবি হরিসঙ্কীর্ত্তন-ভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, রাম কোমলতার প্রতিমূর্ত্তি—বৈষ্ণবীয় মাধুর্য্যে তিনি মণ্ডিত।

সীতাও কোমলতার প্রতিমূর্ত্তি—কোমলা বল্লরীর মত তিনি স্বামীকে আশ্রয় করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। সীতার ব্রীড়াবনতা মূর্ত্তি, রামের করুণ কোমল ভাব—এ সমস্তই কুশলী কবির নিপুণ তুলিকায় রূপায়িত হইয়া উঠার দরুণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ করুণরসপ্রিয় বাঙ্গালীর এত প্রিয় হইয়াছে।

কৃত্তিবাসে পরবর্ত্তীকালে রচিত রামায়ণ হইতে অনেক প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ যে রামায়ণের যে অংশ উৎকৃষ্ট প্রায় সে সকলই ধীরে ধীরে কৃত্তিবাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণখানির মনোজ্ঞতা বর্দ্ধিত করিয়াছে এবং সেই প্রক্ষিপ্ত রচনা-সম্বলিত রামায়ণখানি শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ অন্য সকল রামায়ণ অপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনার কথাটা যখন উঠিল, তখন সে সম্বন্ধে এখানে সামান্য দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। পণ্ডিতপ্রবর ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত আদিকাণ্ডের কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকায় বলিয়াছেন,—"কৃত্তিবাসী খাঁটি রামায়ণে বহুল পরিমাণে আধুনিকতার আবরণ, প্রক্ষিপ্তের উৎপাত, পাঠান্তরের সমাবেশ, অপপাঠের বাহুল্য এবং অঙ্গবৈকল্য ও অবয়ব-হানির সংস্পর্শ ঘটিয়াছে।" কথাটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। অর্থাৎ কৃত্তিবাস বলিয়া যে কবির কণ্ঠে আমরা নিত্য যশোমাল্য পরাইয়া দিয়া আসিতেছি, সমস্ত যশটুকু সেই কবিরই প্রাপ্য অথবা অন্য কোন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যে মিশিয়া থাকিয়া তাঁহার যশটুকু হরণ করিয়া লইতেছেন, তাহা বিবেচনার বিষয়।

কৃত্তিবাসের নামে আজ বাঙ্গলাদেশে যে রামায়ণ পঠিত এবং সমাদৃত হইতেছে, সেই প্রচলিত রামায়ণের বহুলাংশ যে রূপান্তরিত হইয়াছে, এবিষয়ে সন্দেহ জন্মিবার কারণ সম্প্রতি ঘটিয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণের জন্য কৃত্তিবাসের রূপান্তর ঘটিয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ড সম্পাদন করিতে গিয়া এই কয়টি কারণ ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তাহা তিনি সাধারণের গোচরীভূত করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের পর কয়েকজন শক্তিশালী রামায়ণ রচয়িতা বাঙ্গলাদেশে আবির্ভূত হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা বাল্মীকি হইতে দুই

এক কাণ্ড অনুবাদ করেন, কেহ বা কোন কাণ্ডের ঘটনাবিশেষ লইয়া নিজের কল্পনার রঙে রঞ্জিত করিয়া তাহাকেই বিরাট এক কাব্যে পরিণত করিয়াছেন। কোন কোন কবি অবশ্য গোটা বাল্মীকি রামায়ণখানি অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল রামায়ণ বাঙ্গলাদেশে এককালে বেশ প্রচলিত ছিল। কিন্তু কৃত্তিবাসের যশ কেহ ম্লান করিতে পারেন নাই।

পল্লীতে পল্লীতে রামায়ণ গান হইত। গাহিবার সময় গায়েনগণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ গান করিতেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের ভণিতায় তাঁহারা গাহিলেও অন্য রামায়ণ রচয়িতার রসাল অংশসমূহ তাহাতে যোজনা করিয়া আসর জমাইতে চেষ্টা করিতেন। ফলে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই মূল কৃত্তিবাসের রামায়ণের পুঁথিসমূহে মিশ্রণ প্রবেশ করিতে লাগিল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই প্রক্ষেপের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকরণ জোগাইয়াছিলেন পাবনা জেলার অমৃতকুণ্ডা নিবাসী নিত্যানন্দ। ইঁহার উপাধি ছিল অদ্ভুতাচার্য্য। ইঁহার রামায়ণ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ বলিয়া খ্যাত। এই অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ হইতে বহু মনোরম উপাখ্যান কৃত্তিবাসী রামায়ণে আসিয়া ঢুকিয়াছে।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ রামায়ণ মুদ্রিত করিলে পর এই জনপ্রিয় রামায়ণখানি বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে স্থান পাইল এবং অনুরাগের সহিত ইহা পঠিত হইতে লাগিল। এখনও আমরা সেই শ্রীরামপুরী রামায়ণই পাঠ করিয়া আসিতেছি। এখানে সেখানে দুই একটা শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছি মাত্র। মিশনারীগণ যখন রামায়ণ ছাপিয়াছিলেন, তখন বিভিন্ন পুঁথি মিলাইয়া খাঁটি কৃত্তিবাস উদ্ধারের চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে পুঁথি তাঁহারা হাতের কাছে পাইয়াছিলেন, তাহারই ভাষা ও বর্ণনা কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত করিয়া অবিকল তাহাই ছাপিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ সম্পাদিত যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আজ বাঙ্গলা দেশে চলিতেছে, তাহার বহু স্থান অদ্ভুতাচার্য্যের রচনা।

কৃত্তিবাস মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রামায়ণ রচনা করিতে রাজাদেশ পাইয়া বাল্মীকির অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে আদি কবি তাঁহার কাব্যের বিষয়-বিন্যাস যে ভাবে করিয়াছেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিষয়-বিন্যাস অন্যরূপ। অথচ এমন কতকগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণের সুপ্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, যেখানে

দেখা যায় যে, বাল্মীকির বিষয়-বিন্যাস রীতি অনুসৃত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই এই ধারণা হইয়া থাকে যে, প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে অন্যান্য অনেক রামায়ণের প্রভাব রহিয়াছে এবং সেই প্রভাববশতঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণ রূপান্তরিত হইয়াছে।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ, রাম নামে রত্নাকরের পাপক্ষয় অথবা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকি নামকরণ এবং রামায়ণ রচনার আদেশ দান প্রভৃতি বিষয় মূল কৃত্তিবাসে ছিল না বলিয়া অনুমিত হয়। এ সকল প্রক্ষিপ্ত রচনা। রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, রঘুর উপাখ্যান প্রভৃতিও কোন বিশ্বাসযোগ্য পুঁথিতে নাই, বাল্মীকি রামায়ণেও এগুলি নাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণের দস্যু রত্নাকরের কাহিনী অদ্ভুতাচার্য্য হইতে প্রক্ষিপ্ত। বীরবাহু-তরণীসেনের যুদ্ধ, অঙ্গদের রায়বার, শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক চণ্ডীপূজা, এ সকলও প্রক্ষিপ্ত রচনা। কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের অনেকাংশই যে কবিচন্দ্র হইতে প্রক্ষিপ্ত, তাহা নিঃসন্দেহ।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সহিত নির্ভরযোগ্য কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথির তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহাতে বহু অবান্তর বিষয় আসিয়া ঢুকিয়াছে, কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনা বহুলাংশে বাদ পড়িয়াছে। বিষয়-বিন্যাসে আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের এমন একটা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, যাহা কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না।

সুতরাং দেখা গেল যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ গায়কগণের সংযোজনার ফলে, এবং অদ্ভুতাচার্য্য প্রভৃতি উত্তরকালে আবির্ভূত রামায়ণ রচয়িতাদিগের প্রভাবে বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। এই সকল প্রক্ষিপ্ত রচনার সাহায্যেই প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ জনপ্রিয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। আসল কৃত্তিবাস এই সকল প্রক্ষিপ্ত এবং আধুনিক রচনার আবরণে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছেন। মূল কৃত্তিবাসের পুঁথি আলোচনা করিয়া আসল কৃত্তিবাসকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখিবার একটা উদ্যম সুরু হইয়াছে। ইহাতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহু মনোজ্ঞ অংশ কৃত্তিবাসের রচনা নহে বলিয়া আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে সত্য। কিন্তু তাহাতে কৃত্তিবাসের কবিযশ কিছুমাত্র কমিবে না। আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণখানির উদ্ধারের ঐতিহাসিক মূল্য

অনেকখানি। ইহা কৃত্তিবাসের কবিপ্রতিভার সত্য স্বরূপটি উপলব্ধিতে সহায়তা করিবে।

কৃত্তিবাসের পরে যে সকল কবি রামায়ণ রচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর নাম প্রথমেই করিতে হয়। চন্দ্রাবতীর নিজের জীবন ছিল অত্যন্ত করুণ ও বিষাদময়। সেই জন্য তাঁহার রামায়ণেও এক মর্ম্মভেদী করুণ বিলাপের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সুর মর্ম্মস্পর্শী। এই রামায়ণখানি অসম্পূর্ণ এবং উহা গানের সমষ্টি। এই রামায়ণে জৈন রামায়ণের প্রভাব আছে এবং ইহার অন্তর্গত কৈকেয়ীর কন্যা কুকুয়ার চরিত্রটি আর্ষ রামায়ণ বহির্ভূত। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে রচিত হইয়াছিল। চন্দ্রাবতীর রামায়ণের ভাষা গতিশীল, সতেজ ও কবিত্বময়।

অতঃপর কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নাম করিতে হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম শঙ্কর—কবিচন্দ্র তাঁহার উপাধি। কবিচন্দ্রের রামায়ণ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং ইহা অনুমিত হইয়া থাকে যে এই রামায়ণের অনেক অংশ কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে অঙ্গদের রায়বার, বীরবাহু এবং তরণীসেনের যুদ্ধ ইত্যাদি কবিচন্দ্রের রচনা বলিয়া মনে হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডটির অধিকাংশই কবিচন্দ্র হইতে প্রক্ষিপ্ত। কবিচন্দ্রের রামায়ণ সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণার ঝিনারদি গ্রাম নিবাসী ষষ্ঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস রামায়ণ রচনা করেন। উভয় কবির রচনার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ষষ্ঠীবরের রচনা সংক্ষিপ্ত ও পরিপক, কিন্তু গঙ্গাদাসের রচনায় ভাবের ও কল্পনার ঐশ্বর্য্য অধিক। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত আর একখানি রামায়ণের নাম পাওয়া যাইতেছে। উহা দ্বিজ মধুকণ্ঠের রামায়ণ।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতেও রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভবানীশঙ্কর বন্দ্যোর 'লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়', জগৎরাম ও রামপ্রসাদ বন্দ্যোর রামায়ণ, দ্বিজ সীতাসুতের রামায়ণ, গঙ্গারাম দত্তের রামায়ণ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জগৎরাম লঙ্কাকাণ্ড ভিন্ন রামায়ণের অন্যান্য সকল অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। তৎপুত্র রামপ্রসাদ বন্দ্য বিস্তৃত লঙ্কাকাণ্ড রচনা করিয়া পিতার অসমাপ্ত রামায়ণখানি সম্পূর্ণ করেন (১৬৯২ শকাব্দ বা ১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দ)।

এতদ্ভিন্ন কয়েকজন কবি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ অথবা রামায়ণের কাহিনী-বিশেষ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন কৃষ্ণদাস, কৈলাস বসু, শিবচন্দ্র সেন প্রভৃতি। ফকির রাম কবিভূষণ নামে অনৈক কবি 'অঙ্গদের রায়বার' রচনা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ, রঘুনন্দন গোস্বামীর (উনবিংশ শতক) রামরসায়ণ এবং রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামায়ণও উল্লেখযোগ্য।

রামমোহন তাঁহার রামায়ণ রচনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"কৃপা করি আদেশ করিলা হনুমান।
রামায়ণ রচি কর জীবের কল্যাণ॥"

তদনুসারে—

"রচিলাম তাঁর আজ্ঞা ধরিয়া মস্তকে।
সাঙ্গ হইল সপ্তদশ শতষষ্টি শকে॥"

অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই রামায়ণখানি সমাপ্ত হয়। এই রামায়ণ সম্বন্ধে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, ইহা—"কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় প্রাঞ্জল না হইলেও মধ্যে মধ্যে এরূপ অংশ আছে, যাহা আদি কবির প্রতিভার কণিকাপাতে স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে মণ্ডিত হইয়াছে।" রামমোহন তাঁহার রামায়ণে হাস্যরস উদ্রেকে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। যেমন—লঙ্কা দাহনের পর বন্দী হনুমান বিবাহের আশায় আশান্বিত হইয়া কহিতেছেন—

রাবণের কন্যা মোর গলে দিবে মালা।
রাবণ শ্বশুর মোর ইন্দ্রজিৎ শালা॥

ইত্যতে—

চারিদিকে হাসয়ে যতেক নিশাচর।
কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ বা পাথর॥
হনুমান কন বিবাহের কাজ নাই।
এমন মারণ খায় কাহার জামাই॥

ইহা প্রাচীন যুগের হাস্যরসের দৃষ্টান্ত। আধুনিক যুগোপযোগী হাস্যরসের মত ইহা মার্জ্জিত নহে—এ ধরণের হাস্যরস অত্যন্ত স্থূল হইলেও সেকালের কাব্যের একঘেয়ে সুরের মধ্যে উহা বৈচিত্র্য সম্পাদন করিত, সন্দেহ নাই।

রঘুনন্দন গোস্বামীর রামরসায়ন বাল্মীকি রামায়ণ অনুসরণে রচিত হইলেও উহাতে হিন্দী তুলসীদাসের রামায়ণের প্রভাব আছে, কোন কোন অংশ তুলসীদাসের রামায়ণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। রামরসায়ন বৈষ্ণব প্রভাবান্বিত, ইহার অনেক অংশ ভাগবতের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সংস্কৃত শব্দের আধিক্য রামরসায়ণের কোন কোন অংশকে শ্রুতিকটু করিয়াছে। কবি যেন বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ইহাতে করুণরসের অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন। সীতাবর্জ্জন, লক্ষ্মণবর্জ্জন, সীতার পাতালপ্রবেশ রামরসায়নে স্থান পায় নাই।

কৃত্তিবাস ভিন্ন বহু কবি রামায়ণ-কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কৃত্তিবাসের যশ কোন কবি ঢাকিয়া ফেলিতে পারেন নাই। কারণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভিন্ন অন্য কোন রামায়ণে রামায়ণকাহিনী আদ্যন্ত একটা অবাধ গতিতে, শ্রুতিসুখকর ছন্দে প্রবাহিত হইয়া যায় নাই। কৃত্তিবাসের কল্পনা ও কবিত্বস্রোতের গতি অবাধ। অন্যান্য সকল রামায়ণে বহু স্থলেই কল্পনা ও কবিত্বস্রোত ব্যাহত হইয়াছে। কৃত্তিবাসে অনুবাদের মধ্যেও সরসতা আছে, অন্যান্য রামায়ণের সর্ব্বত্র অনুবাদের মধ্যেও যে স্ফূর্ত্তি ও গতির সঞ্চার করিতে পারা যায়, তাহার পরিচয় নাই। সুতরাং একটা সুসমঞ্জস সৃষ্টি হিসাবে দেখিতে গেলে কৃত্তিবাসী রামায়ণের শ্রেষ্ঠত্বই অবিসংবাদিত।

মহাভারত কাব্য ও কাশীরাম দাস

মহাভারত বাঙ্গলায় কেবল কাব্যগ্রন্থরূপে সমাদৃত নহে। ইহা ধর্ম্মগ্রন্থের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া বঙ্গবাসী কর্ত্তৃক ধর্ম্মগ্রন্থরূপেও ভক্তি সহকারে পঠিত হইতেছে। বঙ্গবাসীগণ একরূপ বাল্যেই তাঁহাদের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মহাভারতের 'অমৃত সমান কাহিনী'র সহিত পরিচিত হইয়া থাকেন এবং এই গ্রন্থখানি হইতে কত আদর্শ, কত পুণ্যকথা, কত ত্যাগ, কত স্নেহ-ভালবাসার কাহিনী শুনেন। উহা বাঙ্গালীর নৈতিক চরিত্র গঠন করিয়াছে, বঙ্গবাসীর মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিবার প্রেরণা জোগাইয়াছে।

মহাভারত কাব্যের কাহিনী কেবল সংস্কৃতে আবদ্ধ থাকিলে পাণ্ডবদিগের অপূর্ব্ব সৌভ্রাত্র, যুধিষ্ঠিরের অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠা, অর্জ্জুন প্রভৃতির বীরত্বকাহিনী, গান্ধারী ও কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য প্রভৃতি বঙ্গবাসীর জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়া বঙ্গবাসীকে মহৎ আদর্শে দীক্ষিত করিতে পারিত না। বাঙ্গালী মহাভারত-কারগণ বিশেষতঃ কাশীরাম দাস বাঙ্গালীর এই অসামান্য উপকার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া, কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া গিয়াছেন। সে কৃতজ্ঞতা কেবল মধুসূদনের নহে। উঁহার ভিতর দিয়া বাঙ্গালী জনসাধারণের অন্তরের কৃতজ্ঞতাই ভাষা পাইয়াছে।

রামায়ণের কবি যেমন একজন নহেন, বহু কবি যেমন আদি-কবি বাল্মীকির রামায়ণ-কথা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন, তেমনি বহু কবি ব্যাসদেবের মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। অনেক কবি বাঙ্গলায় সমগ্র মহাভারত, অথবা উহার কোন কোন পর্ব্ব বা উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

যে কবি সর্ব্বপ্রথম মহাভারতের অনুবাদ বাঙ্গলায় করেন তাঁহার নাম— সঞ্জয়। কবির রচিত মহাভারতের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা তাহার সমর্থন করিতেছে—

"অতি অন্ধকার যে মহাভারত সাগর।
পাঞ্চালী সঞ্জয় তাক করিল উদ্ধার॥

সঞ্জয়ের রচনা-রীতি সরল এবং সংক্ষিপ্ত। তাঁহার ভাষা সাবলীল, তবে তাঁহার কবিত্ব অসাধারণ নহে। কিন্তু তাঁহার বলিবার ভঙ্গীটি সহজ, সতেজ ও অত্যন্ত স্পষ্ট। এইজন্য মূল মহাভারতের যে দৃপ্ত বর্ণনাভঙ্গী, তাহা সঞ্জয়ের মহাভারতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। গ্রাম্য সরল সৌন্দর্য্যে সঞ্জয়ের মহাভারত অত্যন্ত উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। এই মহাভারতে বীরত্বের কাহিনীসমূহে মূলের উদ্দীপনা ও বীররস অক্ষুণ্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। অলঙ্কার-বাহুল্যে অথবা মার্জ্জিত ভাষার মণ্ডনে সঞ্জয়ের রচনা চমক জাগাইবে না, কিন্তু বীর করুণ প্রভৃতি রস উৎসারিত করিতে গিয়া স্বকীয় নিপুণতার পরিচয় সঞ্জয় দিয়াছেন।

অতঃপর মহাভারতের অনুবাদক কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের নাম করিতে হয়। এই কাব্যখানি বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা হুসেন

শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়। মহাভারতখানি আনুমানিক ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। হুসেন শাহের সেনাপতি লস্কর পরাগল খাঁ তাঁহার প্রভুর ন্যায়ই বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। ইঁহারই আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার "ভারত পাঁচালী" অর্থাৎ মহাভারত কাব্য রচনা করেন। তাঁহার মহাভারত কাব্যের নাম—পাণ্ডববিজয় বা বিজয়পাণ্ডব কথা। কেহ কেহ মনে করেন এইখানিই সর্ব্বপ্রাচীন মহাভারত কাব্য—সঞ্জয়ের কাব্য নহে। কিন্তু সঞ্জয়কে মহাভারতের প্রাচীনতম অনুবাদক মনে করিবার কারণ, তাঁহার মহাভারতের ভাব ও ভাষার বিকাশ কবীন্দ্র পরমেশ্বরে ঘটিয়াছে। সঞ্জয়ে যাহা অস্পষ্ট, কবীন্দ্রে তাহা সুব্যক্ত।

লস্কর পরাগল খাঁ মহাভারত কাহিনীর প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার সভায় প্রতিদিনই মহাভারত কাহিনী পঠিত হইত। কবি তাঁহার মহাভারতে হুসেন শাহের প্রশংসা করিয়াছেন, লস্কর পরাগল খাঁর মহাভারত-কাব্য-প্রীতির কথা বলিয়াছেন।—

নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥
* * *
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
* * *
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥

এই মহাভারতখানি স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত রচিত। বর্ণনাগুণে কবীন্দ্রের মহাভারত উৎকৃষ্ট। কবি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। স্থানে স্থানে মূলের আক্ষরিক অনুবাদ কবীন্দ্রের মহাভারতে পাওয়া যায়।

পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ছুটি খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা হন। তিনিও তাঁহার পিতার মত বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের কাহিনীটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। সুতরাং ইনিও শ্রীকর নন্দী নামক কবির দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের একটি বিস্তৃততর অনুবাদ করান। উহা তাঁহার সভায় নিত্য পঠিত হইত। ছুটি খাঁ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের সেনাপতি ছিলেন। নসরৎ শাহের রাজত্বকাল ১৫১৮-১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং শ্রীকর

নন্দীর মহাভারত ঐ কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে। শ্রীকর নন্দীর রচনার অন্যতম গুণ কল্পনাবিলাস ও ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন। মধ্যে মধ্যেই তাঁহার বর্ণনা ব্যঙ্গের প্রতি ধাবিত হইয়াছে। কবি তাঁহার রচনার মধ্যে নসরত শাহের প্রশংসা করিয়াছেন, হুসেন শাহের প্রশংসাও তাঁহার কাব্যে আছে।—

নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী।

কবি তাঁহার রচনার ভূমিকাস্বরূপ বলিয়াছেন।—

অশ্বমেধ কথা শুনি' প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার॥
তাহান আদেশ-মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া॥

কবি যে ছুটি খানের আদেশে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ আরম্ভ করেন এখানে একথা আছে।

সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী—ইঁহারা সকলেই তাঁহাদের রচনার ভূমিকায় একটি স্বীকৃতি করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন যে, জৈমিনি সংহিতা দৃষ্টে তাঁহাদের অনুবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে। ব্যাসের সহিত ইঁহাদের সম্পর্ক অল্প। কারণ ব্যাসদেবের মহাভারত বিশাল। উহার অনুবাদ আয়াসসাধ্য। জৈমিনি মহাভারত-গ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত করেন এবং এক সময়ে এই জৈমিনি ভারত দেশময় প্রচলিত ছিল। সেই সংক্ষিপ্ত মহাভারত এই সকল কবির রচনার উপকরণ জোগাইয়াছিল।

এখানে আর একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেহ কেহ মনে করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী একই কবি। এই অনুমান উপেক্ষা করিবার নহে। কবির নাম শ্রীকর নন্দী ছিল—তাঁহার উপাধি কবীন্দ্র পরমেশ্বর—এ অনুমান অনেকে করিয়া থাকেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর লস্কর পরাগল খাঁর এবং তৎপুত্র ছুটি খানের—উভয়ের প্রশংসা করিতেছেন। তিনি পরাগল খাঁ এবং তৎপুত্র ছুটি

খাঁ—উভয়ের আদেশে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন একথাও স্পষ্ট বলিয়াছেন—

তনয় যে ছুটি খান পরম উজ্জ্বল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল॥

সুতরাং মনে হয় যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর লস্কর পরাগল খানের এবং ছুটি খানের উভয়ের সভায় বিদ্যমান ছিলেন, উভয়ের অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারতের অনুবাদে রত হন। পরাগল খাঁর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া খুব সম্ভবতঃ তিনি স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত রচনা করেন এবং ছুটি খানের অনুরোধে শুধুমাত্র অশ্বমেধ পর্ব্বের বিস্তৃততর অনুবাদ করেন।

সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে কাশীরামদাসের মহাভারত অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং অন্যান্য সকল মহাভারত অপেক্ষা এই মহাভারতখানি আজিও বঙ্গবাসীমাত্রের নিকটেই অত্যন্ত প্রিয়। বাঙ্গালী চরিত্রের ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং ভক্তিরসের অনাবিল প্রবাহ কাশীরামের মহাভারতখানিকে এত হৃদয়গ্রাহী ও জনপ্রিয় করিয়াছে। শ্রীরামপুর মিশন কর্ত্তৃক কাশীদাসী মহাভারতের মুদ্রণ, প্রকাশ ও প্রচারও কাশীরামের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

কাশীরামদাসের আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতকের শেষভাগ বা সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগ। তিনি তাঁহার বিরাট-পর্ব্বের একস্থানে ইঙ্গিতে ঐ পর্ব্ব সমাধা হওয়ার সন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহা হইতে অনুমিত হয় যে, ১৫২৬ শক বা ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিরাটপর্ব্ব রচনা শেষ হয়।

কাশীরাম দাস তাঁহার মহাভারত রচনাকালে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের অনূদিত মহাভারত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারতোক্ত উপাখ্যান ও পর্ব্ব-বিশেষের অনুবাদ হইতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করেন। তথাপি কাশীরামের মৌলিকতা যথেষ্ট। তাঁহার কাব্যের ছন্দ, শব্দবিন্যাস এবং অলঙ্কার প্রয়োগ প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ যেমন বাল্মীকির হুবহু অনুবাদ নহে, কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদও তেমনি ঠিক সংস্কৃতের অনুযায়ী নহে। সে যুগের অনুবাদ অর্থে কেবল শব্দার্থগুলি সাজাইয়া বসানো বুঝাইত না। অনুবাদ করিতে গিয়াও কবির স্বাধীন কল্পনা প্রকাশ পাইত। সে যুগের অনুবাদ অর্থে অনেক স্থলে নূতন সৃষ্টিও বটে। তাই কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদ

করিতে গিয়া কিছু সংস্কৃত হইতে লইয়াছেন, কিছু পুরাণান্তর্গত কাহিনী হইতে লইয়াছেন, কিছু বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কবিগণের মহাভারত হইতে লইয়াছেন। আর বাকী অংশটা তিনি তাঁহার মৌলিক কবিপ্রতিভা ও কবিকল্পনার দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন—সেখানে তিনি শব্দযোজনার মাধুর্য্য দিয়াছেন, সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার ও উপমা প্রয়োগে নিপুণতা দেখাইয়াছেন। এইরূপে তিনি পাঁচ ফুলে সাজি সাজাইয়া মহাভারতের কাহিনীটিকে সরসসুন্দর করিয়া বাঙ্গালীর নিকট পরিবেশণ করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার কাব্যের অনুবাদের মাধুর্য্য বাঙ্গালীকে এত মুগ্ধ করিয়াছে।

কাশীরামের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন কবির রচিত মহাভারতের স্থানবিশেষ কাশীরাম দাসের মহাভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে কাশীরাম দাসের মহাভারতখানিই বঙ্গসাহিত্যে অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের কাব্যে খণ্ড-সৌন্দর্য্য ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত থাকিতে পারে। কিন্তু কাশীরাম দাসের মহাভারতে আদ্যোপান্ত সৌন্দর্য্যস্রোত প্রবাহিত হইয়া কাব্য-খানির মাধুর্য্য অব্যাহত রাখিয়াছে, ইহাকে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অনবদ্য সৃষ্টিতে পরিণত করিয়াছে।

কাশীদাসের জীবনী সম্বন্ধে যৎসামান্যই জানা গিয়াছে। প্রাচীন যুগের কবিগণ তাঁহাদের জীবনী ঢাক পিটাইয়া লোকসমাজে প্রচার করাটা তেমন একটা প্রয়োজনীয় কিছু বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহারা কাব্য রচনা করিয়াছেন, আর সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা তাঁহাদের কাব্য পাঠই করিয়াছে। কাব্যপাঠ করিয়া কবিদিগের কণ্ঠে পাঠকবৃন্দ যশোমাল্য পরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু একদিনের জন্যও কবিদিগের জীবনী সম্বন্ধে কৌতূহলী হয় নাই, বা তাঁহাদের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে নাই। কবি কাশীরাম দাস তাঁহার মহাভারতে আত্মপরিচয় প্রদানের ছলে শুধু এইটুকু বলিয়াছেন—

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপরস্থিতি।
দ্বাদশতীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস-পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত, কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥

পাঁচালী প্রকাশি' কহে কাশীরামদাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, বর্দ্ধমান জেলার উত্তরদিকে ইন্দ্রাণী নামে এক পরগণা আছে; কাটোয়া নগর ঐ পরগণার অন্তর্গত। ঐ পরগণার মধ্যে ব্রহ্মাণী নদীর তীরসন্নিহিত সিঙ্গি নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে কাশীরাম দাসের নিবাস ছিল। তাঁহার প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর, পিতার নাম কমলাকান্ত। কমলাকান্তের তিন পুত্র ছিল—অর্থাৎ কাশীরাম দাসেরা তিন ভাই ছিলেন। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস, মধ্যম কাশীরাম, কনিষ্ঠ গদাধর। তাঁহারা তিন ভ্রাতাই কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। কাশীরাম কায়স্থ ছিলেন। তিনি নিজের নামের উপাধি দাস ব্যবহার করিতে বেশী ভালবাসিতেন। মধ্যে মধ্যে কাশীরাম দেব—এই ভণিতাও তাঁহার মহাভারতে পাওয়া যায়। কাব্যানুরাগ কাশীরাম দাসের ভ্রাতাদের তিনজনেরই ছিল। তিনজনেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামে একখানি ভাগবতের অনুবাদ করেন। কনিষ্ঠ গদাধর দাস 'জগন্নাথ মঙ্গল' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। আর কাশীরাম দাস—মহাভারত, স্বপ্নপর্ব্ব, জলপর্ব্ব ও নলোপাখ্যান এই কয়খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কাশীরাম দাসের শেষোক্ত গ্রন্থ তিনখানি হয়ত তাঁহার অপরিণত বয়সের রচনা। কারণ উহাতে তাঁহার কাঁচা হাতের ছাপ বর্ত্তমান।

কথিত আছে যে, কাশীরামদাস মেদিনীপুরের আওসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া শিক্ষকতা করিতেন। এই রাজবাড়ীতে সমাগত পুরাণপাঠকারী পণ্ডিত ও কথকদিগের মুখে পুরাণ ও মহাভারত-প্রসঙ্গ শুনিয়া কাশীরাম দাস মহাভারতের অনুবাদে ইচ্ছুক হন। উহার ফলেই মহাভারতের অনুবাদ।

কাশীরাম দাসের মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব্ব। আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, সৌপ্তিক, ঐষিক, নারী, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমিক, মুষল এবং স্বর্গারোহণ। কিন্তু একটি প্রবাদ আছে—

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি' কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥

অর্থ, কবি বিরাট পর্ব্ব পর্য্যন্ত মাত্র রচনা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু এই প্রবাদ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কবি খুব সম্ভবতঃ মহাভারতের আদ্যোপান্তই রচনা করিয়াছিলেন।

কাশীরাম দাস সংস্কৃত খুব ভাল রকমই জানিতেন। ইহার প্রমাণ আমরা তাঁহার মহাভারত হইতে পাইয়াছি। তাঁহার মহাভারতের কোন কোন স্থান মূল সংস্কৃত মহাভারতের প্রাঞ্জল অনুবাদ। কাশীরামদাস কবিকঙ্কণের পরবর্ত্তী যুগের কবি। অথচ তাঁহার কবিত্ব কবিকঙ্কণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া কাশীরামের কবিত্ব কম ছিল, এমন কথা বলা যায় না। কাশী-দাসী মহাভারতে আদি, করুণ, রৌদ্র, বীর ও শান্ত এই সকল রসের ভূরি ভূরি প্রয়োগ আছে। কবি তাঁহার মহাভারতের সকল স্থানেই বিলক্ষণ কবিত্ব ও কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের ভাষা যে মুকুন্দরামের ভাষা অপেক্ষা অনেক বেশী মার্জ্জিত, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

কাশীরামদাসের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গলা কাব্যে বেশ একটা স্বাভাবিকত্ব ছিল। তখন কবিদের প্রাণের কথা অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ পাইত। কিন্তু কাশীরামদাসের পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গলা কবিতার সেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। তখন অলঙ্কারের বাহুল্যে, শব্দাড়ম্বরে ও উপমা প্রয়োগের আতিশয্যে বাঙ্গলা কবিতার স্বভাবরূপ ঢাকা পড়িয়াছিল। কাশীরাম এই দুই যুগের মধ্যবর্ত্তী কবি। তাই তাঁহার কাব্যে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের স্বাভাবিকতা আছে। আবার, পরবর্ত্তী যুগের মার্জ্জিত ভাষা, সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার ও উপমার প্রয়োগও আছে। সুতরাং স্বাভাবিকতা ও অলঙ্কার, উপমা, শব্দাড়ম্বর প্রভৃতির সম্মিলনে কাশীরামদাসের মহাভারতখানি একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার মহাভারতখানির মধ্যে ভারতচন্দ্রীয় যুগের রচনারীতির প্রথম উন্মেষ দেখা যায়। কবি তাঁহার মহাভারতের মধ্যে চমৎকার চমৎকার উপমা-বিন্যাস করিয়াছেন—

মুখ তুলি বৃকোদর যেই ভিতে যায়।
পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায়॥
সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে।
দানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে॥
দণ্ড হাতে যম যেন বজ্র হাতে ইন্দ্র।
খেদাড়িয়া লৈয়া যায় সব নৃপবৃন্দ॥
যেই দিকে বৃকোদর সৈন্য যায় খেদি।
দুই দিকে তট যেন মধ্যে বহে নদী॥

লক্ষ্যভেদোদ্যত অর্জ্জুনের বর্ণনা দিতে গিয়া কবির উপমা প্রয়োগ এবং উহার অনুপ্রাসসাধন চমৎকার হইয়াছে।—

দেখ দ্বিজ মনসিজ, জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র, পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম, নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি, করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব, অধর রাতুল।
খগরাজ, পায় লাজ, নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু, ললাট প্রসর।
গজস্কন্ধ, গতিমন্দ মত্ত করিকর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে, আজানুলম্বিত।
করিকর যুগ্মবর, জানু সুবলিত॥
মুকপাটা, দন্তছটা, জিনিয়া দামিনী।
দেখি ইহা, ধৈর্য্য-হিয়া, নহেক কামিনী॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য, ঢাকিয়াছে মেঘে।
অগ্নি অংশু, যেন পাংশু, আচ্ছাদিত লাগে॥

এইরূপ অনুপ্রাস-প্রধান রচনা কাশীরামদাসের মহাভারতের বহু স্থানে মণিমুক্তার মত ছড়াইয়া আছে। এ সকলই ভারতচন্দ্রীয় যুগের অনুপ্রাসের পূর্ব্বাভাষ।

স্বাভাবিকভাবে রূপ-বর্ণনা ও ঘটনা-বর্ণনা করিতেও কাশীরাম দাস দক্ষ ছিলেন।

কাশীরাম দাস তাঁহার মহাভারত সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

এই উক্তির মধ্যে এতটুকু অতিশয়োক্তি নাই। সত্যই মহাভারত হইতে পীযূষধারা বর্ষিত হইয়া মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। যে মহাভারতের অমৃতময়ী বাণী ও বীরত্বের কাহিনী শ্রবণ করিয়া দাক্ষিণাত্যের দেশহিতৈষী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শিবাজীর বীরচরিত্র গঠিত হইয়াছিল, সেই মহাভারতের কাহিনী কাশীরাম দাস বাঙ্গলাদেশে পরিবেশণ করিয়া গিয়াছেন। ফলে কত কবি যে এই কাব্যগ্রন্থ হইতে তাঁহাদের কল্পনার খোরাক পাইয়াছেন,

তাহার সংখ্যা নাই। মাইকেল মধুসূদনের কবিত্ব উন্মেষে কাশীরাম দাসের মহাভারত বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার কাব্যের চরিত্রচিত্রণেও কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে তিনি আদর্শ ও উপকরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনাকালে মধুসূদন কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের কাব্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি প্রমীলা চরিত্র। প্রমীলার বীরাঙ্গনার মত তেজ ও গৃহস্থ-বধূর মত কোমলতা, এ দুইয়েরই আদর্শ মধুসূদন কাশীরাম দাস হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমন কি 'প্রমীলা' এই নামটি পর্য্যন্ত তিনি কাশীরামের মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই মহাভারত হইতেই নবীনচন্দ্র তাঁহার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নামক কাব্য রচনার অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্র সৃষ্টির মাল-মসলা পাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য হইতে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জ্জুন চরিত্রের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারীর এবং কুন্তীপুত্র কর্ণের চরিত্র-মাহাত্ম্য প্রভৃতি উপলব্ধি করিয়া অপূর্ব্ব কাব্য ও কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং মহাভারতখানিকে মহাসমুদ্র অথবা গিরিরাজ হিমালয়ের সহিত তুলনা করিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাসমুদ্র যেমন রত্নাকর, মহাভারতও তেমনি রত্নাকর। মহাসমুদ্র হইতে ডুবুরি মণি-মুক্তা আহরণ করিয়া আনে। মহাভারত হইতেও কত কবি যে কত রত্ন আহরণ করিয়া তাঁহাদের কাব্য ও কবিতার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হিমালয় হইতে শত শত ঝরণা বাহির হইয়াছে। উহারাই আবার নদ-নদীরূপে সমতল ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কত শত অনুর্ব্বর দেশকে উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা করিয়াছে। তেমনিভাবেই মহাভারত হইতে কল্পনাস্রোত অবিরলধারে উৎসারিত হইয়া শত শত কবির কল্পনা-ক্ষেত্রকে উর্ব্বর শস্যশ্যামলা করিয়াছে। ভাবীকালে আরও কত কবি ও বীর এই মহাভারত হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া যশস্বী হইবেন, তাহা কে বলিতে পারে?

কাশীরাম দাসের পরে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকেও কয়েকখানি সম্পূর্ণ মহাভারত কাব্য রচিত হয়। তন্মধ্যে রামায়ণ রচয়িতা কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভাগবতের অনুবাদ ও মালাধর বসু

বঙ্গসাহিত্যে রামায়ণ মহাভারতের মত ভাগবতের অনুবাদও হইয়াছিল। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মালাধর বসু রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ই ভাগবতের প্রথম অনুবাদ।

মালাধর বসু বর্দ্ধমান জেলার কুলীন গ্রামস্থ বিখ্যাত বসু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম দশরথ বসু, মাতার নাম ইন্দ্রমতী। মালাধর বসু তাঁহার কবিপ্রতিভার পুরস্কারস্বরূপ গৌড়েশ্বর ইউসুফ শাহের নিকট হইতে 'গুণরাজ খান' এই উপাধি প্রাপ্ত হন। সেকালে মুসলমান শাসকগণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহারা প্রতিভার উৎসাহদাতা ছিলেন। ইউসুফ শাহও গুণপণা বুঝিতেন, কবির কবিত্বের সমাদর করিতেন। সেইজন্য 'গুণরাজ খান' এই উপাধিতে ভূষিত করিয়া তিনি কবির পুরস্কার দান করিয়াছিলেন।

গৌড়েশ্বর ইউসুফ শাহের রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় ১৪৭৪-১৪৮১ অবধি। সুতরাং মালাধর বসুর আবির্ভাবকালও পঞ্চদশ শতাব্দী।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের অন্যতম বিশেষত্ব ইহা সনতারিখযুক্ত প্রথম বাঙ্গলা কাব্য। বঙ্গের কবিগণ সাধারণতঃ তাঁহাদের কাব্য রচনার কাল জ্ঞাপন করা বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন। সুতরাং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অধিকাংশ কাব্যের রচনাকাল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নির্ণয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু মালাধর বসু তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনার কাল অতিশয় স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

> তেরশ পাঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
> চতুর্দ্দশ দুই শকে গ্রন্থ সমাপন॥

এই উক্তি হইতে আমরা জানিয়াছি যে, ১৩৯৫ শকে বা ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কবি তাঁহার কাব্য রচনা আরম্ভ করেন এবং ১৪০২ শকে বা ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্যে কবির ভক্তিপ্রবণতা উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভক্তিরসের অনাবিল প্রবাহ গ্রন্থখানিকে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট অতিশয় প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। চৈতন্যদেব যে সকল কাব্য হইতে রসাস্বাদন করিতেন, তাহাদের মধ্যে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে ভগবানকে

কান্তাভাবে ভজনা করা হইয়াছে—ইহাই চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মের মূলকথা।

কবি সংস্কৃতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণবিজয় সংস্কৃত ভাগবত গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ নহে। মূলকে মোটামুটিভাবে অনুসরণ করিয়া এই কাব্যে মৌলিক কল্পনা ও কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এই কাব্যে রাধাচিত্র ভাগবত বহির্ভূত। যে রাধাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলার গীতিকাব্যের নির্ঝর অশ্রান্ত গতিতে গলিয়া বাহির হইয়াছিল, সেই রাধাভাবের কল্পনার প্রথম উন্মেষ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে।

ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যভাব অধিক। তিনি দেবশক্তিতে শক্তিমান। তাই ভাগবতের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কেবল দেবতা ভাবিয়া পূজা করিয়াছেন, দূর হইতে পূজার অর্ঘ্য তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতের গোপী-গণের বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমই উৎপাদন করিয়াছেন—তিনি তাঁহাদের অন্তরঙ্গ, আত্মার আত্মীয় তিনি নহেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে রহিয়াছে মধুর বা কান্তা ভাব। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম দান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন, আবার প্রেম লাভ করিয়াও নিজেকে অনুগৃহীত বোধ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতায় প্রেমকে, রাধা-কৃষ্ণলীলাকে যেভাবে কল্পনা করা হইয়াছে তাহারই উন্মেষ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে। সেই হিসাবে কাব্যখানি বঙ্গ সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় অনুবাদ কাব্য হইলেও রাধাকৃষ্ণ-লীলার উল্লিখিতরূপ কল্পনাভঙ্গীর দরুণ কাব্যখানির মধ্যে মৌলিক রসধারাই উৎসারিত হইয়াছে। অনুবাদের কৃত্রিমতা ইহাতে নাই।

চরিত-সাহিত্য

চৈতন্য-জীবনী

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাবে বাঙ্গলা পদাবলী-সাহিত্য পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়াছিল। চৈতন্যজীবনের আলোক পড়িয়া পদাবলী-সাহিত্য এক নব আধ্যাত্মিক রসে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের ধারা যেন বাঁধা পথ ধরিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে বৈচিত্র্য ছিল না। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদ কাব্যরচনার মধ্য দিয়া, মঙ্গলকাব্য রচনার মধ্য দিয়া এবং বৈষ্ণব কবিতার মধ্য দিয়া প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবিগণের প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। মঙ্গলকাব্যসমূহে দেবদেবীর মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইতেছিল। মঙ্গলকাব্যে মানুষের চরিত্র দেবদেবীর ইচ্ছাধীন হইয়া পরিচালিত হওয়ায় সেখানে দেবতার মহিমাই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, মানুষী মহিমা খর্ব্ব হইয়াছে, ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের পদাবলীতে পরচৈতন্যযুগের পদাবলীর স্ফূর্ত্তি নাই। রাধাভাবে ভাবিত কৃষ্ণপ্রেমের প্রতিমূর্ত্তি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবনলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া পরচৈতন্যযুগের পদকর্ত্তাগণ রাধার প্রেমের আকুতি, রাধার আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছিলেন বলিয়া সে চিত্র অত স্পষ্ট, উজ্জ্বল এবং আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত হইয়াছে। শুধু পদাবলী-সাহিত্য চৈতন্যের জীবনলীলার প্রভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া নূতন ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে নাই। মহাপ্রভুর জীবনের অলৌকিক মহিমা বঙ্গের কবিদিগকে কাব্যরচনার নূতন উপকরণ জোগাইয়াছিল। তাঁহার জীবনী অবলম্বন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যে জীবনচরিত সাহিত্য সৃষ্ট হইল। চৈতন্যদেবের জীবনচরিত রচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি এবং প্রকৃতি যেন বদলাইয়া গেল। বিষয়-বৈচিত্র্যে বাঙ্গলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

চৈতন্য-জীবনচরিতের প্রথম গ্রন্থ মুরারি গুপ্তের 'চৈতন্য-চরিত'। এই গ্রন্থখানি ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর বাল্যসহচর ও

প্রিয় বন্ধু ছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের স্বাভাবিক চিত্র ফুটিয়া উঠে নাই। মুরারি গুপ্ত এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করিয়া দেখিয়াছেন এবং কল্পনা ও সত্যের সংমিশ্রণে এই চরিতকথা রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সুললিত সংস্কৃতে লেখা এবং বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

অতঃপর আমরা স্বরূপ দামোদরের কড়চার নাম উল্লেখ করিতে পারি। ইনিও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্শ্বচর ছিলেন এবং সুললিত সংস্কৃতে চৈতন্য-চরিত রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই চরিতকথাখানি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। বৈষ্ণব ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে স্বরূপ দামোদরের কড়চার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।

সংস্কৃতে রচিত আরও দুইখানি চৈতন্যচরিত চৈতন্য-জীবনী জানিবার এবং বাঙ্গলায় চৈতন্য-জীবনী রচনায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। আমরা কবি কর্ণপুর রচিত 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক' ও 'চৈতন্য চরিতামৃতের' কথা বলিতেছি। গ্রন্থ দুইখানি ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এই চরিতকথা দুইটি ভক্তিভাবে পরিপূরিত, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্ত্তি এই গ্রন্থদ্বয়ে উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া যে কয়খানি কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহাদের কোন কোনটির উপরে উল্লিখিত সংস্কৃত চরিতাখ্যানসমূহের প্রভাব ছিল। অর্থাৎ, বঙ্গভাষায় চৈতন্য-জীবনী রচয়িতাগণের অনেকেই উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলায় যে কয়খানি চৈতন্যজীবনী রচিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সমধিক বিখ্যাত—

১। গোবিন্দদাসের কড়চা। ২। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'। ৩। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'। ৪। লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং ৫। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'।

বাঙ্গলায় চৈতন্যচরিত রচয়িতাদিগের মধ্যে কড়চা রচয়িতা গোবিন্দদাস কর্ম্মকার শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে তিনি মহাপ্রভুর সহচর ছিলেন। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে এবং বৈষ্ণব পদকর্ত্তা বলরাম দাসের পদে একথা সমর্থিত হইয়াছে। তথাপি বৈষ্ণব-সমাজ এই গ্রন্থখানিকে

প্রামাণিক বলিয়া মনে করেন না। প্রামাণক না মনে করিবার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে গোবিন্দদাসের কড়চার উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়তঃ, কড়চার ভাষা স্থানে স্থানে অত্যন্ত আধুনিক; তৃতীয়তঃ, কড়চায় চৈতন্যদেবের অলৌকিকতা বর্জ্জিত হইয়া সহজ মানুষ শ্রীচৈতন্যদেবের রূপটি ফুটিয়া উঠায় ইহা বৈষ্ণবদিগের প্রিয় হইতে পারে নাই।

সে যাহা হউক, গ্রন্থখানির প্রামাণিকতা বিষয়ে আমরা সন্দিহান নহি। কারণ গোবিন্দদাস তাঁহার কড়চায় শ্রীচৈতন্যদেবের যে বিবরণ দিয়াছেন, একজন প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন ঐরূপ যথাযথ বিবরণ কেহ দিতে পারেন না। উপরন্তু গোবিন্দদাস যে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্যদেবের সহচররূপে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে সমর্থিতও হইয়াছে। কড়চার ভাষা আধুনিক বটে। তাহাতে ভেজাল থাকিতে পারে, কিন্তু একেবারে জাল, একথা মনে হয় না।

গোবিন্দদাস কর্ম্মকার মহাপ্রভুর মহিমা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া যথাযথভাবে তাঁহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সরলতা এবং সত্যপ্রিয়তা গোবিন্দদাসের কড়চার প্রধান গুণ। কড়চার বর্ণনা অতিমাত্রায় রিয়ালিষ্টিক, কল্পনা কবিত্বের উচ্ছ্বাসে সত্য ঘটনা কোথায়ও চাপা পড়ে নাই। তাঁহার রচিত জীবনকাহিনী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষীকৃত ঘটনাবলীর ইতিহাস। বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ অথবা কৃষ্ণদাস কবিরাজ সকলেই পণ্ডিত ছিলেন। সেইজন্য ইঁহাদের রচনা পাণ্ডিত্যের প্রভায় সমুজ্জ্বল। কিন্তু গোবিন্দদাস পণ্ডিত ছিলেন না। সুতরাং তিনি যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা পাণ্ডিত্যের প্রভায় কৃত্রিম বা রূপান্তরিত হয় নাই। এই কড়চায় বহু ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তত্ত্ব আছে। সর্ব্বোপরি গোবিন্দদাসের কড়চার বিশেষত্ব হইতেছে প্রকৃতি-বর্ণনা। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা দুর্লভ। গোবিন্দদাসে আমরা ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়াছি। তাঁহার "নীলগিরি বর্ণনা", "কন্যাকুমারীর সাগরদৃশ্য" প্রভৃতি বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্ব্ব আলেখ্য।

অতঃপর বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবতে'র নাম করিতে হয়। গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে রচিত হয়। চৈতন্য ভাগবতে শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনের কাহিনী অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ভাগবতের ছাঁচে ফেলিয়া গড়া হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস সর্ব্বদাই চৈতন্যদেবকে ভাগবতের লীলার দ্বারা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

অনেকস্থলেই বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা ভাগবতের পুনরুক্তি মাত্র। চৈতন্যলীলা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণলীলা বৃন্দাবন দাসের কল্পনায় অধিকতর স্পষ্টরূপে মুদ্রিত ছিল। তাই সময়ে সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম হয়।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত বঙ্গভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে চৈতন্যদেবের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল। চৈতন্যজীবনী বর্ণনাচ্ছলে বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থে সে যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক বহু ইতিহাস সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সমাদৃত। বৈষ্ণবাচার্য্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসকে "চৈতন্যলীলার ব্যাস" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস সর্ব্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যদেবকে ভক্তির মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া অঙ্কিত করেন বলিয়া তিনি উল্লিখিতরূপ আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলও শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর রচিত হয়। তখন চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী গড়িয়া উঠিয়া চৈতন্যলীলা'র সত্যটুকুকে ঢাকিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু জয়ানন্দ দক্ষতার সহিত, বিশেষ সতর্কতার সহিত সেই অলৌকিক গল্পলহরীর মধ্য হইতে সত্যটুকুকে উদ্ধার করিয়া দিয়া গিয়াছেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' কল্পনাবিলাস নাই, সত্যপ্রিয়তা তাঁহার রচনার অন্যতম বস্তু। সাধারণতঃ চৈতন্যের তিরোধান রহস্যময় ও অজ্ঞাত। কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল এ বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, কীর্ত্তন করিবার সময় শ্রীচৈতন্যদেবের পা কাটিয়া যায়। সেই সন্তাপে জ্বরগ্রস্ত হইয়া তিনি দেহত্যাগ করেন।

জয়ানন্দের কাব্য পাঁচালীর রীতিতে রচিত। পাচালীর মত ইহা বৈষ্ণব-সমাজে গীত হইত। তাঁহার কাব্যখানি ষোড়শ শতকের শেষার্দ্ধে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল।

লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' চৈতন্যভাগবতের দুই বৎসর পরে রচিত হয়। এই চরিতকথাখানির মধ্যে বহু অলৌকিক কাহিনী এবং রচয়িতার কল্পনা-প্রবণতা মিশ্রিত হইয়া ইহাকে প্রামাণ্য চৈতন্যজীবনী হইতে দেয় নাই। লোচনদাস বৈষ্ণব পদকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার মধ্যে যে কবিপ্রতিভা ছিল তাহার স্পর্শে এই চরিতাখ্যানটি কবিত্বময় হইয়াছে—সত্য ঘটনার বা যথাযথ চিত্রের আলেখ্য ইহাতে নাই। বৃন্দাবনদাসের সাদাসিধা বর্ণনায়, অথবা কৃষ্ণদাস

কবিরাজের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় কবিত্বের লেশমাত্র নাই। কিন্তু লোচনের রচনায় কবিত্বের সুরভি আছে। এই জন্য স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"লোচনদাসের পুস্তক ইতিহাসের মলাট দেওয়া খাঁটি কল্পনার বস্তু"।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা বা শেষ জীবনের কাহিনী বিশদরূপে বর্ণিত না হওয়ায় বৃন্দাবনের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুরোধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন। সুতরাং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের প্রথমভাগের অত্যুজ্জ্বল চিত্র, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যজীবনের অন্ত্যলীলার বিচিত্র কাহিনী। পাণ্ডিত্যের প্রভায় এই গ্রন্থ সমুজ্জ্বল। ইহা দর্শনাত্মক চরিতাখ্যান। চৈতন্যজীবনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বৈষ্ণব দর্শনের, বিশেষতঃ ভক্তিধর্ম্ম প্রভৃতির ব্যাখ্যা চৈতন্যচরিতামৃতে আছে।

চৈতন্যজীবনী রচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে জীবনচরিত রচনার যে সূত্রপাত হইল, তাহারই ফলে উত্তরকালে বহু বৈষ্ণবাচার্য্য এবং চৈতন্য-দেবের পার্ষদগণের জীবনীও রচিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছিল।

বৃন্দাবনদাস

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত রচয়িতা হিসাবে বৃন্দাবনদাস বঙ্গসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

চৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের কয়েক বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল। একথা চৈতন্যভাগবতের অন্তর্গত কবির উক্তির দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে। কবি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে বহুবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

হৈল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন।

চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনের কাহিনী অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে—মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা তেমন বিশদভাবে বর্ণিত হয় নাই, এবং এই কাব্যখানি ভাগবতের আদর্শে রচিত। এই কাব্যে চৈতন্যদেবের লীলা

ভাগবতানুযায়ী চিত্রিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ, চৈতন্যভাগবতের কবি বৃন্দাবনদাস চৈতন্যলীলা যে শ্রীকৃষ্ণলীলারই পুনরাবৃত্তি একথা প্রমাণের জন্য বিশেষ যত্নপর। ইহার ফলে সকল স্থানে বৃন্দাবনদাসের পক্ষে চৈতন্যদেবের জীবনের প্রকৃত স্বরূপ দেখার অবকাশ ঘটে নাই। মহাপ্রভুকে অবতাররূপে প্রমাণ করিবার ঐকান্তিক আগ্রহে এবং তাঁহার লীলা শ্রীকৃষ্ণলীলারই পুনরভিনয় একথা প্রমাণ করিতে গিয়া চৈতন্যজীবনের স্বরূপটি যথাযথরূপে ফুটিয়া উঠে নাই। ভাগবত-কল্পনার প্রভাবে অনেক স্থলেই সত্য আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, অলৌকিক দেবমহিমায় চৈতন্যদেবের মানুষী মহিমা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

কল্পনা-প্রবণতার ফলে শ্রীচৈতন্যদেবের সত্য স্বরূপ চৈতন্যভাগবতে না ফুটিলেও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত হিসাবে এই গ্রন্থখানির অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যলীলা, যৌবনে তাঁহার বিদ্যানুরাগ,—এ সমস্তই চৈতন্য-ভাগবতে অতি সুন্দর করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে। ভক্তির উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি হিসাবেও শ্রীচৈতন্যদেবের রূপটি বৃন্দাবনদাস বিশেষ নিপুণতার সহিতই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অন্যান্য চৈতন্য-চরিতগ্রন্থ অপেক্ষা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক বেশী। এই গ্রন্থান্তর্গত কবির ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসার্হ। ইহাতে ষোড়শ শতকের সামাজিক রাজনৈতিক ও লৌকিক অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ষোড়শ শতাব্দীর একটি সুস্পষ্ট আলেখ্য। গ্রন্থরচয়িতার সমসাময়িক যুগ যেন এই গ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ঠিক এই গুণের জন্যই বিশেষ সমাদৃত।

বৃন্দাবনদাসের প্রতিভা শুধু চৈতন্যভাগবত রচনায় পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি 'নিত্যানন্দবংশমালা' নামক কাব্য এবং বহু পদরচনাও করেন। তাঁহার পদাবলী 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি বৈষ্ণব-পদসংগ্রহে স্থান পাইয়াছে।

কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী

চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী বর্ণনা করিয়া বাঙ্গলায় অনেকগুলি কাব্য রচিত হইয়াছিল। যেমন, গোবিন্দদাসের কড়চা, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত। চৈতন্যদেব-সম্বন্ধীয় উল্লিখিত জীবনী কয়খানির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সম্মান ও সমাদর লাভ করিয়াছে। আজিও বাঙ্গলার ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই গ্রন্থখানি প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় একবার পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। কারণ, এই গ্রন্থে কেবল শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য ও মহাপ্রভুর মূল্যবান্ উপদেশসমূহ যেমন দক্ষতার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তেমনটি আর অন্য কোনও চৈতন্য-জীবনীতে দৃষ্ট হয় না। এই গ্রন্থখানি শুধুমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ নহে, ইহার মধ্যে বৈষ্ণব-দর্শন সম্যক্ভাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে পাণ্ডিত্যের সহিত চৈতন্যজীবনের সত্য ঘটনাবলীর অপূর্ব্ব সম্মেলন ঘটিয়াছে। কবিত্বের উচ্ছ্বাসবশতঃ লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে সত্য চাপা পড়িয়াছে। কল্পনার আশ্রয় লওয়াতে লোচনদাস চৈতন্যদেবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত অনুরূপ। কবিত্বের উচ্ছ্বাসে অথবা কল্পনার আতিশয্যে ইহার কোথায়ও সত্য ঘটনার অপলাপ ঘটে নাই। জীবনচরিত রচনা করিতে হইলে কল্পনার রঙে ঘটনা-বলীকে অনুরঞ্জিত করা যে কত বড় ভুল তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতখানি মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া সাব্-ডিভিসনের মধ্যে অজয় নদের উত্তর এবং ভাগীরথীর তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ঝামটপুর নামক গ্রামে এক বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভগীরথ, মাতার নাম জাহ্নবী। তাঁহার পিতা চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া অতিকষ্টে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কৃষ্ণদাসের বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। বাল্যেই তিনি তাঁহার মাতাকেও হারাইয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি তাঁহার পিসিমার আশ্রয়ে

লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। সুতরাং শৈশব হইতেই কৃষ্ণদাস অতিশয় কষ্টে জীবন-যাপন করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি অতি কষ্টেই জীবন অতিবাহিত করেন। আজীবন তিনি বিধাতার উপেক্ষিত ছিলেন, একদিনের জন্যও সৌভাগ্যের মুখ তিনি দেখেন নাই। কিন্তু দারুণ কষ্টেও তিনি এতটুকু অভিভূত হন নাই।

কৃষ্ণদাস দারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকিয়াও বিদ্যাশিক্ষায় কখনও অবহেলা করেন নাই। বাল্যে তিনি তাঁহার গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি স্বচেষ্টায় অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া সংস্কৃতে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিছু পারশী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস আবাল্য ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। সাধন, ভজন ও ধর্ম্মচিন্তায় তাঁহার যৌবন অতিবাহিত হয় এবং শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের অত্যাশ্চর্য্য লীলা শ্রবণ করিয়া তিনি চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া অতিমাত্রায় চৈতন্যভক্ত হইয়া পড়িলেন। এমনি সময়ে—যখন তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর তখন তাঁহার আশ্রয়দাত্রী পিসিমা মৃত্যুমুখে পতিতা হন। তখন নিরাশ্রয় হইয়া কৃষ্ণদাস পদব্রজে বহুকষ্টে বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থান বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি—

> শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
> শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ।

এই ছয় জন বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য কয়েকখানি ভক্তিমূলক বৈষ্ণব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলেন। এইরূপে বৈষ্ণব শাস্ত্রসমূহে তাঁহার অসীম জ্ঞান লাভ হইল। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার সংস্কৃত মহাকাব্য 'গোবিন্দলীলামৃত' অতি উপাদেয় গ্রন্থ। সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত নামক গ্রন্থখানি রচিত হইবার পূর্ব্বে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ ভক্তির সহিত বৃন্দাবনদাস রচিত চৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানিই পাঠ করিতেন। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা বা শেষ জীবনের কাহিনী উত্তমরূপে বর্ণিত না থাকায়, তাঁহারা ঐ গ্রন্থ পাঠ

করিয়া তেমন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন না। এই জন্ত বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ পরম-পণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজকে শ্রীচৈতন্তদেবের শেষ জীবনের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া একখানি চরিতগ্রন্থ রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তখন কবিরাজ গোস্বামী অশীতিপর বৃদ্ধ। তাঁহার তখনকার শরীর ও মনের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্তহালে মনবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত, চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ পীড়ায় ব্যাকুল, রাত্রি দিন মরি॥

তথাপি তিনি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। তাঁহাদের অনুরোধ শিরোধার্য্য করিয়া নবোৎসাহে সঞ্জীবিত হইয়া তিনি এই গুরুতর কার্য্য-সম্পাদনে ব্রতী হইলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্তদেবকে দেখেন নাই—কড়চা রচয়িতা গোবিন্দ-দাসের মত চৈতন্তদেবের সঙ্গে সঙ্গে সহচররূপে থাকিয়া চৈতন্তদেবের দেবোপম চরিত্রের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। কারণ, চৈতন্তদেবের যখন তিরোধান হয় সেই সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বালক মাত্র। সুতরাং চৈতন্তচরিতামৃত রচনার জন্ত তিনি তাঁহার পূর্ব্বজ চৈতন্তজীবনী-রচয়িতাগণের গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিলেন; ভাগবত, মহাভারত এবং নানা পুরাণ হইতে রচনার মাল-মসলা সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন বৈষ্ণবাচার্য্য রঘুনাথ। ইনি মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের শেষাবস্থায় নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং চৈতন্ত-লীলার বিস্তারিত বিবরণ অবগত ছিলেন। সুতরাং ইঁহার নিকট হইতেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থরচনার অনেক উপকরণ প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহার নিকট হইতে বিশেষ করিয়া জানিতে পারিলেন চৈতন্তদেবের শেষ জীবনের কাহিনী। এইরূপে পূর্ব্বজ কবিগণের গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া এবং আপনার দীক্ষাগুরু চৈতন্তসহচর রঘুনাথ এবং অন্তান্ত বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট হইতে চৈতন্তদেব সম্বন্ধে মৌখিক বিবরণ অবগত হইয়া, কৃষ্ণদাস কবিরাজ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে দীর্ঘ নয় বৎসরের চেষ্টায় তাঁহার অমর গ্রন্থ চৈতন্তচরিতামৃত রচনা সমাধা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যদেবের আজীবনের লীলা-সম্বলিত পদ্যময় বৃহৎ গ্রন্থ। এখানি দর্শনাত্মক চরিতাখ্যান। গ্রন্থমধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে কবি সাতিশয় নিপুণতার সহিত বৈষ্ণব-দর্শনেরও আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে মহাপ্রভুর জীবনকথা তিনভাগে বিভক্ত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিনখণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থখানিতে নানাবিধ ঘটনার সমাবেশ আছে, এবং গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের অগাধ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবি যে সংস্কৃতে একজন সুপণ্ডিত ছিলেন তাহার পরিচয় প্রত্যেক অধ্যায়েই বর্ত্তমান। প্রতি অধ্যায়ের প্রথমেই তিনি কয়েকটি করিয়া স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক দিয়াছেন। কোন কোন স্থানে শ্লোকসমূহের সংস্কৃত টীকা যোজনাও করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন, ভাগবত, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত করিয়া আপনার বক্তব্যটি সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত যে কেবল একখানি জীবনচরিত তাহা নহে, ইহা একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ও দার্শনিক গ্রন্থরূপেও সমাদৃত। গ্রন্থখানি বৈষ্ণব-দিগের চিরসহচর। কারণ ইহাতে দেখি যে, চৈতন্যদেবের জীবনের বৃত্তান্তগুলি কবি যতদূর সম্ভব সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৃত্তান্তগুলি যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয়, সেজন্যও কবি বিশেষ সজাগ ছিলেন। চৈতন্যদেব সম্বন্ধীয় সত্য ঘটনাবলী বিবৃত করিতে তিনি যতটা চেষ্টা করিয়াছেন, কবিত্বশক্তি প্রকাশের জন্য ততটা চেষ্টা করেন নাই। এইজন্য চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানিতে চৈতন্যদেবের জীবনকথা বাস্তবতাগন্ধী হইয়াছে। কল্পনার আবেগ বা আতিশয্যে কোথাও অবাস্তব ঘটনাবলী প্রক্ষিপ্ত হয় নাই।

চৈতন্যদেবের জীবনকথা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলায় যে কয়খানি কাব্য রচিত হইয়াছিল তন্মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানিই সর্ব্বশেষে রচিত। অর্থাৎ গোবিন্দদাসের কড়চা, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত এই কয়খানি গ্রন্থের পরে চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়। সেই জন্যই বোধ হয় পূর্ব্বজ কবিগণের যত কিছু দোষ তাহা কৃষ্ণদাস পরিমার্জ্জিত করিতে পারিয়াছিলেন। সেই কারণেই তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত সর্ব্বদোষবর্জ্জিত শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ হইয়াছে। ইহাতে হয়ত ঘটনার ঘন সন্নিবেশ নাই, কিন্তু বৈষ্ণবোচিত বিনয় এবং ভক্তিতত্ত্বের

অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা গ্রন্থখানিকে অতুলনীয় করিয়া তুলিয়াছে। বৃন্দাবনদাসের রচিত চৈতন্যজীবনী 'চৈতন্যভাগবতে'র অন্ত্যলীলা অংশটি বিশদভাবে রচনা করিবার জন্য কবি অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল অন্ত্যলীলা তিনি বিশদভাবে রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। আদি ও মধ্যলীলায় বৃন্দাবনদাস যে সকল কথা ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই সকল অংশও অতিশয় দক্ষতার সহিত পূরণ করিয়াছেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের একমাত্র দোষ ইহার ভাষা। গ্রন্থখানির ভাষা সরসসুন্দর নহে। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ শব্দের সংমিশ্রণে চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা স্থানে স্থানে কিছু শ্রুতিকটু হইয়াছে। তবে সরল ভাষার প্রয়োগ গ্রন্থখানিতে যে একেবারে দুর্লভ তাহা নহে।

কিন্তু এই দোষটুকু অকিঞ্চিৎকর। ভাষা নির্দ্দোষ না হইলেও কবি তাঁহার বক্তব্য সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিয়াছেন। এইজন্য বৈষ্ণবগণ গ্রন্থখানিকে আজিও পূজা করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনের রাধাদামোদরের মন্দিরে কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর স্বহস্তলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি আজিও রক্ষিত হইয়া ভক্ত বৈষ্ণবদিগের অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইতেছে। শিখেরাও ঠিক এইভাবে তাহাদের গুরু নানকের উপদেশাবলী-সম্বলিত গ্রন্থ-সাহেবের পূজা আজিও করিয়া থাকে। তাঁহার জন্মস্থান ঝামটপুরও বৈষ্ণব ভক্ত ও সাহিত্য-সেবিগণের দর্শনীয় স্থান। তথায় কবির শিষ্য কর্ত্তৃক অনুলিখিত চৈতন্য-চরিতামৃতের নকল এবং কবিরাজ গোস্বামীর কাষ্ঠ পাদুকা বর্ত্তমান রহিয়া নিত্য পূজা পাইতেছে।

কিন্তু যে গ্রন্থের জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের এত খ্যাতি—যে গ্রন্থ আজিও পূজার সামগ্রী, উহার সমাদর কবি তাঁহার জীবদ্দশায় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। গ্রন্থখানির রচনা শেষ করিয়া বৃদ্ধ কবির মনে অসীম আনন্দ ও স্বস্তির সঞ্চার হইয়াছিল। ঐ সময়ে কবি পরমানন্দে মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থের জন্যই বড় দুঃখে ও বড় শোকে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছিল।

ঘটনাটি হইয়াছিল এই—সেই সময়ে চৈতন্যদেবের জীবন সম্বন্ধে কিছু রচনা করিলে উহা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইত। তাঁহাদের অনুমোদন ভিন্ন কোন চৈতন্যজীবনী বৈষ্ণবসমাজে প্রচারলাভ করিতে পারিত না। এই প্রথা অনুযায়ী গ্রন্থখানি বৈষ্ণবাচার্য্য জীব-

গোস্বামীর নিকট প্রেরিত হইল। কিন্তু পথিমধ্যে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর-নিযুক্ত দস্যুগণ পুস্তকখানি লুণ্ঠন করে। এই সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণদাস অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। জীবনের শত সহস্র দারিদ্র্য-দুঃখ যাঁহাকে এতটুকু বিচলিত ও ক্ষুব্ধ করিতে পারে নাই, তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার আজন্মের সাধনা ও পরিশ্রমের ফল এইভাবে অপহৃত হইয়াছে, তখন উহা তাঁহার অসহনীয় হইল। তিনি পুস্তকের শোকে অধীর হইয়া জীবন ত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই করুণ তিরোধান সম্বন্ধে প্রেমবিলাস নামক বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে—

রঘুনাথ কবিরাজ শুনিলা দুজনে।
আছাড় খাইয়া কাঁদে লোটাইয়া ভূমে ॥
বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে।
অন্তর্দ্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে ॥

ভবিষ্যতে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি উদ্ধার পাইয়া জনসমাজে প্রচার লাভ করিবে এবং কবির যশোগাথায় দেশ ছাইয়া যাইবে, একথা কবি যদি জানিতে পারিতেন, তবে তিনি বিমল আনন্দের সহিতই প্রাণত্যাগ করিতে পারিতেন। কবি যদি জানিতেন যে, তাঁহার কঠোর পরিশ্রমের সুফল ফলিবে, তাঁহার গ্রন্থ বঙ্গদেশে সম্মান ও ভক্তির বস্তু হইবে, তবে এরূপ করুণভাবে কবির জীবনাবসান হইত না।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরিত-সাহিত্য

চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া বঙ্গসাহিত্যে যেরূপ কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদগণের ও তাঁহার শিষ্যগণের জীবনকাহিনী লইয়াও সেইরূপ কয়েকখানি চরিতাখ্যান রচিত হয়। ঐ সকল চরিতাখ্যান বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছে, ঐ সকল চরিতাখ্যান বঙ্গদেশের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের জীবনকাহিনী সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিয়াছে, বাঙ্গলায় বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসেও আলোকপাত করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ ও শিষ্যগণের মধ্যে অনেকের জীবনকাহিনী অবশ্য চৈতন্য-চরিতাখ্যানসমূহের মধ্যে চৈতন্যলীলা বর্ণনা-প্রসঙ্গেই বর্ণিত হইয়াছে।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কাহিনী, অদ্বৈতাচার্য্যের কাহিনী, রূপ সনাতনের কাহিনী, জীবগোস্বামী, গদাধরদাস প্রভৃতির ভক্তিমাহাত্ম্য ও জীবনকাহিনী মহাপ্রভুর সমস্ত জীবনচরিতগুলির মধ্যে অল্প-বিস্তর বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাই। স্বতন্ত্রভাবেও উল্লিখিত বৈষ্ণব মহাজনগণের এবং চৈতন্যযুগের ও চৈতন্যোত্তর যুগের অনেক বৈষ্ণবাচার্য্যের জীবনচরিত-কাব্য রচিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বৃন্দাবনদাস রচিত 'নিত্যানন্দ বংশাবলী'র কথা বৃন্দাবনদাসের আলোচনা-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। এই নিত্যানন্দ মহাপ্রভুই বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান সহায়ক ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে অদ্বৈত আচার্য্যের কয়েকখানি জীবনীকাব্য রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ঈশান নাগরের "অদ্বৈত প্রকাশ", শ্যামদাস আচার্য্য প্রণীত "অদ্বৈতমঙ্গল" এবং হরিচরণ দাস কর্ত্তৃক রচিত "অদ্বৈতমঙ্গল" বিশেষ বিখ্যাত। ঈশান নাগরের 'অদ্বৈত প্রকাশ' ১৪৯০ শকে অর্থাৎ ১৫৬৮-১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাউড়ে রচিত হয়। এই জীবনীগ্রন্থখানির বর্ণনা সুললিত। ঈশান নাগর বাল্যকাল হইতে অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে লালিত-পালিত হন এবং সেই হেতু শ্রীচৈতন্যদেবের অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। সুতরাং কবি তাঁহার 'অদ্বৈতপ্রকাশে' শুধুমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ অদ্বৈতাচার্য্যের জীবনকথাই লিপিবদ্ধ করেন নাই। ইহাতে কবি কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষীকৃত চৈতন্যজীবনের অনেক কথাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ফলে চৈতন্যজীবনের বহু উপকরণের সন্ধানও ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে মিলে। তবে ঈশান নাগর শ্রীচৈতন্যদেবকে দৈবী মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া দেখিয়াছেন। মহাপ্রভুর দেবত্ব প্রচার করিতে কবি এত কথার অবতারণা করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিতে করিতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। গ্রন্থ পাঠ করিয়া চৈতন্যদেবের মানুষী মহিমাটুকু উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া উঠে। চৈতন্যদেবকে তুলসীচন্দনে লিপ্ত বিগ্রহরূপে ফুটাইয়া তোলা মধ্যযুগের জীবনচরিত রচয়িতাদিগের বিশেষত্ব ছিল। ঈশান নাগর মহাপ্রভুর অলৌকিক জীবনের অলোকসামান্য লীলা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যুগপ্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিয়া চৈতন্যজীবনীকে দেবলীলাজ্ঞাপক করিয়া তুলিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও বলিতে হয় যে, 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র বর্ণনা সহজ ও সুন্দর। স্থানে স্থানে কবিত্বের স্ফুরণও হইয়াছে। করুণ রসোদ্রেকে ঈশান নাগর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের

তিরোধানের পরে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যে চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা "শোকে সকরুণ, ব্রত উদ্‌যাপনে পবিত্র ও কঠোর পাতিব্রত্যে মহিমান্বিত। এই চিত্রের বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি সর্ব্বতোভাবে মহাপ্রভুর সহধর্ম্মিণীর উপযুক্ত। ঈশান নাগর চাক্ষুষ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা লিখিয়া এস্থলে করুণার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।" (দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)॥ অদ্বৈতপ্রকাশের ঐতিহাসিক-তত্ত্বও মূল্যবান।

শ্যামদাস আচার্য্য এবং হরিচরণ দাস অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা নিজেদের দীক্ষাগুরু অদ্বৈতাচার্য্যের জীবনকথা 'অদ্বৈতমঙ্গল' নামে রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অদ্বৈতাচার্য্যের আর একখানি জীবনকথা পাওয়া গিয়াছে। ইহার নাম 'অদ্বৈতবিলাস'। ইহার রচয়িতা নরহরিদাস। গ্রন্থখানির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্দনাসূচক একটি পদ আছে। ইহাতে মনে হয়, এই কবির আবির্ভাব কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরবর্ত্তী কালে। 'অদ্বৈতবিলাসে' মহাপ্রভুর বাল্যলীলা সাড়ম্বরে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর বৈষ্ণব সমাজে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতাররূপে বন্দিত। ইঁহাদের জীবনকথা বর্ণনা করিবার জন্যও বহু কবি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস'; নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস', যদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দ', মনোহরদাস রচিত 'অনুরাগবল্লী', গুরুচরণ দাসের 'প্রেমামৃত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নরহরি চক্রবর্ত্তী রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস' অতি মূল্যবান চরিতকথা। ভক্তিরত্নাকরে জীব গোস্বামী এবং অন্যান্য গোস্বামীগণের বিবরণ আছে—কিন্তু মুখ্যতঃ ইহা শ্রীনিবাসের জীবনকথা অবলম্বনেই রচিত। এই গ্রন্থে খেতুরীর মহোৎসবের কথা আছে, শ্যামানন্দ কর্ত্তৃক উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে রাগরাগিণী ও নায়ক-নায়িকাভেদ সম্বন্ধে যে আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কবি স্বীয় পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের একটি সুন্দর মানচিত্র কথার তুলিকায় কবি এই গ্রন্থে আঁকিয়াছেন। প্রাচীন বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের সেই ভৌগোলিকতত্ত্ব ঐতিহাসিকগণের নিকট চিরদিনই সমাদৃত হইবে।

ভক্তিরত্নাকরে সংস্কৃত পুরাণাদি হইতে, চৈতন্য-সম্বন্ধীয় সংস্কৃত ও বাঙ্গলা চরিতকথা হইতে, বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে বহু উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। গোবিন্দদাস, নরোত্তমদাস প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব পদকর্ত্তার পদ কবি তাঁহার বক্তব্য বিষয়টিকে সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। কবির স্বরচিত কিছু কিছু পদও 'ঘনশ্যাম'—এই ভণিতায় গ্রন্থমধ্যে বক্তব্যকে প্রস্ফুট করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থ কবির পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, সংগ্রহনৈপুণ্য, বিন্যাসকৌশল, বর্ণনাকৌশল প্রভৃতি বহু গুণের পরিচায়ক। এক কথায় বলিতে গেলে নরহরিদাস তাঁহার ভক্তিরত্নাকরে ইতিহাসের পাষাণমন্দিরকে পদাবলীর কোমল লতিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া উহাকে কুসুম-সুকুমার করিয়া তুলিয়াছেন। কবির ঐতিহাসিক ঘটনা-বর্ণনাপ্রণালী সরল গদ্যের লক্ষণাক্রান্ত।

নরহরিদাসের 'নরোত্তম বিলাস' বৈষ্ণবাচার্য্য নরোত্তমদাসের জীবনকথা। আকারে ইহা 'ভক্তিরত্নাকর' অপেক্ষা ক্ষুদ্র। কিন্তু ইহাতে কবির পরিণত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য এই গ্রন্থে ভক্তিরত্নাকর অপেক্ষা কম। কিন্তু ঘটনাবিন্যাস-কৌশলে কবি পরিণত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস ১৫২২ শকে অর্থাৎ ১৬০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহাতে মুখ্যতঃ শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্যামানন্দ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার সহযোগীদিগের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানির মধ্যে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশও স্থান লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তৎসত্ত্বেও একথা বলিতে হয় যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাসে প্রেমবিলাস যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে। প্রেমবিলাসে নিত্যানন্দের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, কবির ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় গ্রন্থান্তর্গত বর্ণনা সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দ'ও চৈতন্যোত্তরযুগের একখানি বিখ্যাত চরিতগ্রন্থ। যদুনন্দন দাস জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার আদেশে 'কর্ণানন্দ' কাব্যখানি রচনা করেন। ইহাতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনকথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থরচনা ১৫২৯ শকে বা ১৬০৭-১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। যদুনন্দনের গ্রন্থে কবিত্বের পরিচয় আছে। কবিত্বের অবতারণা করিয়া গ্রন্থমধ্যে যদুনন্দন দাস একটা সুরজাল সৃষ্টি করিয়াছেন।

গুরুচরণ দাসের 'প্রেমামৃতে' শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রথম জীবনের প্রধান প্রধান কাহিনীসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা প্রেমবিলাসের পরবর্ত্তী কালে রচিত। কারণ ইহাতে 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থখানির উল্লেখ রহিয়াছে।

গোপীবল্লভ দাসের 'রসিকমঙ্গলে' শ্যামানন্দের প্রধানতম শিষ্য রসিকানন্দ বা রসিক মুরারির জীবনী বর্ণনা করা হইয়াছে। এ গ্রন্থখানিরও ঐতিহাসিক মূল্য কম নহে।

শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ জগদীশ পণ্ডিতের জীবনী 'জগদীশচরিত্রবিজয়' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

মনোহরদাস রচিত অনুরাগবল্লী ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জীবনী আছে। গ্রন্থখানির রচনা সমাপ্ত হয় ১৬১৮ শক বা ১৬৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে।

উল্লিখিত জীবনীসমূহ হইতে শুধু শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ বা তাঁহার শিষ্যবর্গের জীবনকথা আমরা জানিতে পারি নাই; বৈষ্ণবধর্ম্মের, বৈষ্ণব-সাধনার এবং শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের অনেক তথ্যও এই সকল চরিতকথায় মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং চৈতন্যজীবনের স্বরূপ উপলব্ধিতে এবং বৈষ্ণবসাধনার সহিত পরিচিত হইতে উল্লিখিত চরিতকথাসমূহের আলোচনা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

মঙ্গলকাব্য

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এক শ্রেণীর কাব্য রচিত হইত। উহা মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। এই মঙ্গলকাব্যগুলি উপাখ্যানমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক কাব্য। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্য দিয়া বিভিন্ন কবি বিবিধ দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মঙ্গলকাব্য রচনায় উদ্দেশ্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও পূজাপ্রচার। মঙ্গলকাব্যগুলি গান করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত। তাই মঙ্গলকাব্যের অপর নাম মঙ্গলগান। অর্থাৎ এই সকল গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত। এই শ্রেণীর গান শুনিলে মঙ্গল হয়। প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে দেবতাদিগকে মঙ্গলকারী ও শক্তিশালীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

যে যে দেবতার পূজা সমাজে প্রচলিত ছিল না, সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে মঙ্গলকারী শক্তিসম্পন্ন প্রবল ও জাগ্রত দেবতা বলিয়া প্রচার করিবার জন্য ও তাঁহাদের পূজা-প্রচারের জন্য মঙ্গলকাব্যসমূহ রচিত হইয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের মধ্যে বহু বৌদ্ধ দেবদেবী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দেবতাদিগের ছদ্মনামে নিজেদের স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আত্মগোপন করিতেছিল, তখন বৌদ্ধেরা নিজেদের দেবদেবীর উপর ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর নাম আরোপ করিয়া নিজেদের দেবতাদিগকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই চেষ্টার ফলে বহু বৌদ্ধ দেবদেবী ব্রাহ্মণ্য দেবতাদিগের নাম লইয়া অথবা ব্রাহ্মণ্য দেবতাদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া জনসমাজে নিজেদের আসনটিকে বজায় রাখিয়াছিলেন। এই সকল আগন্তুক দেবতাদিগকে মঙ্গলকারী এবং প্রবল ও জাগ্রত দেবতারূপে প্রতিপন্ন করার একটা চেষ্টাও এই যুগে পরিলক্ষিত হয়। ফলে এক শ্রেণীর বাঙ্গলা পুরাণ রচিত হইতে থাকে—তাহাই মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্যের সাহায্যে বৌদ্ধ দেবতা ধর্ম্ম, প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মরূপী দক্ষিণরায়, বৌদ্ধ শক্তি হারিতি প্রচ্ছন্ন হইয়া শীতলা নামে, বৌদ্ধ শক্তি তবিতা বা তরিতা মনসা নামে, এবং বজ্রতারা বা বাশুলী সংস্কৃত বিশালাক্ষী নাম লইয়া পুরাণের

চণ্ডীর সহিত একাত্ম হইয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও পূজাপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন দেখা যায়।

এই সকল মঙ্গলকাব্য প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ ও সংস্কৃত মহাকাব্যের মিশ্রিত আদর্শে রচিত হইত। সংস্কৃত পুরাণগুলি রচিত হইয়াছিল বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পূজনীয় দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্তে। সেই দেবতার ভক্ত বিশেষ কোন রাজা বা মহাপুরুষ। সুতরাং সংস্কৃত পুরাণে দেবতার ভক্ত রাজা বা মহাপুরুষের কীর্ত্তিও বর্ণিত হইত, তাঁহাদিগের বংশপরিচয় প্রভৃতিও প্রদত্ত হইত। সংস্কৃত পুরাণের মধ্যে পাঁচটি লক্ষণ থাকিত—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরানি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং॥

মঙ্গলকাব্যসমূহে এই আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে দেখিতে পাই। তবে মঙ্গলকাব্যসমূহ বাঙ্গলায় রচিত—দেবতার মাহাত্ম্য সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণের আদর্শ অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ণনা বাঙ্গলায়। নূতন একটি ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তাহা প্রচার করা উচিত। মনসা চণ্ডী প্রভৃতির পূজকগণও তাহাই করিয়াছেন। ধর্ম্ম-কলহ ও ধর্ম্ম-প্রচারেই বঙ্গভাষা সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতক পর্য্যন্ত এইরূপ দেবতার মাহাত্ম্যপূর্ণ বহু কাব্য রচিত হয়। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানও কালিকামহিমা বর্ণনার সহায়তা করিয়াছে।

মঙ্গলকাব্যে শুধু আগন্তুক বৌদ্ধ দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হয় নাই; বহু প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তনের জন্যও মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। যেমন কৃষ্ণমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি।

মঙ্গলকাব্যে স্ত্রীদেবতাদিগেরই প্রাধান্য দেখা যায়। পুরুষদেবতার লীলাত্মক মঙ্গলকাব্যেও আছে। যেমন,—ধর্ম্মমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, রায়মঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, জগৎমঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল ইত্যাদি।

দেবতার লীলা-প্রচারক মঙ্গলকাব্যসমূহকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) পৌরাণিক দেবতার লীলা-প্রচারক মঙ্গলকাব্য, (২) লৌকিক আগন্তুক দেবতাদিগের লীলা-প্রচারক মঙ্গলকাব্য।

পৌরাণিক দেবতাদিগকে লইয়া রচিত মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি আগন্তুক লৌকিক দেবতাদিগের মাহাত্ম্য-প্রচারক-কাব্য। এই সকল লৌকিক দেবতাদিগের লীলা প্রচারক কাব্যের উপাখ্যান পৌরাণিক নহে।

চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার আভাষ পাওয়া যায়। চণ্ডীর সহিত গঙ্গার কলহের সময়ে গঙ্গা চণ্ডীকে নিন্দাচ্ছলে বলিতেছেন—তুমি "নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, চণ্ডীর নিকট শূকর বলিদান হইত। ধর্মঠাকুরের পূজা-পদ্ধতিতেও বৌদ্ধ প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁহার নিকট হাঁস, পায়রা এমন কি শূকর বলিও হইত।

ধর্মমূলক এই মঙ্গলগানগুলি বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যের একটি ধারাকে বিশেষ সম্পদ্‌শালী করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম অবস্থায় এই সকল কাব্য ছড়ার আকারে, ক্ষুদ্র ব্রতকথার আকারে রচিত হইত। কালক্রমে বিভিন্ন কবির প্রতিভার আলোক-সম্পাতে সেগুলি বিশাল কাব্যের আকার ধারণ করিয়াছে। এই মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অনাবিষ্কৃত বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। মধ্যযুগের জনসমাজের সুখ-দুঃখের কাহিনী ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও ইহাতে আছে। কল্পনা, কবিত্ব, চরিত্রচিত্রণশক্তি, সম-সাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের আলেখ্য—এ সবই মঙ্গলকাব্যসমূহে আছে।

মধ্যযুগের বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্য অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, একই দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া এক এক করিয়া বহু কবিই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত বাঙ্গলা সাহিত্যের পার্থক্য এইখানে। ইউরোপীয় কাব্যে এক কবি যে গীতি গাহিয়াছেন, অন্য কবির কল্পনা সে পথ অনুসরণ করে নাই। তাঁহার কল্পনা ভিন্ন পথে গিয়াছে, তিনি স্বতন্ত্র আদর্শে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়া সাহিত্যকে সুসমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী কবিগণ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির পথ না দেখিয়া প্রায়ই অগ্রসর হন নাই। একই বিষয়ের পুনরুক্তি করা বাঙ্গলার প্রাচীন কবিদিগের এক ধারা ছিল। এক মনসাদেবীর গীতিলেখক শতাধিক পাওয়া গিয়াছে। ঠিক সেইরূপ চণ্ডী, দুর্গা, কৃষ্ণ, গঙ্গা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবদেবীগণের গীতিলেখক একজন নহেন। বহু কবি একই দেব অথবা দেবীর গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। কাহারও কাব্য ক্ষুদ্র, কাহারও কাব্য বৃহৎ। কাহারও কাব্যে দেবতা ও মানবচরিত্র উত্তমরূপে বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে,

আবার কাহারও কাব্যে চরিত্রবিশ্লেষণ ও বর্ণনা তেমন মনোহর হয় নাই। কেহ হয়ত প্রথমে সামান্য মাল-মসলা সাজাইয়া ক্ষুদ্র ব্রতকথার আকারে কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। তাহাতে হয়ত সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু বিকাশ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী আর কোনও ক্ষমতাশালী কবি হয়ত উহাকেই আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কবির কাব্যখানিকে পল্লবিত ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। এইরূপ প্রচেষ্টার ফলেই মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি সাধন হইয়াছিল। বাঙ্গলা মঙ্গলকাব্যসাহিত্যও এইরূপে গড়িয়া উঠিয়া বঙ্গসাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে।

মনসা-মঙ্গল কাব্য

মানুষ যে অবস্থায় প্রকৃতির পূজা করিত সেই সময় হইতেই বোধ হয় সর্পপূজার প্রচলন হইয়াছে। সর্প ভীতিই সর্প পূজা প্রচলনের কারণ। মঙ্গলকাব্যের লৌকিক দেব-দেবীদিগের পূজা-প্রচলনের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন—"লৌকিক দেবতাগণের পূজা প্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। যেখানে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, সেইখানেই দুর্ব্বলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়। শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চিন্তিতা মাতা কি মাতামহীর দুর্ব্বলতাসূত্রে ষষ্ঠী কল্পিত হইলেন। চণ্ডিকা ও হরি চিরপ্রসিদ্ধ দেবতা; কিন্তু বিপদ নিবারণার্থ ও আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে এই দুই দেবতা ঈষৎ নাম ও ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দুর্ব্বলের সহায়রূপে উন্নীত হইলেন; একজনের নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী; আর এক জনের নাম হইল সত্যনারায়ণ।" সর্প গৃহস্থের শত্রু। সেইজন্য সর্পের দেবতাকে তুষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা হইতে মনসার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল।

সর্প পূজা শুধু ভারতবর্ষেই প্রচলিত এমন নহে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সর্প পূজা হইত। প্রাচীন মিশর, গ্রীস ও রোমে সর্পের পূজা প্রচলিত ছিল। চীনদেশে অদ্যাপি সর্প মন্দির বর্ত্তমান আছে। ক্রীটদেশে অনেক দেব-দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির সমস্ত অবয়ব সর্পজড়িত।

বৈদিক সাহিত্যে রুদ্র অহিভূষণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, শতপথ ব্রাহ্মণে এবং ঋগ্বেদে পৃথিবীকে 'সর্পরাজ্ঞী' বলা হইয়াছে। মহাভারতকার সর্পযজ্ঞ লইয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে অথবা সংস্কৃত মহাভারতে সর্প দেবতারূপে কল্পিত হইলেও মনসার নাম আমরা সেখানে পাই না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আমরা সর্ব্বপ্রথমে মনসার নাম উল্লেখ দেখিতে পাই। পদ্মপুরাণে ইঁহারই নাম বিষহরি। আমরা মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এই মনসা এবং বিষহরি উভয় নামই পাই। চৈতন্যভাগবতে পাই—

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে সর্ব্বজনে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন পনে।

পদ্মপুরাণের বিষহরিকে সীজবৃক্ষে আবাহন করিতে হয়। মনসার এক নাম পদ্মা। ইহার মূলও পদ্মপুরাণ। তবে ঐ নামটুকুই পদ্মপুরাণে পাওয়া গিয়াছে। মনসামঙ্গলের কাহিনী কোন পুরাণে নাই—এ কাহিনী একেবারে লৌকিক।

অনেকে মনে করেন মিশর দেশ হইতে ফিনিসিয়গণ সর্প পূজাপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া, ভারতে উহা প্রচলন করেন। কিন্তু দ্রাবিড়সভ্যতা হইতে আমরা সর্পপূজা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া মনে হয়। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার দ্রাবিড় সভ্যতা হইতে আর্য্যগণ যে যে পূজাপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সর্পপূজা অন্যতম।

মঙ্গলকাব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছি যে, শীতলা, বিষহরি, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবতা পৌরাণিক নহেন। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের সংমিশ্রণে ইঁহাদের উৎপত্তি। মনসামঙ্গলগুলিতে বৌদ্ধ প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় লক্ষিত হয়। মনসামঙ্গলসমূহে ব্রাহ্মণ বা উচ্চ বর্ণের চরিত্র একরূপ নাই বলিলেও চলে। বণিক জাতির গৌরব প্রচারই এই নীতির অন্যতম বিষয়। আমরা জানি, বণিক জাতি বৌদ্ধযুগে এদেশে ধনে মানে উন্নত ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের পর তাঁহাদের অধঃপতন ঘটিয়াছে।

বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত নাথ-গীতিকার সহিত মনসামঙ্গলের কতকগুলি বিষয়ে ঐক্য দৃষ্ট হয়। ইহাও মনসামঙ্গলে বৌদ্ধ প্রভাবের পরিচায়ক। যথা (১) ব্রাহ্মণের যাহা কিছু প্রভাব তাহা দৈবজ্ঞ আচার্য্যের, (২) হিন্তাল বা হেঁতালের লাঠি চাঁদসদাগর এবং হাড়ি সিদ্ধা—উভয়ের হাতেই দেখা যায়, (৩) উভয় গীতিতেই 'মহাজ্ঞানে'র অপূর্ব্ব ক্ষমতার কথা বলা হইয়াছে। (৪) মাণিক

চাঁদের গানে 'মন পবনের নৌকা'র উল্লেখ আছে। চাঁদ সদাগরের নৌকাও সেই 'মন পবনে' নির্ম্মিত।

মনসামঙ্গল কাব্যে দৃষ্ট হয় যে, মনসা দেবীর নিকট অপরাপর বলির সহিত হংস, কচ্ছপ ও কবুতর বলি পড়িত এবং নৈবেদ্যের মধ্যে অপরাপর সামগ্রীর সহিত হংসডিম্বও থাকিত। হিন্দু দেবদেবীর নিকট এরূপ বলি বা অর্ঘ্য কল্পনাতীত। মনসা দেবীর বঙ্গীয় স্তোত্রে দেবীর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা এইরূপ—দেবীর দুই পার্শ্বে জালু ও মালু ভ্রাতৃদ্বয়, তাঁহার বাম পার্শ্বে নেতা ও দক্ষিণে সুগন্ধা। এই ভাবের বর্ণনা কোন হিন্দু পুরাণে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। মনসার পূজা নিম্নশ্রেণীর জনগণের মধ্যেই অধিকতর প্রচলিত ছিল। উচ্চবর্ণের জনসমাজ মনসার পাঁচালীকে বিশেষ আমল দিতেন বলিয়া মনে হয় না। মনসাদেবীর গীতি পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে বৌদ্ধযুগেই সূচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, মনসাদেবীর ব্রাহ্মণ উপাসকগণ পরবর্ত্তী যুগে অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময়ে এই গীতি অনেকটা পরিমার্জ্জিত ও হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং মনসাদেবীকে শোধন করিয়া হিন্দু দেবীরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগে মনসাদেবীকে হিন্দুদেবী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে মনসাদেবীর মূল্য অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহার আদর হইবে না, ইহা ভাবিয়া তাঁহারা পুরাণাদি হইতে কোন প্রামাণিক বচনের দ্বারা মনসাদেবীকে হিন্দুদেবী করিতে প্রয়াসী হইলেন। মহাভারতে বাসুকী নাগের এক ভগ্নীর কথা আছে। তিনি জরৎকারু মুনির পত্নী এবং আস্তিক নামক মুনির মাতারূপে বর্ণিত। মহাভারতের এই আখ্যায়িকার সহিত মনসাদেবীকে জুড়িয়া দিয়া ব্রাহ্মণ উপাসকগণ মনসাকে হিন্দুদেবীরূপে পরিণত করিয়াছিলেন।

মনসামঙ্গল কাব্যে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার প্রতিপত্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যে বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনী আছে। চাঁদ সদাগর এই কাব্যের নায়ক। এই চরিত্রটি বঙ্গসাহিত্যে পুরুষকারের উজ্জ্বলতম আদর্শ।

চাঁদ সদাগর শিবোপাসক। তিনি মনসাদেবীর পূজা করিতে সম্মত হন না। অথচ চাঁদ সদাগর পূজা না করিলে পৃথিবীতে মনসাপূজা প্রচার হইবে না। সুতরাং মনসাদেবীর সহিত চাঁদ সদাগরের বিরোধ বাধিল। দেবীর

সহিত এই বিরোধের মধ্য দিয়া চাঁদ সদাগরের চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়াছে।

মনসাদেবী চাঁদ সদাগরকে উপর্য্যুপরি বিপদে ফেলিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য, বিপদে জর্জ্জরিত হইয়া চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করিবেন এবং দেবীর প্রসাদে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন,—তাঁহার জীবন সফলতায় ও সৌভাগ্যে ভরিয়া উঠিবে। কিন্তু শত দুঃখে পড়িয়াও চাঁদ বেণে মনসার পূজা করেন না। ফলে মনসার কোপ হইল। মনসার কোপে চাঁদ বেণের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও দুর্গতির অন্ত রহিল না। মনসার কোপে একে একে তাঁহার ছয় পুত্র বিনষ্ট হইল। যে 'মহাজ্ঞানে'র বলে চাঁদ বেণে 'চেঙমুড়ি কানী'র সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, মনসার কোপে সেই 'মহাজ্ঞান' লুপ্ত হইল। তাঁহার 'সপ্তডিঙ্গা মধুকর' অমূল্য বাণিজ্যসম্ভার লইয়া জলমগ্ন হইল। কিন্তু তথাপি চাঁদ বেণে ভ্রূক্ষেপহীন। পুত্র-শোকাতুরা সনকার ক্রন্দনে বুঝি বা পাষাণও বিগলিত হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু চাঁদ বেণে অচলের মত অটল—মনসার পূজা কিছুতেই তিনি করিবেন না। চাঁদ সদাগরের এই পৌরুষ—তাঁহার বজ্রাদপি সুকঠোর পণ মনসামঙ্গল কাব্যে অতিশয় উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। মনসাদেবীর কোপে চাঁদ বেণের গৃহ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু ভ্রূকুটিকুটিল ললাটে চাঁদ শত উৎপীড়ন ও কষ্ট সহ্য করিয়াছেন—পরাজয় বা মনসাদেবীর নিকট আত্মসমর্পণের কথা তিনি মনেও স্থান দেন নাই। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী সমুদ্রে ঝড়ে পড়িয়াছে—তিনি নিজে যে তরীতে আরূঢ় তাহাও জলমগ্ন হইতে উদ্যত। এই সকল বিপদের মূল মনসাদেবী। মনসাদেবীর উদ্দেশ্যে একমুঠা ফুল ফেলিয়া দিলেই দেবীর প্রসাদে চাঁদ বেণে সকল বিপদ হইতে রক্ষা পান। কিন্তু তবু চাঁদ বেণে মনসার নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই, বা মনসার পূজা করিয়া দেবীকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন নাই। নিজের পৌরুষ ও ক্ষাত্রতেজে তিনি হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করিয়া আছেন—এতটুকু অবনমিত হন নাই, বিপদে এবং দুঃখ-দুর্দ্দশায় ভাঙিয়া পড়েন নাই বা মনসার নিকট নতিস্বীকার করেন নাই।

মনসার কোপে চাঁদ বেণের বাণিজ্যতরী সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে। চাঁদ বেণে নিজে সমুদ্রের লোণা জলে প্রায় অজ্ঞান হইয়াছেন। এই অবস্থায় পদ্মা কয়েকটি পদ্মফুল ফেলিয়া দিলেন। উদ্দেশ্য, চাঁদসদাগর সেই ফুলকয়টি অবলম্বন করিয়া ভাসিয়া থাকিয়া প্রাণরক্ষা করুন। নিজের পূজাপ্রচারের

জন্ত মনসা চাঁদকে দুঃখকষ্টে বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু চাঁদকে মারিবার ইচ্ছা মনসার নাই। কারণ চাঁদ মরিলে দেবীর পূজা প্রচার হয় না।

চাঁদ রাত্রির অন্ধকারে ঈষৎ বিদ্যুতের আলোকে সেই পদ্মফুলের স্তূপ দেখিয়া উহাকে আশ্রয় মনে করিয়া হাত বাড়াইলেন। কিন্তু পদ্মফুল স্পর্শ করিয়া তাঁহার মনে পড়িয়া গেল পদ্মাবতীর কথা। তিনি তখনই হাত সরাইয়া লইলেন। মনসার কৃপার ভিখারী তিনি নহেন—মনসার কৃপায় বাঁচিবার সাধ তাঁহার নাই।

যাহা হউক, চাঁদ বেণে বাঁচিলেন। কিছুকাল পরে চাঁদবেণের একটি পুত্রলাভ হইল, ছয় পুত্রের শোকে জর্জ্জরিত চাঁদ বেণে পুত্রলাভ করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া গেলেন। পুত্রের নাম রাখা হয় লক্ষীন্দর। লক্ষীন্দর শশিকলার মত বাড়িতে লাগিল। চাঁদ বেণের শোকজর্জ্জরিত প্রাণে আনন্দের বান ডাকিয়া গেল।

কিন্তু আনন্দের মধ্যে বিষাদের ছায়া দেখা দিল। দৈবজ্ঞ পুত্রের ভাগ্য গণনা করিয়া বলিল—বিবাহের রাত্রেই লক্ষীন্দর সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এবারেও চাঁদ বেণের সম্মুখে কঠিন পরীক্ষা। এখনও তিনি একমুঠা ফুল সর্পদেবী মনসার উদ্দেশে ফেলিয়া দিলে লক্ষীন্দর আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু মনসার নিকট আত্মসমর্পণের কথা চাঁদসদাগর মনেও স্থান দেন না। সুতরাং তাঁহার আদেশে লৌহবাসর নির্ম্মিত হইল—লক্ষীন্দরের বিবাহবাসর সেই লৌহনির্ম্মিত গৃহে উদ্‌যাপিত হইবে।

চাঁদ সদাগর লৌহবাসর নির্ম্মাণ করাইয়া দেবীর চক্রান্ত ব্যর্থ করিবার আয়োজন করিলেন। 'হেঁতালের লাঠি' লইয়া তিনি নিজে সেই লৌহ-বাসরের দুয়ারে পাহারা রহিলেন। কিন্তু লৌহবাসরের গাত্রে দুইটি ছোট ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্রপথে মনসাদেবীর সর্প লৌহবাসরে প্রবেশ করিয়া লক্ষীন্দরকে দংশন করিল। লক্ষীন্দরের বিবাহশয্যা মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইল। লক্ষীন্দরের নবপরিণীতা পত্নী সতী লক্ষী বেহুলা বিবাহের রাত্রেই পতিহীনা হইল।

কিন্তু বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ ছাড়িল না। স্বামী বিবাহের রাত্রে তাহার নিকট আলিঙ্গন চাহিয়াছিল। ব্রীড়াবনতা নববধূ লজ্জায় সে আলিঙ্গন দিতে স্বীকৃতা হয় নাই। এক্ষণে মৃত পতির কণ্ঠলগ্ন হইয়া সে ভেলায় ভাসিয়া চলিয়াছে। এইরূপে পতিকে ক্রোড়ে লইয়া সে দীর্ঘ ছয় মাস ভেলায়

করিয়া ভাসিয়াছে। শত প্রলোভনে অথবা শত নিষেধেও বেহুলা স্বামীকে পরিত্যাগ করে নাই। অবশেষে সতীত্বের ঐশ্বর্য্যে এবং নৃত্যগীতে স্বর্গের দেবতাদিগকে তুষ্ট করিয়া বেহুলা তাঁহার স্বামীর ও চাঁদ বেণের অন্যান্য পুত্রের জীবন ভিক্ষা করিয়া ফিরিল। ফিরিয়া আসিয়া বেহুলা তাহার শ্বশুর চাঁদ বেণেকে মনসার সহিত বাদ সাধিতে নিষেধ করিল-এবং মনসার উদ্দেশ্যে দুই মুঠা ফুল ফেলিয়া দিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিতে অনুরোধ করিল। চাঁদ বেণে এতদিন কাহারও কথায় মনসার পূজা করেন নাই। পুত্রশোকাতুরা পত্নী সনকার ক্রন্দনে, অথবা নিজে বারম্বার বিপদে পড়িয়াও তিনি মনসার নিকট নতিস্বীকারের চিন্তাও মনে স্থান দেন নাই। কিন্তু এখন পুত্রবধুর অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। পুত্রবধূর মুখ চাহিয়া, সতীর মর্য্যাদা রাখিবার জন্য তিনি মনসার মস্তকে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন; ইহা একদিকে যেমন মনসার পূজা—অপরদিকে সতী লক্ষ্মী পুত্রবধূর মস্তকে আশীর্ব্বাদ। এইরূপে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচলিত হইল।

মনসাদেবীর এই গীত সর্ব্বপ্রথমে কাণা হরি দত্ত নামে জনৈক কবি রচনা করেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল এ বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছে। তিনি তাঁহার মনসামঙ্গলে লিখিয়াছেন—

প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত।
মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য॥

কাণা হরি দত্তের রচিত মনসার গীতি উৎকৃষ্ট হয় নাই। দেবী ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই—সুতরাং তিনি বিজয় গুপ্তকে মনসামঙ্গল কাব্য রচনার জন্য স্বপ্নাদেশ দেন। সেই স্বপ্নাদেশ পাইয়া বিজয় গুপ্ত তাঁহার মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। একমাত্র বিজয় গুপ্তের উক্তি হইতে কাণা হরি দত্তের মনসামঙ্গল কাব্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। কাণা হরি দত্তের মনসামঙ্গল খুব সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ব যুগের রচনা।

বিজয় গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, কাণা হরি দত্তের গীত তাঁহার সময়ে একরূপ লুপ্ত হইয়াছিল।—

হরিদত্তের গীত যত লুপ্ত হইল কালে।

এবং এই গীতি লুপ্ত হইবার কারণও বিজয় গুপ্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

কথার সঙ্গতি নাই, নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥

একটিমাত্র পদ ছাড়া কাণা হরি দত্তের গীতির চিহ্ন অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। তিনি যখন তাঁহার গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করেন তখন—'সনাতন হুসেন শাহ নৃপতি তিলক' বাঙলার সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন।

বিজয় গুপ্ত তাঁহার পদ্মপুরাণে নিজেকে ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী বলিয়া পরিচয়দান করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের অন্যতম গুণ ব্যঙ্গরসের অবতারণা। কথায় কথায় তাঁহার রচনা ব্যঙ্গরসের প্রতি ধাবিত হইয়াছে। আধুনিক রুচি অনুযায়ী বিজয় গুপ্তের রসিকতা যথেষ্ট বাঞ্ছিত না হইলেও তাহাকে নিতান্ত ভাঁড়ামি বলা যাইবে না। তাঁহার কাব্যে বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে—ইহা সামাজিক ও রাজনৈতিক তথ্যের খনি।

অতঃপর মনসামঙ্গল রচয়িতাদিগের মধ্যে বিপ্রদাস, নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশীদাস বা বংশীবদন, কেতকাদাস, ক্ষমানন্দ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিজয় গুপ্তের কাব্য রচনার এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্রদাস তাঁহার মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। বিপ্রদাসের নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণার উত্তর-পূর্ব্বাংশে বসিরহাট মহকুমায় নাদুড়্যা-বটগ্রামে। কবির পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। বিপ্রদাসও বিজয় গুপ্তের মত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তাঁহার কাব্য রচনা করেন। সেকালে স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনা করা একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মধ্যযুগের অধিকাংশ কবি—বিশেষতঃ মঙ্গল-কাব্যরচয়িতাগণ স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বিপ্রদাসের কাব্যে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য নিহিত আছে। কাব্য হিসাবে ইহা উৎকর্ষ লাভ করে নাই সত্য, তবে সামাজিক ও সমসাময়িক ইতিহাস যেটুকু ইহাতে রহিয়াছে, তাহা অমূল্য।

সম্ভবতঃ বিজয় গুপ্তের সমকালে নারায়ণদেব তাঁহার মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। অন্ততঃপক্ষে তাঁহার কাব্য যে ষোড়শ শতকে রচিত, একথা নিশ্চিত। ইঁহার রচনায় সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় নাই, অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, কিন্তু স্বাভাবিকতা আছে। সেইজন্য নারায়ণ দেবের রচনা বড় করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। তাঁহার কাব্যে চাঁদ সদাগরের পুরুষকারের দৃষ্টান্ত এবং বেহুলার করুণ কাহিনী আমাদের হৃদয়কে আপ্লুত করে।

নারায়ণদেব ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার নিবাস ছিল বোর গ্রামে। কবির পূরা নাম রামনারায়ণ দেব, উপাধি সুকবিবল্লভ। নারায়ণ দেবের মনসাগীতির নাম 'পদ্মাপুরাণ'। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, পূর্ব্ববঙ্গে রচিত মনসামঙ্গল সাধারণত 'পদ্মাপুরাণ' নামেই অভিহিত। পশ্চিমবঙ্গে রচিত কাব্য সাধারণত 'মনসামঙ্গল' নামে আখ্যাত।

নারায়ণদেব শুধু 'পদ্মাপুরাণ' রচনা করেন নাই। তিনি কালিকাপুরাণ নামে একখানি কাব্যও রচনা করেন। এই কাব্যে হর-গৌরীর গৃহস্থালী-কথা এবং গৌরীর পিতৃগৃহে আসিয়া শরৎকালীন পূজা গ্রহণ কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে।

বংশীদাসের বা বংশীবদনের মনসামঙ্গলও ষোড়শ শতকে রচিত। ইহার রচনাকাল ১৫৭৫-৭৬ বলিয়া অনুমিত হয়। কবির নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমায় পাটবাড়ী বা পাতুয়ারী গ্রামে। কবি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন, মনসার পাঁচালী গান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। শুনা যায়, ইঁহার মনসার ভাসানের গান শুনিয়া দস্যুর হৃদয়ও করুণ রসে সিক্ত হইয়া যাইত। বংশীবদন সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু পাণ্ডিত্যের প্রভায় তাঁহার মনসামঙ্গল কাব্যের কোন অংশের স্বাভাবিকতাকে তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গে রচিত যাবতীয় মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কবির কন্যাও সুকবি ছিলেন। ইঁহার নাম চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী রচিত একখানি রামায়ণ কাব্য পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যসমূহের মধ্যে বংশীদাসের কাব্য যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যসমূহের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষমানন্দের কাব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই কাব্যখানি সপ্তদশ শতকে রচিত। কবির আসল নাম ক্ষমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ। কিন্তু ভণিতায় ইনি নিজেকে কেতকাদাস বা মনসার সেবক এই কথা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেতকাদাস দক্ষিণ রাঢ়ে বা দামোদরের দক্ষিণ বা পশ্চিমের কোন গ্রামে বাস করিতেন। ইনিও স্বপাদেশে দেবতার অনুগ্রহে কাব্যরচনা করিয়াছেন।

কেতকাদাসের মনসামঙ্গল কবিত্বমণ্ডিত। তাঁহার কাব্যে বেহুলার চরিত্রটি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমরা কেবল মনসামঙ্গলের প্রথিতযশা কবিদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছি। এই মনসার কাহিনী লইয়া বহু কবি কাব্য বা পাঁচালী রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। সকল কাব্যই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে সত্য। কিন্তু প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন বিশেষত্ব আছে, অনেক ক্ষেত্রে নূতনত্বও আছে। সমসাময়িক সামাজিক চিত্রও প্রত্যেকটি মনসামঙ্গল কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। একথা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত হইতে সমর্থিত হইয়াছে। চৈতন্যভাগবতে আছে—

ধর্ম্ম কর্ম্মে লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের পূর্ব্বেও এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, একথা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু সেগুলি হয়ত তখন ব্রতকথা অথবা পাঁচালীর আকারে প্রচলিত ছিল। এই ব্রতকথা এবং পাঁচালীগুলিই ক্রমশঃ বৃহৎ চণ্ডী-মঙ্গল কাব্যে পরিণত হইয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে সেগুলির কোনটিই পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের পূর্ব্বে রচিত নহে।

চণ্ডীর মহিমা কীর্ত্তন করা এবং তাঁহার পূজা প্রচারই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূলকথা। এই কাহিনী সংস্কৃত কোন পুরাণ প্রভৃতিতে নাই। মনসামঙ্গলের কাহিনীর মত ইহাও লৌকিক উপাখ্যান।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রাক্কালে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যেরূপ জনপ্রিয়তা ছিল, পরচৈতন্য যুগেও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয়তা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। চণ্ডীর পূজা যে সে যুগে অত জনপ্রিয় হইয়াছিল—সকলেই চণ্ডীকে জাগ্রত মঙ্গলকারী দেবতা বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহার কারণ—সকলেই দেখিয়াছিল যে, চণ্ডীর উপাখ্যানে অভাজনও অকস্মাৎ ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াছে, বিপন্ন উদ্ধার পাইয়াছে, দেবীর কৃপায় তাঁহার পূজক ভক্তদিগের অবস্থা ভাল হইয়াছে।

বহু কবিই এই চণ্ডীর উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া, চণ্ডীর মহিমা প্রচার করিয়া কাব্যরচনা করিয়া বঙ্গবাণীর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। যেমন দ্বিজ জনার্দ্দন, মুক্তারাম সেন, দেবীদাস সেন, শিবনারায়ণ সেন, কীর্ত্তিচন্দ্র দাস, মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখ্যায়িকা সর্বপ্রথম কোন্ কবির কল্পনা হইতে প্রসূত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তিনি তাঁহার পূর্ব্বজ কবিগণের বন্দনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

মাণিক দত্তেরে আমি করিনু বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত-পথ-পরিচয়॥

ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, মাণিক দত্ত নামক কোনো কবি হয়ত বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কাব্য রচনা করেন এবং মুকুন্দরাম উক্ত কবির কল্পনার সূত্র ধরিয়া তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানি রচনা করেন। মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া যায় নাই। কেবলমাত্র মুকুন্দরামের কাব্যেই উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের পূর্ব্বে আরও কয়েকজন কবি চণ্ডীর উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাব্য পাওয়া গিয়াছে।

মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতাদিগের মধ্যে মাধবাচার্য্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতাগণের মধ্যে মুকুন্দরাম সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী কবি হইলেও চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্গত কতকগুলি চরিত্রচিত্রণে মুকুন্দরাম অপেক্ষা মাধবাচার্য্যের অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। তবে সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে মুকুন্দরামের কাব্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বর্ণনার মনোহারিত্বে, চরিত্রচিত্রণের নিপুণতায় মুকুন্দরামের কাব্যখানি বঙ্গসাহিত্যে সবিশেষ খ্যাতি ও প্রচার লাভ করিয়াছে।

মুকুন্দরামের আবির্ভাবকাল ষোড়শ শতক। সঠিকভাবে তাঁহার জন্মকাল জানা যায় নাই এবং তাঁহার প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধও দেখা যায়। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ১৫৪৪-১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

হুগলী জেলার আরামবাগ সাবডিভিসনের পশ্চিমে বর্দ্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পরগণায় দামুন্যা নামক গ্রামে, রত্নাম্বু নদীর তীরে মুকুন্দরামের পৈত্রিক নিবাস ছিল। ঐ স্থানেই তাঁহার জন্ম হয়। মুকুন্দরাম অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন এবং প্রায় সাত পুরুষ ধরিয়া ইঁহার পিতা পিতামহ দামুন্যায় বসবাস করিতেছিলেন। ইঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র। মুকুন্দরামের পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। মিশ্র ইহাদের নবাবদত্ত উপাধি, ইহারা রাঢ়ী শ্রেণীর চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ। মামুদ সরিপ নামক এক মুসলমান ডিহিদারের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া মুকুন্দরাম সপরিবারে তাঁহার জন্মভূমি দামুন্যা পরিত্যাগ করেন। মুকুন্দরাম দরিদ্র ছিলেন। দারিদ্র্যহেতু এই সময়ে তাঁহাকে দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, অবশেষে তিনি মেদিনীপুরের উত্তরাংশে আড়রা নামক গ্রামে গিয়া তথাকার সদাশয় জমিদার বাঁকুড়া রায়ের রাজসভায় পৌঁছিলেন। বাঁকুড়া রায় জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর করিতেন। তিনি মুকুন্দরামের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া কবিকে আশ্রয় দান করিলেন, ধনদৌলত দিলেন, তাঁহাকে নিজের পুত্র রঘুনাথের শিক্ষাগুরুপদে নিযুক্ত করিলেন। এই রাজা রঘুনাথের আদেশেই মুকুন্দরাম তাঁহার বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কিন্তু সে যুগে স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করার প্রথা ছিল। মুকুন্দরামও সেই প্রথা অনুযায়ী বলিয়াছেন যে, তিনি দেবীর আদেশেই কাব্য রচনা করিয়াছেন—

শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ,
এই গীত হৈল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিল্যা আচম্বিতে॥

অন্যত্র—

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।

তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

* * * *

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানি রচনার পর রাজা রঘুনাথ সম্ভবতঃ মুকুন্দরামকে কবিকঙ্কণ উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

মুকুন্দরাম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা বেশ উত্তমই জানিতেন। ইহার পরিচয় তাঁহার কাব্যে বর্ত্তমান। সংস্কৃত পুরাণোক্ত কাহিনী, সংস্কৃত আভিধানিক শব্দ এবং আরবী ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রহিয়াছে। কাব্যের প্রারম্ভেই তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্যের কবিদিগকে তাঁহার প্রণতি জানাইয়াছেন।—

আদ্যকবি বাল্মীকিরে করিল প্রণতি।
পরাশর শুক ব্যাস বন্দ বৃহস্পতি ॥
জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দ কালিদাস।
কর জোড়ে বন্দিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

উল্লিখিত প্রাচীন কবিদিগের কাব্যের সহিত মুকুন্দরাম উত্তমরূপে পরিচিত ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। মুকুন্দরাম কেবল পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি সঙ্গীতবিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাই কবি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি "সঙ্গীতবিদ্যায় রত সঙ্গীত অভিলাষী।"

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হইতে কবির জীবনী সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত তথ্য ভিন্ন, তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে।

কবি চণ্ডীর আদেশে চণ্ডীর বন্দনাগীতি গাহিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে শাক্ত ছিলেন, একথা অনুমান করাই স্বাভাবিক। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যস্থিত উক্তির দ্বারাই ইহা সমর্থিত হইয়াছে যে, তিনি শক্তির উপাসক ছিলেন না—তিনি শাক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। এ সম্বন্ধে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হইতেই অনেক সমর্থনসূচক প্রমাণ পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলের প্রথমেই কবি গণেশ-বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু গণেশ-বন্দনা সমাপন করিয়া কবি 'গোবিন্দ-ভকতি' মাগিয়াছেন। ইহার দ্বারা গোবিন্দের প্রতি তাঁহার যে ভক্তি, তাহাই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। কবি হরি, হর ও চণ্ডী এই তিন দেবদেবীর মধ্যে হরিকেই অগ্রগণ্য মনে করিতেন। তাই তাঁহার কাব্যের প্রধান চরিত্র কালকেতু ব্যাধ নগর-পত্তন করিতে গিয়া

বলিয়াছে—'আরাধনে হরি হর তুমি তিনজন।' কালকেতু যে নগর নির্ম্মাণ করিল, কবি ঐ নগরের তুলনা করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারাবতীর সহিত এবং বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যার সহিত। কালকেতুর নবনির্ম্মিত নগরের নাম হইল 'গুজরাট'। সেখানে বহু বৈষ্ণব আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সর্ব্বদা তাহাদের মুখে কৃষ্ণনাম। কলিঙ্গদেশের কোটাল কালকেতুর গুজরাট নগর দেখিয়া গিয়া রাজার নিকট বলিয়াছিল—

দেখিলাম গুজরাট প্রতি বাড়ী গীতনাট
যেন অভিনব দ্বারাবতী।
অযোধ্যা মথুরা মায়া নাহি ধরে তার ছায়া,
যেন দেখি ইন্দ্রের বসতি ॥

আর—

প্রতি বাড়ী দেবস্থল বৈষ্ণবের অন্নজল,
দুই সন্ধ্যা হরি-সঙ্কীর্ত্তন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নায়ক কালকেতু ব্যাধ চণ্ডীর উপাসক ছিল। চণ্ডীর প্রসাদে সে অতুল যশ এবং ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিল। সেই কালকেতু-নির্ম্মিত নগরে বৈষ্ণবগণ আসিয়া বাস করিল, ঘরে ঘরে বিষ্ণুর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া সকলেই সকাল-সন্ধ্যায় হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল, ইহা কবির বৈষ্ণব পক্ষ-পাতিত্ব ভিন্ন আর কি? মুকুন্দরাম যদি শাক্ত হইতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই এইরূপে চণ্ডীর উপাসক কালকেতুর নগরে বৈষ্ণবদিগের প্রাধান্য ঘটিতে দিতেন না। ইহা ভিন্ন, একটি প্রমাণের দ্বারা কবি তাঁহার বৈষ্ণবত্বের চরম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার কাব্যে 'আকাশ' শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত অভিধানিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন 'বিষ্ণুপাদ' এবং আকাশে চণ্ডীর আবির্ভাব বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

আজি বিষ্ণুপদতলে উরিলা ভবানী।

চণ্ডীর মহিমাকীর্ত্তন করিতে গিয়া কবি চণ্ডীকে বিষ্ণুপদতলে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না। কবি এইরূপে তাঁহার ইষ্টদেবতা বিষ্ণুকে চণ্ডী অপেক্ষা প্রাধান্য দিয়া তবে ছাড়িয়াছেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ভিন্ন মুকুন্দরাম আরও কয়েকখানি কাব্য রচনা করেন। তাঁহার অন্যান্য রচনা—শিবকীর্ত্তন ও জগন্নাথমঙ্গল। দামুন্যায় থাকিতে তিনি শিবকীর্ত্তন রচনা করেন। জগন্নাথমঙ্গলও কবির প্রথম বয়সের রচনা, কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্য মুকুন্দরামের পরিণত বয়সের রচনা। তাই এই কাব্যে আমরা কবির পরিণত-প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি। এই কাব্যখানির উপরেই বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অমরত্বের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ, কবি এই কাব্যে চরিত্রচিত্রণ ও করুণ-রস বর্ণনায় অসামান্য দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই কাব্যের চরিত্রগুলি বাস্তব হইয়া উঠায় কাব্যখানি অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। নিছক কল্পনার দ্বারা কবি কোথাও চরিত্রগুলিকে রঞ্জিত করিয়া তুলেন নাই।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে দুইটি উপাখ্যান আছে—কালকেতুর উপাখ্যান এবং শ্রীমন্তের উপাখ্যান। কালকেতুর গল্পে দেখিতে পাই যে, কবি কালকেতুর পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত দিয়া কাব্যের উপাখ্যান আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের রীতিই এই ছিল যে, কবিগণ নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত দিয়া কাব্য-রচনা আরম্ভ করিতেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও সেই নীতি অনুসৃত হইয়াছে—তিনি দেখাইয়াছেন যে, ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর কালকেতু ব্যাধরূপে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়া চণ্ডীর পূজা প্রচার করিল। কাহিনীটি এইরূপ—ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শিবপূজা করিতেন। একদিন তিনি পূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিয়াছেন, সেই পুষ্পের মধ্যে একটি কীট ছিল। ঐ ফুল শিবের মস্তকে অর্ঘ্যরূপে অর্পিত হইলে কীটটি মহাদেবকে দংশন করে। দংশনের জ্বালায় মহাদেব কাতর হইয়া নীলাম্বরকে শাপ দিলেন—'তুমি পৃথিবীতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর।' এই অভিশাপের ফলে নীলাম্বর মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিল। তাহার সহিত তাহার পত্নী ছায়াও সহমরণ করিয়া পৃথিবীতে আসিল। স্বর্গলোকের এই নীলাম্বর ও ছায়াই মর্ত্ত্যলোকে কালকেতু ও ফুল্লরা হইয়া আবির্ভূত হইল। নীলাম্বর কালকেতুরূপে ধর্ম্মকেতু ব্যাধের ঘরে জন্মিল, আর ফুল্লরা সঞ্জয়কেতু নামে এক ব্যাধের ঘরে জন্মিল। নীলাম্বর পৃথিবীতে কালকেতু হইয়া জন্মগ্রহণ না করিলে চণ্ডীর পূজা পৃথিবীতে প্রচার হয় না। তাই চণ্ডীর মায়াতে নীলাম্বরের পৃথিবীতে আবির্ভাব। চণ্ডীরই মায়াবশে নীলাম্বরের পূজার ফুলের মধ্যে কীটের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং উহা মহাদেবকে দংশন করিয়াছিল।

কালকেতু দেবতার অবতার। কিন্তু মুকুন্দরাম তাহাকে স্বাভাবিক মানুষরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। তাহার চরিত্রে দেবতার অলৌকিকত্ব ফুটাইয়া কবি তাহাকে অস্বাভাবিক করিয়া তুলেন নাই। সে ব্যাধের ছেলে। ব্যাধের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত, ঠিক তেমনি ভাবেই তাহার চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। তাহার কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য বা অস্বাভাবিকত্ব নাই। শৈশবে তাহার অসামান্য শক্তি ছিল—শৈশবাবধিই সে বীর এবং বলিষ্ঠ। সে বনের ভল্লুক আর বানর ধরিয়া খেলা করিত। শিশুদের দলের সে ছিল সর্দ্দার। তাহার গতি এত দ্রুত ছিল যে, সে তাড়িয়া শশারু ধরিত। উহারা দূরে গেলে কুকুর লেলাইয়া দিয়া উহাদিগকে শিকার করিত। পক্ষিগুলিকে সে বাঁটুল ছুঁড়িয়া বধ করিত। যৌবনে কালকেতুর বাল্যের অসামান্য তেজ কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। তখনও সে নিত্য বনে যাইয়া শিকার করিত। ব্যাঘ্রগুলিকে সে লেজ মোচড়াইয়া মারিত। কেবল সিংহকে সে বধ করিত না। কারণ সিংহ দুর্গার বাহন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ধনুকের বাড়ি দিয়া সিংহকে সে এমন শিক্ষা দিত যে, সেই প্রচণ্ড আঘাতের ফলে উহারা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া জলপান করিয়া তবে সুস্থ হইত। বীর কালকেতু সারাদিন বনে বনে শিকার করিয়া ফিরিত। সন্ধ্যায় সে মৃত পশুর ভার কাঁধে লইয়া গৃহে ফিরিত। গৃহে ফিরিয়া সে ভোজন করিত প্রচুর—অল্পে তাহার পেট ভরিত না। হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত, নেউল পোড়া, পুঁইশাক, কাঁকড়া প্রভৃতি খাইয়া তবে তাহার পেট ভরিত। যখন সে খাইতে বসিত, তখন সে গ্রাসগুলি তুলিত, 'যেন তে-আঁটিয়া তাল'।

কালকেতুর প্রকৃতি-বর্ণনায় কবি যেমন বাস্তবতা অবলম্বন করিয়াছেন, তেমনি তাহার রূপ বর্ণনা ও অঙ্গাভরণ বর্ণনায়ও কবি বাস্তবতা অবলম্বন করিয়াছেন; কোথাও এতটুকু অতিরঞ্জন করেন নাই। তাহার গলায় জালের কাঁঠি, হাতে লোহার শিকল, বুকে বাঘ নখ, গায়ে রাঙ্গা ধূলি, মাথার চুলগুলি জালের দড়ি দিয়া বাঁধা। তাহার 'দুই বাহু লোহার শাবল'।

এগার বৎসর বয়সে ফুল্লরার সহিত এই বীর কালকেতুর বিবাহ হইল। ফুল্লরা রূপবতী ছিল, স্বামীর প্রতি সে ছিল অতিশয় ভক্তিমতী। বন্য ব্যাধ-জীবনে অনেক দুঃখ ও দৈন্য সহ্য করিতে হয়। ফুল্লরা তাহার স্বামীর সহিত ঐ সকল দুঃখ ও দৈন্য হাসিমুখেই সহিত। দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও এই ব্যাধ-দম্পতি আনন্দে কালযাপন করিতেছিল। এমনি সময়ে কালকেতু একদিন

শিকারে বাহির হইল, কারণ সেদিন তাহাদের ঘরে আহার্য্য কিছু ছিল না। যাত্রার সময়ে সে অনেক শুভ-চিহ্ন দেখিয়া রওনা হইয়াছিল। দক্ষিণে গো ব্রাহ্মণ, বিকশিত পদ্ম, বামে শৃগাল ও পূর্ণঘট দেখিয়া সে যাত্রা করিয়াছিল। চারিদিক হইতে তাহার কর্ণে মঙ্গলধ্বনি আসিয়া পৌছিয়াছিল—গোয়ালিনী দধি হাঁকিয়া যাইতেছিল, সবৎসা গাভী তাহার সম্মুখ দিয়া গিয়াছিল, সে হরি হরি ধ্বনি শুনিয়াছিল। এই সকল মঙ্গলচিহ্ন দেখিয়া যাত্রা করার দরুণ বীরের মন আনন্দে ও আশায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ একটা সোনালি রঙের গোসাপ দেখিয়া কালকেতুর সকল আশা-আনন্দ দুর হইয়া গেল—তাহার রাগ হইল। গোসাপ যাত্রার পক্ষে শুভ-চিহ্ন নহে। তাই কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে ধনুকের গুণে বাঁধিয়া লইল এবং মনে মনে বলিল—"যদি অন্য শিকার মিলে, তবে ইহাকে মুক্তি দিব। নতুবা ইহাকে শিকপোড়া করিয়া খাইব"।

সত্যই সেদিন কালকেতু বনে বনে ঘুরিয়া কিছু পাইল না। দেখিল বনের সর্ব্বত্র ঘন কুয়াশায় ঢাকা, কোন পশুপক্ষী দেখা যায় না। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া কালকেতু দিনের শেষে ঐ গোসাপটিকে লইয়া গৃহে ফিরিল।

সেদিন কালকেতু যে ঐ অমঙ্গল-চিহ্ন দেখিয়াছিল, সেদিন যে কুয়াসার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সে যে কোনও শিকার পায় নাই—ঐ-সকলই দেবী চণ্ডীর মায়াবলে ঘটিয়াছিল। বনের পশুগণ কালকেতুর হাতে নির্য্যাতন সহ্য করিয়া চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হইয়াছিল। তিনি পশুদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া উহাদিগকে অভয় দিয়াছিলেন,—'কালকেতু আর তোমাদের কিছু করিতে পারিবে না'। এই আশ্বাসবাণীর ফলে কালকেতুকে সেদিন ব্যর্থ হইয়া গৃহে ফিরিতে হইয়াছিল।

ফুল্লরা খালি হাতে কালকেতুকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। কারণ ঘরে একটি ক্ষুদও নাই যে, তাহারা সেদিন উহা আহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে। অবশেষে কালকেতু বলিল, "এই গোসাপটার ছাল ছাড়াইয়া ইহাকে পোড়াইও, আর প্রতিবেশীর গৃহ হইতে কিছু ক্ষুদ ধার করিয়া আন"। ফুল্লরা তাহার প্রতিবেশীদের কাছ হইতে কিছু ক্ষুদ ধার করিয়া গৃহে ফিরিল।

গৃহে ফিরিয়া সে দেখিল যে, সেই গোসাপ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—এক পরমা সুন্দরী যুবতী। তাঁহার রূপের

আভায় কুঁড়ে ঘরখানি যেন ঝলমল করিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া ফুল্লরা অতীব বিস্মিতা হইয়া সেই সুন্দরীকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে যুবতীটি বলিলেন যে তিনি তাঁহার সতিনীর সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়াছেন এবং ব্যাধ-কুটীরে ফুল্লরার নিকটেই তিনি বাস করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যুবতীর কথা শুনিয়া ফুল্লরার ত চক্ষুস্থির! যুবতীটিকে সে অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, স্বামীর ঘর ছাড়িয়া স্ত্রীলোকের পরগৃহে থাকা উচিত নহে। ইহাতে অপযশ হয়। কিন্তু ফুল্লরার সকল নীতিবাক্য—তাহার অনুনয়-বিনয় সব ব্যর্থ হইল। ঐ সুন্দরী যুবতীটি ফুল্লরার কথা শুনিয়া সেখান হইতে নড়িবার নাম পর্য্যন্ত করিলেন না। তখন ফুল্লরা তাহাদের দারুণ দারিদ্র্য-দুঃখের কথা বলিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। বলিল, বৎসরের বারোমাসই তাহারা দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করে, বৎসরে কোন মাসেই তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া অতিবাহিত করে না! তাহাদের কুঁড়ে ঘরখানি ভাঙা, তালপাতার ছাউনি, প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসের ঝড়ে ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। জ্যৈষ্ঠে শিকারের মাংস প্রায়ই চিলে লইয়া যায়, ফলে বঁইচির ফল খাইয়া উপবাস করি। শ্রাবণে কত শত জোঁক আমাদের দংশন করে, বৃষ্টির জলে চারিদিকে বন্যা হয়, সেই বন্যার জল ঠেলিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাংসের পসরা লইয়া আমাকে বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করিতে যাইতে হয়। আশ্বিনে আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে দেশ ছাইয়া যায়, কিন্তু আমার উদরের চিন্তা ঘোচে না। কারণ, আশ্বিন মাসে কেহ মাংসের পসরা কেনে না; দেবীর প্রসাদী-মাংস সকলেই তখন খাইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে হরিণের ছাল পরিয়া থাকিতে হয়। মাঘ মাসে শাক খাইব, তাহারও উপায় নাই। কারণ তখন শাক তোলা নিষেধ। ফাল্গুনেও এইরূপ খাদ্যাভাব। অতএব বারো মাসই আমাদের অভাব—বারো মাসই আমাদের কষ্ট।

প্রাচীন কাব্যে বারোমাসের সুখদুঃখের এইরূপ বর্ণনা দেওয়া কবিদের একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বারো মাসের এই সুখদুঃখ বর্ণনার নাম 'বারমাস্যা'। মুকুন্দরাম সেই প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করিয়া ফুল্লরার বারমাস্যার বর্ণনা করিয়াছেন।

কাঙ্গালিনী ফুল্লরার কাতরতা কবি অতিশয় দক্ষতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। সরলা ফুল্লরার এই কাতরোক্তি তাহার চরিত্রটিকে বড় মধুর

করিয়া তুলিয়াছে। ফুল্লরার এত কাতর অনুনয়-বিনয় শুনিয়াও যুবতীটি কিছুমাত্র বিচলিতা হইলেন না। তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প তিনি ব্যাধ-কুটীরেই থাকিবেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার প্রচুর ধনরত্ন আছে। তিনি কালকেতু ও ফুল্লরার দারিদ্র্য মোচন করিবেন।

বেগতিক দেখিয়া ফুল্লরা ছুটিল তাহার স্বামীর কাছে এবং তাহার নিকট সকল ব্যাপার বর্ণনা করিল। কালকেতু ফুল্লরার কথায় বিশ্বাস করিল না। সে ফুল্লরার সহিত ঘরে ঢুকিল তাহার সন্দেহভঞ্জন করিবার নিমিত্ত। ঘরে ঢুকিয়া সে দেখিল—

ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরখানা করে ঝলমল।
কোটি চন্দ্র বিরাজিত বদনমণ্ডল॥

বিস্মিত হইয়া কালকেতু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"দরিদ্র ব্যাধের গৃহে তুমি কে? তুমি এখানে বাস করিলে লোকনিন্দা হইবে। চল তোমায় গৃহে রাখিয়া আসি"। কালকেতুর নৈতিক উপদেশে ও অনুনয়েও কোন ফল হইল না। সেই যুবতী নিরুত্তর হইয়া ব্যাধের কুঁড়ে ঘরখানি আলো করিয়া তেমনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুতেই যখন কিছু হইল না তখন কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার ধনুতে বাণ জুড়িল, কিন্তু বাণ ছুঁড়িতে পারিল না। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময়ে সেই যুবতী মুখ খুলিলেন। বলিলেন যে, তিনি দেবী চণ্ডী! স্বর্ণগোধিকার রূপ ধারণ করিয়া তিনি কালকেতুর গৃহে আসিয়াছেন তাহাকে বর দিতে! এই কথা বলিয়া তিনি দশভুজা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কালকেতু ও ফুল্লরার সন্দেহভঞ্জন করিলেন। কালকেতু আর ফুল্লরা তখন দেবীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার বন্দনা করিল।

অতঃপর দেবী কালকেতুকে একটি সোনার অঙ্গুরীয় দান করিলেন এবং ঐ সঙ্গে দিলেন সাত ঘড়া ধন। এই সাত ঘড়া ধন কালকেতু আর ফুল্লরা বহিবে কেমন করিয়া! তাই কালকেতু দেবীকে অনুরোধ করিল—"মা এক ঘড়া ধন তুমি কাঁখে করিয়া বহিয়া দিয়া আমাদের সাহায্য কর"। এই অনুরোধটুকুর মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, কালকেতু কত সরল ছিল। দেবীকে সে বন্দনা করিয়াছে, আবার শিশুর মত সরলচিত্তে তাঁহার কাছে আবদার করিয়াছে। দেবী চণ্ডীও কালকেতুর শিশুসুলভ সরলতায় মুগ্ধ হইয়া তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং চণ্ডী যখন ধনের ঘড়া বহিয়া

দিতেছিলেন, তখনও আর একবারের জন্য কালকেতু চরিত্রের অকৃত্রিমতা প্রকাশ পাইয়াছিল। চণ্ডীকে ধীরে ধীরে ঘড়া বহিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া—

মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি
ধন ঘড়া লৈয়া পাছে পলায় পার্ব্বতী।

কালকেতু-চরিত্রের এমনিতর সরলতা ও স্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করিয়া দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন—"কালকেতু মূর্খ, দরিদ্র—তাহার মনে যে সমস্ত ভাব খেলা করিয়াছে, কবি তাহার কোনটিই গোপন করেন নাই—তাহার সরলতা, বর্ব্বরতা, মূর্খতা এবং চরিত্রবল এ সমস্তই ব্যাধ-নায়কের উপযোগী, অন্য কোন মানদণ্ডে তাহার তুলনা করিলে অন্যায় হইবে। মুকুন্দরামের বর্ণনায় এরূপ একটি সুন্দর অকৃত্রিমতার বিকাশ আছে, যাহা প্রথম শ্রেণীর কবি ভিন্ন অন্য কেহ দেখাইতে পারে না।"

চণ্ডীর নিকট হইতে ধনরত্ন পাইয়া কালকেতুর ভাগ্য ফিরিয়া গেল। চণ্ডীর আদেশে সে গুজরাটের বন কাটাইয়া নগর বসাইল। সেখানে সে রাজত্ব করিবে। কিন্তু এই সময়ে কলিঙ্গের রাজার সহিত তাহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত হয় এবং যে কালকেতু বীর নামে পরিচিত সে ফুল্লরার পরামর্শে ভয়ে 'ধান্য ঘরে' লুকাইয়াছিল।

ফুল্লরার কথা শুনি' হিতাহিত মনে গণি'
লুকাইল বীর ধান্য ঘরে।

এইখানে কালকেতুর বীরত্বের মহিমা কবি খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। মুকুন্দ-রামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ইহাই একমাত্র দোষ। মুকুন্দরামের অঙ্কিত ব্যাধ কালকেতু, রাজা কালকেতু অপেক্ষা অনেক উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত—ব্যাধ কালকেতুর বীরত্ব, দৃঢ়তা, সরলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি, রাজা কালকেতুর চেয়ে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কারণ, আমরা দেখি যে, পরাজিত কালকেতু নির্ভীক নহে—সে ভয়ে ধান্য ঘরে লুকাইয়াছে। সে স্বচেষ্টায় বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া রাজ্য উদ্ধার করিতে পারে নাই। কলিঙ্গাধিপতিকে চণ্ডী স্বপ্নাদেশ দেন যে—কালকেতু আমার সেবক। তাহাকে তুমি রাজপদ ছাড়িয়া দাও। এই আদেশের ফলে কালকেতু তাহার গুজরাট নগরের সিংহাসন ফিরাইয়া পাইল।

ইহার পর একদিন কালকেতু ও ফুল্লরার শাপান্ত হইল। তাহারা স্বর্গে চলিয়া গেল। জগতে চণ্ডীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইল—কারণ সকলে এই উপাখ্যানের ভিতর দিয়া দেখিল যে, চণ্ডীর কৃপালাভ করিলে নিদারুণ দারিদ্র্যদশা হইতে মুক্ত হইয়া অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব, বিপদ হইতে মুক্ত হওয়াও সম্ভব।

চণ্ডীমঙ্গলের অপর উপাখ্যান শ্রীমন্তের উপাখ্যান বা ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। এই গল্পে দেখিতে পাই যে, গন্ধবণিক সওদাগরগণ প্রথমে শিবোপাসক ছিল। কিন্তু যতদিন তাহারা শিবের উপাসনা করিয়াছে ততদিন তাহারা নানা দুর্গতিতে পতিত হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে। কিন্তু চণ্ডীকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সকল দুর্গতি হইতে মুক্ত হইয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে।

গল্পটি এই—স্বর্গের অপ্সরা রত্নমালা দেব-সভায় নৃত্য করিতেন। নৃত্যকলায় তাঁহার সবিশেষ খ্যাতি ছিল। একবার নাচিতে নাচিতে তাঁহার তালভঙ্গ হয়। ঐ দোষে তিনি অভিশপ্তা হইয়া পৃথিবীতে মনুষ্য জন্ম ধারণ করেন। ইছানী নগরে লক্ষপতি বণিকের গৃহে তাঁহার জন্ম হয় এবং তাঁহার নাম হয় খুল্লনা। এই খুল্লনা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে ইঁহার সহিত উজানীপুরের ধনপতি সাধু নামে এক বণিকের সহিত বিবাহ হইল। ধনপতি সওদাগরের আর একটি পত্নী ছিল। তাহার নাম লহনা। খুল্লনার সহিত ধনপতি সদাগরের বিবাহ হওয়াতে লহনা অবশ্য প্রথমে অত্যন্ত অভিমান করিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাহার অভিমান দূর হইয়াছিল। তখন সে তাহার সপত্নীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া মনের সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। এমনি সময়ে রাজার আদেশে ধনপতি সদাগরকে বাণিজ্যের জন্য বিদেশে যাইতে হইল। তখন খুল্লনা লহনার নিকট রহিল। লহনা খুল্লনাকে খুবই আদর-যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু লহনার বুদ্ধিটি ছিল কিছু স্থূল। অতি সহজেই সে অপরের প্ররোচনায় ভুলিয়া নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম করিতেও দ্বিধা বোধ করিত না। গৃহের দাসী দুর্ব্বলা লহনার প্রকৃতিটি বেশ ভাল করিয়াই জানিত। তাই সে যখন দেখিল যে, দুই সতীনে খুব ভাব, আর সেই সদ্ভাবের ফলে দাসদাসীদের নানান্ অসুবিধা, তখন সে নিয়ত নির্জ্জনে লহনাকে কুপরামর্শ দিয়া দিয়া খুল্লনার প্রতি তাহার মনটিকে বিরূপ করিয়া তুলিল। দুর্ব্বলার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া লহনা একখানি জাল-পত্র প্রস্তুত করিল। পত্রখানি ধনপতি

সদাগর কর্ত্তৃক খুল্লনাকে লিখিত। পত্রখানির মর্ম্ম এই—তুমি অদ্য হইতে ছাগল চরাইবে, ঢেঁকিশালে শুইয়া থাকিবে, একবেলা আধপেটা খাইবে আর 'খুঁয়া' বস্ত্র পরিবে।

খুল্লনা লহনার মত স্থূলবুদ্ধি ছিল না। তাহার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। সে বুঝিল যে, ঐ পত্র জাল। তাহার পতিভক্তিও ছিল গভীর। তাই সে ঐ পত্রটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লহনারই জয় হইল, আর সে জয় তাহার শারীরিক বলের প্রভাবে, যুক্তির প্রভাবে নহে।

তখন বাধ্য হইয়া খুল্লনাকে ছাগল চরাইতে হইল। তখন হইতে সে ঢেঁকিশালে শুইতে লাগিল, খুঁয়ার বসন পরিতে লাগিল। একমাত্র লোহা ছাড়া তাহাকে অন্য সব অলঙ্কার ত্যাগ করিতে হইল। নিরাভরণা খুল্লনা বড় দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিল। তাহার খাদ্য হইল পুরান খুদ, আলুনি তরকারি, লাউ কুমড়ার খোসা। এইভাবে খুল্লনার দুঃখে দিন যায়।

একদিন ছাগল চরাইয়া ফিরিবার সময় সে দেখিল যে, তাহার একটি ছাগল হারাইয়াছে। খুল্লনা ভয়ে অধীর হইল। লহনার শাস্তির ভয়ে সে বনের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছাগল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন সময়ে পাঁচটি কন্যার সহিত খুল্লনার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা উহাকে উপদেশ দিল—চণ্ডীপূজা কর, তোমার দুঃখের অবসান হইবে। খুল্লনা তখন চণ্ডীপূজা করিল। চণ্ডী প্রসন্না হইয়া খুল্লনাকে বর দিলেন, তাহার ছাগল পাওয়া গেল। প্রভাতে যখন খুল্লনা বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। লহনা তাহাকে সাদরে আহ্বান করিল, পূর্ব্বের মত আদর-যত্ন করিতে লাগিল, প্রাণ খুলিয়া তাহাকে ভালবাসিল। চণ্ডীর মায়াবলে লহনার এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। চণ্ডীর আদেশে লহনা খুল্লনাকে পুনরায় ভালবাসিয়াছিল। চণ্ডী ধনপতি সদাগরকে স্বপ্ন দিয়াছিলেন। তিনিও সত্বর গৃহে ফিরিলেন। ধনপতি সদাগরকে ফিরিয়া পাইয়া, সপত্নীর স্নেহ ভালবাসা লাভ করিয়া খুল্লনার দুঃখের অবসান হইল। কিন্তু তাহার অদৃষ্টে এ সুখ বেশীদিন স্থায়ী হইল না।

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি তাঁহার সমস্ত আত্মীয়-কুটুম্বকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন। ধনপতি সদাগরের আত্মীয়-কুটুম্বগণ সেই শ্রাদ্ধবাসরে আগমন করিয়া মহা গোলমাল আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—ধনপতির অবর্ত্তমানে খুল্লনা বনে বনে ছাগল চরাইত। যতদিন

সে ছাগল চরাইয়াছে, ততদিন সে কি ভাবে ছিল কে জানে। খুল্লনা তাহার সতীত্বের পরীক্ষা দান করুন, অথবা ধনপতি আমাদিগকে এক লক্ষ টাকা প্রদান করুক। নতুবা আমরা কেহ ধনপতির গৃহে আহার করিব না।

আত্মীয়-স্বজনের মুখে এই উক্তি শুনিয়া ধনপতি প্রথমে লহনাকে ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন, "কেন তুমি ছাগল চরাইতে খুল্লনাকে বনে পাঠাইয়াছিলে"? পরে কিঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া খুল্লনাকে বলিলেন—"আমি এক লক্ষ টাকা দিব, তোমায় পরীক্ষা দিতে হইবে না"। কিন্তু খুল্লনা সতী দৃঢ়চিত্তে তাহার স্বামীর এই প্রস্তাবে বাধা দিয়া বলিল—"আমি পরীক্ষা দিব। টাকা দিয়া কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া আমি জীবিত থাকিতে চাই না"।

আর— পরীক্ষা করিতে নাথ কর যদি আন।
গরল ভখিয়া আমি ত্যজিব পরাণ।

এই উক্তিটুকুর মধ্য দিয়া খুল্লনা-চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে—তাহার চরিত্র সতীত্বের উজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক, খুল্লনার দৃঢ়তা দেখিয়া অগত্যা ধনপতি সদাগর তাহাকে পরীক্ষা দিবার জন্য সভায় আনয়ন করিলেন। একে একে কতকগুলি কঠিন পরীক্ষা খুল্লনাকে দিতে হইল। তাহাকে জলে ডুবাইতে চেষ্টা করা হইল, সর্প দ্বারা দংশন করাইবার চেষ্টা করা হইল, কিন্তু খুল্লনার কিছু হইল না। চণ্ডীকে স্মরণ করিয়া প্রজ্জলিত লাল টক্‌টকে লোহার শাবল খুল্লনা হাতে করিয়া তুলিয়া লইল, জতুগৃহে খুল্লনাকে রাখিয়া সেই গৃহে আগুন দেওয়া হইল। আগুনের শিখা আকাশ ছুঁইল, কিন্তু খুল্লনার কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল না। সে অক্ষত শরীরে অগ্নি হইতে বাহির হইয়া আসিল। সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল—খুল্লনাকে ভক্তিভরে সকলে প্রণাম করিল। এ সকলই ঘটিল চণ্ডীর কৃপায়।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রাজবাড়ীতে চন্দন ফুরাইল। রাজার আজ্ঞায় ধনপতি সদাগরকে সিংহলে যাইতে হইল। ধনপতি সাতটি ডিঙ্গা বোঝাই করিয়া প্রবাস-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। খুল্লনা তাহার পতির শুভকামনায় চণ্ডীপূজা করিতে বসিয়াছিল। লহনা গিয়া ধনপতিকে এই সংবাদ দিল। শিবোপাসক ধনপতি সদাগর সংবাদ শুনিয়া খুল্লনার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন

এবং চণ্ডীকে 'ডাকিনী দেবতা' বলিয়া তাঁহার ঘটে লাথি মারিলেন। তিনি শিব ভিন্ন আর কোন দেবতাকে ভক্তি করিতেন না।

চণ্ডীকে অপমানিত করার দরুণ ধনপতির প্রতি চণ্ডী রুষ্টা হইলেন এবং ধনপতি যখন বাণিজ্যের সপ্ত ডিঙ্গা লইয়া অকূল সমুদ্রে গিয়া পৌছিলেন, তখন চণ্ডী তাঁহাকে বিপদে ফেলিলেন। চণ্ডীর মায়ায় সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠিল, সেই ঝড়ে একে একে ধনপতির ছয় ডিঙ্গা ডুবিল। মাত্র একটি ডিঙ্গি লইয়া সদাগর সিংহল অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি শ্রীক্ষেত্র ও সেতুবন্ধ দেখিয়া কালীদহে পৌছিলেন এবং তখন--

পদ্মাবতী সনে চণ্ডী করিয়া যুকতি।
কালীদহে মায়া পাতিলেন ভগবতী॥

এই মায়াবলে ধনপতি সদাগর কালীদহে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন অনন্ত জলরাশির উপর এক মনোরম পদ্মবন, সেখানে বিভিন্ন রঙের পদ্ম ফুটিয়া আছে—সারস-সারসী, ডাহুক-ডাহুকী, খঞ্জন-খঞ্জনী, চক্রবাক-চক্রবাকী, রাজহংস-রাজহংসী সেই কমলবনে কেলি করিতেছে। আর একটি কমলের উপর এক পরমাসুন্দরী রমণী-মূর্ত্তি বসিয়া চতুর্দ্দিক তাঁহার রূপের প্রভায় আলোকিত করিয়াছেন এবং ঐ রূপবতী বাম হস্তে গজরাজকে তুলিয়া ধরিয়া গিলিতেছেন। ধনপতি সদাগর মুগ্ধ বিস্ময়ে স্থির হইয়া এই দৃশ্য দেখিলেন। সদাগর ভিন্ন অপর কেহই কিন্তু এই কমলে-কামিনীর দৃশ্য দেখে নাই।

যাহা হউক, এই দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে ধনপতি সদাগর সিংহলে পৌছিলেন। সেখানে পৌছিয়া তিনি সিংহলরাজের নিকট হইতে সবিশেষ আদর-যত্ন পাইলেন এবং রাজসভায় তিনি কমলে-কামিনীর কথা বলিলেন। কিন্তু তাঁহার এই বিবরণে কেহই বিশ্বাস করিল না। কথায় কথায় শেষে রাজা ও ধনপতির মধ্যে অঙ্গীকার-পত্রের বিনিময় হইল। ঐ কমলবনের দৃশ্য রাজাকে দেখাইতে পারিলে রাজা ধনপতিকে তাঁহার অর্দ্ধেক রাজত্ব দিবেন; আর না দেখাইতে পারিলে ধনপতি সদাগরকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। অতঃপর ধনপতি রাজাকে লইয়া কালীদহে গেলেন। কিন্তু সেখানে আর কমলে-কামিনী দেখা গেল না। রাজা ধনপতি সদাগরকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। চণ্ডীর রোষ উৎপাদন করিয়া তিনি তাঁহার লোক-লস্কর, ধন-সম্পত্তি সব হারাইলেন এবং নিজে বন্দী হইলেন। কারাগারে একদিন চণ্ডী ধনপতি

সদাগরকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন—আমার পূজা কর। তাহা হইলে তোমার এ দুর্গতি দূর হইবে। কিন্তু ধনপতি কারাগারে পচিয়া মরিলেও শিব ভিন্ন আর কাহারও উপাসনা করিবেন না। তাই তিনি বলিলেন—

যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি॥

ধনপতি সদাগরের শিব-ভক্তি কিরূপ ঐকান্তিক ছিল, তাহা এই উক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। দারুণ বিপদের মধ্যেও শিবের প্রতি তাঁহার ভক্তি এতটুকু হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। দুঃখ হইতে উদ্ধার পাওয়ার ভরসা পাইয়াও তিনি চণ্ডীর উপাসনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই।

ধনপতি সদাগর বন্দী হইয়া রহিলেন। ওদিকে গৃহে খুল্লনার এক পুত্র জন্মিল। এই পুত্রের নাম হইল শ্রীমন্ত। ইনি শাপভ্রষ্ট মালাধর নামক গন্ধর্ব্ব। স্বর্গে দেবসভায় নৃত্য হইতেছিল, দেবগণ মুগ্ধ হইয়া ঐ নৃত্য দেখিতেছিলেন। নৃত্য অবসানে দেবগণ তুষ্ট হইয়া মালাধরকে নানাবিধ অলঙ্কার দান করিয়া অলঙ্কৃত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু শিব তাঁহাকে দিলেন হাড়ের মালা. হাড়ের মালা দেখিয়া মালাধর হাসিয়াছিলেন। শিব ইহাতে রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন—পৃথিবীতে গিয়া জন্মগ্রহণ কর। এই অভিশাপের ফলে শ্রীমন্ত রূপে মালাধর পৃথিবীতে আবির্ভূত হইল। কালকেতুর উপাখ্যানের মত এই উপাখ্যানেও আমরা দেখিতেছি যে, কবি তাঁহার কাব্যের নায়ক-নায়িকার পূর্ব্ব-জন্মবৃত্তান্ত বলিতে ভুলেন নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের সকল নায়ক-নায়িকাই দেবতার অবতার—তাঁহারা শাপভ্রষ্ট দেবতা। প্রাচীন-কাব্যে নায়ক- নায়িকাদিগকে দেবতার অবতার করা একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রামায়ণ মহাভারতে এই আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেও এই রীতির ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না।

শ্রীমন্ত বড় হইয়া সিংহল-যাত্রা করিল। চণ্ডীর ইচ্ছানুসারে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া তাহার সাত ডিঙ্গা তৈয়ার করিয়া দিলেন। খুল্লনা চণ্ডীর উপাসনা করিয়া, পুত্রকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিল। পথে চণ্ডীর মায়ায় ভীষণ জলঝড় হইল। শ্রীমন্তের সপ্তডিঙ্গা বিপন্ন হইল। কিন্তু শ্রীমন্ত তাহার মাতার উপদেশ-মত চণ্ডীকে স্মরণ করিলেন। অমনি সেই দারুণ দুর্য্যোগ কাটিয়া গেল। সে তখন নিরাপদে শ্রীক্ষেত্র ও সেতুবন্ধ

দেখিয়া কালীদহে গিয়া উপস্থিত হইল। কালীদহে গিয়া সে তাহার পিতার মতই কমলে-কামিনী দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইল।

সিংহলরাজের নিকট গিয়া শ্রীমন্ত তাহার পিতার মত কালীদহের কমলে-কামিনীর বর্ণনা করিল। এবারও শ্রীমন্তের কথা শুনিয়া রাজা ও তাঁহার পারিষদবর্গ বিশ্বাস করিল না। অবশেষে তর্ক হইতে হইতে অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। রাজা বলিলেন যে, শ্রীমন্ত যদি কমলে-কামিনী দেখাইতে পারে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে অৰ্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা দান করিবেন। আর সে যদি কমলে-কামিনী দেখাইতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে তাহার শিরশ্ছেদন করা হইবে।

অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে সকলে কালীদহে গেল। কিন্তু কমলে-কামিনীর দর্শন মিলিল না। রাজা শ্রীমন্তকে কোটালের হাতে দিয়া হুকুম দিলেন—মশানে লইয়া গিয়া ইহার প্রাণ বধ কর। বধ্যভূমিতে নীত হইবার পূর্ব্বে শ্রীমন্ত স্নান করিতে নামিল। স্নানান্তে সে অশ্রুপূর্ণ লোচনে পিতামাতার উদ্দেশ্যে তর্পণ করিল। তর্পণ করিতে করিতে স্মরণ হইল মাতার উপদেশ। সে ভক্তিভরে চণ্ডীর স্তবগান করিতে লাগিল। চণ্ডী শ্রীমন্তের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মায়াবলে সিংহলরাজের সৈন্যগণ চণ্ডীদেবীর ডাকিনী যোগিনীর হাতে বিষম মার খাইয়া পলায়ন করিল। তখন সিংহলরাজ সৈন্যসামন্ত লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনিও পরাস্ত হইলেন। তখন চণ্ডীর কৃপায় রাজা সেই আশ্চর্য্য কমলবন দেখিলেন, আর দেখিলেন সেই অপূর্ব্ব কমলে-কামিনী মূর্ত্তি। পরাজিত হইয়া রাজা তাঁহার কন্যা সুশীলার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ দিলেন এবং শ্রীমন্তকে অৰ্দ্ধেক রাজত্ব দান করিলেন। ধনপতি সদাগর মুক্ত হইয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন ধনপতি সদাগর পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে রওনা হইলেন। পথে ধনপতি তাঁহার নষ্ট ডিঙ্গাগুলি ফিরিয়া পাইলেন। এইবার চণ্ডীর মহিমা উপলব্ধি করিয়া ধনপতি চণ্ডীপূজা করিতে সম্মত হইলেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে অনেক স্থানে অলৌকিকত্ব থাকিলেও, ইহাতে চরিত্র বিশ্লেষণ, ঘটনাবিন্যাস এবং কবিত্ব চমৎকার। এই কাব্যে পুরুষ ও নারী-চরিত্র উভয়ই চমৎকার ফুটিয়াছে। তবে নারীচরিত্রগুলি পুরুষ-চরিত্র অপেক্ষা মনোরম হইয়াছে। মুকুন্দরামের কালকেতুর চিত্র অপেক্ষা ফুল্লরার চিত্র অনেক

বেশী উজ্জ্বল। ধনপতি সদাগরের চরিত্র অপেক্ষা খুল্লনাচরিত্রের মাধুর্য্য অনেক বেশী। ইহার কারণ, পুরুষচরিত্রগুলি দেবশক্তির উপর বড় বেশী নির্ভরশীল। স্বাধীন চেষ্টার দ্বারা তাহারা মহনীয় হইয়া উঠে নাই। দেবতা সাহায্য করিয়াছেন, তবে তাহারা কোন একটা কাজে সফলতা লাভ করিয়াছে। স্বচেষ্টায় কোন কাজ করিতে তাহারা যেন অক্ষম। কালকেতু দেবী চণ্ডীর কৃপালাভ করিয়া তবে উন্নতি করিয়াছে। দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া তবে সে কলিঙ্গরাজের নিকট হইতে মুক্তি পাইয়া গুজরাটের অধীশ্বর হইয়াছে। ধনপতি সদাগর এবং শ্রীমন্তও চণ্ডীদেবীর অনুগ্রহে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। বিপদে ইহাদের কেহই নির্ভীক থাকিতে পারে নাই। বিপদে পড়িয়াই অধীর হইয়া চণ্ডীর শরণাপন্ন হইয়াছে এবং চণ্ডীর কৃপায় জয়যুক্ত হইয়াছে। পুরুষচরিত্রগুলি কোথাও পুরুষোচিত উদ্যম ও আত্মনির্ভরতা রক্ষা করিতে পারে নাই। বীর কালকেতু আত্মগোপন করিয়া ধান্যঘরে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছে, শ্রীমন্ত দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিয়াছে। কিন্তু নারীচরিত্রগুলি স্বাভাবিকভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর ঘরের সাধারণ মেয়ের গুণাবলী প্রকাশ পাইয়াছে। তাহারা গুরুজনে ভক্তিমতী, পতিপরায়ণা, সতী-সাধ্বী, নির্লোভ, বুদ্ধিমতী ও ক্ষমাশীলা। দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া তাহারা খাঁটি সোনার মত উজ্জ্বলতা বিকীরণ করিয়াছে।

মুকুন্দরাম দুঃখবর্ণনায় অসামান্য দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। কালকেতু ও ফুল্লরার ব্যাধ-জীবনের দারিদ্র্যদুঃখ এবং খুল্লনার দুঃখ কবি অতিশয় নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। এইজন্য স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন,—"কবিকঙ্কণ সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড়। বড় বড় উজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফল্গুনদীর ন্যায় এক অন্তর্ব্বাহী দুঃখসঙ্গীতের মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তধ্বনি শুনা যায়। নিঃশব্দ করুণ-রস কাব্যখানিকে বিয়োগান্ত নাটকের গূঢ় মহিমায় পূর্ণ করিয়াছে।" কবিকঙ্কণের কবিতা মূর্ত্তিমতী দরিদ্রতা। কবি নিজে দরিদ্র ছিলেন। দারিদ্র্যের নিদারুণ দুঃখ সহিয়া তিনি দারিদ্র্য-দুঃখ বর্ণনায় নিপুণতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার কাব্যে যে দুঃখ-বর্ণনা আছে, উহাতে সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের দারিদ্র্য-দুঃখই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। নিপুণতার সহিত এইরূপে দুঃখবর্ণনা এবং করুণ-রসোদ্রেকই কবিকঙ্কণের বিশেষত্ব। কবিকঙ্কণের কাব্যখানির অপর বিশেষত্ব স্বভাব-বর্ণনায় কবির

কৃতিত্ব। সেকালের রাষ্ট্র, সমাজ, গৃহস্থালী, ধর্ম প্রভৃতির বিবরণ ইহার মধ্যে সঞ্চিত হইয়া আছে; সেই সুপ্রাচীনকালের বাঙ্গলার সমাজের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম প্রভৃতি জানিতে হইলে মুকুন্দরামের কাব্য হইতে তাহার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাইবে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার চিত্র ও চরিত্র বাস্তব হইয়াছে, স্বাভাবিক হইয়াছে। কাব্যকে তিনি জীবনের সহিত একসূত্রে গাঁথিয়া দিয়া গিয়াছেন। কবি Crabbe-এর মত মুকুন্দরাম জীবনকে যথাযথভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। Crabbe-এর মত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও বলিতে পারেন—

> I paint the cot
> As truth will paint it and as bards will not.

প্রধান চরিত্রাঙ্কণে কবিকঙ্কণের যেরূপ কৃতিত্ব, ছোটখাট চরিত্রাঙ্কনেও তাঁহার সমান দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মুরারি শীল, ভাড়ু দত্ত ও দুর্বলা দাসীর চরিত্র সুন্দর ফুটিয়াছে। কবির হাস্যরসোদ্রেকের ক্ষমতাও প্রশংসনীয়।

এইরূপ নানা কারণে কবিকঙ্কণ চণ্ডী বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দকে আনন্দদান করিয়াছে এবং চিরদিনই এই কাব্যখানি জাতির প্রাচীন জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ আলেখ্যরূপে সমাদর প্রাপ্ত হইবে। দুঃখদারিদ্র্যের এবং আড়ম্বরহীন বাস্তব জীবনের উজ্জ্বলতম চিত্র হিসাবেও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানি বঙ্গসাহিত্যে চিরদিন সমাদৃত হইবে।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য

চণ্ডী, মনসা প্রভৃতির কাহিনী লইয়া মধ্যযুগে যেরূপ মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, বৌদ্ধ দেবতা ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেও সেইরূপ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যসমূহ রচিত হয়। বাঙ্গলায় ধর্ম্মঠাকুর বা ধর্ম্মশিলার উপাসনা ও উপাসক-সম্প্রদায়ের যে বিচিত্র ও অপূর্ব্ব ইতিবৃত্ত রহিয়া গিয়াছে তাহা এখনও ঐতিহাসিকগণের প্রচুর গবেষণার বিষয়রূপে পরিগণিত হইতে পারে। এই ধর্ম্মঠাকুর বা ধর্ম্মশিলা কাহার প্রতীক এবং তিনি কোন্ সূত্রে এবং কি ভাবে হিন্দুসমাজে গৃহীত হইলেন, তাঁহার উপাসনা-পদ্ধতি ও উপাসক-সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, এই ধর্ম্মমতের মূলে বৌদ্ধ প্রভাব রহিয়াছে।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এককালে বৌদ্ধধর্ম্ম সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের সেই প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে—বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ঘটিতে থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের এই অবনতির যুগে 'সহজিয়া সম্প্রদায়' ও 'নাথ সম্প্রদায়' জন্মলাভ করে। ঐ তান্ত্রিক সহজযানের সহিত বা সহজিয়া পূজা-পদ্ধতির সহিত নাথপন্থী শৈব ও যোগীদিগের ধর্ম্মমত এবং অনার্য্য ধর্ম্মমতের কিছু কিছু মিশ্রিত হইয়া ধর্ম্ম পূজার উদ্ভব হইয়াছিল। সুতরাং ধর্ম্মপূজায় বৌদ্ধপ্রভাব আছে, অনার্য্য ধর্ম্মের প্রভাবও আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রদীপ্ত শিখাটি নিবিয়া যাইবার পরে উহা যে ভস্মটুকু ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তাহারই উপর ধর্ম্মঠাকুর গড়িয়া উঠিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপূজকদের নিজস্ব একটা সৃষ্টিতত্ত্ব ও পৌরাণিক কাহিনী ছিল। কোন সংস্কৃত পুরাণের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয় যে, খুব সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন অনার্য্য অধিবাসীদিগের শাস্ত্রে এইরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব ছিল, উহাই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

ধর্ম্মঠাকুরের পূজা সমাজের নিম্নস্তরের জাতিদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কারণ ধর্ম্মঠাকুর চিরদিনই লৌকিক অপকৃষ্ট দেবতা। অবশ্য ব্রাহ্মণদিগকে এই ধর্ম্মঠাকুরের পূজকরূপে স্বীকার করিয়া ধর্ম্মঠাকুরের মর্য্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টার অভাবও সমাজে ছিল না। ধর্ম্মপূজা যে এককালে হিন্দুসমাজে নিন্দনীয় ছিল,

তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ধর্ম্মঠাকুরকে হিন্দুসমাজে মিশিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। মাণিক গাঙ্গুলী (অষ্টাদশ শতাব্দী) তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গলে বলিয়াছেন—"খ্যাতি যায় তবে প্রভু করি যদি গান" এবং ধর্ম্মপূজা করিলে, "অচিরাৎ অখ্যাতি রটিবে দেশে দেশে"।

পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে এবং সম্ভবতঃ তাহারও পূর্ব্বে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে ধর্ম্মপূজা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে কেবল রাঢ় দেশে, বিশেষ করিয়া দামোদর ও অজয় নদের তীরবর্ত্তী ভূভাগে এই ধর্ম্মঠাকুরের পূজা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। সম্ভবতঃ এই স্থান হইতেই ধর্ম্মপূজার প্রচলন হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্মঠাকুরের কিছুমাত্র প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া মনে হয় না।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ধর্ম্মঠাকুর শিব অথবা বিষ্ণু—অথবা উভয় দেবতার সহিতই একীভূত হইতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ধীরে ধীরে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মধ্যে আপন স্থান অধিকার করিয়া লইতে থাকে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পূজাপদ্ধতি প্রভৃতির প্রভাবে ধর্ম্মপূজার বৌদ্ধভাব খানিকটা চাপা পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলের বৌদ্ধভাব চাপা পড়িয়া উহা হিন্দু দেবলীলাজ্ঞাপক হইলেও ইহার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রভাব রহিয়া গিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ধর্ম্মঠাকুরের কোন প্রতিমা নাই। কূর্ম্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ড ধর্ম্মঠাকুরের প্রতীক। ধর্ম্মঠাকুরের এই মূর্ত্তি পরিকল্পনার মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম্ম অনেক সময়ে স্তূপের আকারে পূজা পাইতেন। স্তূপের পাঁচদিকে পাঁচটি কুলুঙ্গি থাকিত। তাহাতে স্তূপটি কূর্ম্মের মত দেখিতে হইত। এই জন্য ধর্ম্মঠাকুর কূর্ম্মাকৃতি, তাঁহার বাহনও কচ্ছপ। ধর্ম্মপূজায় চূণ পূজোপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ধবলতা ধর্ম্মঠাকুরের একটি বিশেষত্ব। কিন্তু হিন্দু আচার-পদ্ধতিতে চূণ কোথাও পূজার সামগ্রী হয় না।

বাঙ্গলার নানাস্থানে এখনও ধর্ম্মঠাকুরের পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা এখন শিবরূপে পূজিত হইতেছেন। ইঁহাদের পূজার সময়ে যে গীত গাওয়া হইয়া থাকে, তাহা শিবের গাজন। কিন্তু আসলে এই ধর্ম্মঠাকুর যে শিব ছিলেন না, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি অনুষ্ঠানে, যথা—শিবের

গাজনে পাঁঠা বলি হয় না, কিন্তু ধর্ম্মের গাজনে শুধু পাঁঠা কেন, হাঁস, পায়রা, এমন কি শূকর বলিও হইয়া থাকে।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অনার্য্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক দেবদেবী মিশিয়া গিয়াছেন। তাহা স্বীকার করিলে হিন্দুদের ধর্ম্মবিশ্বাসে বা সামাজিক মর্য্যাদায় কোনরূপ হীন হইতে হয় না। শীতলা, মনসা, তারা প্রভৃতি এখন আমাদের ঘরের দেবতা, ধর্ম্মঠাকুরও সেইরূপ একজন।

বাঙ্গলাদেশে ধর্ম্মপূজা-সংক্রান্ত যে সকল কাব্য পাওয়া গিয়াছে, সে সকলকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) ধর্ম্মপুরাণ, (২) ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য। ধর্ম্মপুরাণে ধর্ম্মপূজার শাস্ত্র, পূজার বিধান, পূজার মন্ত্র এবং ছড়া আছে। এই ধর্ম্মপুরাণের মধ্যেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া এবং ধর্ম্মপূজা প্রবর্ত্তনের কাহিনী আছে। ইহাকে শূন্যপুরাণ বলা হয়।

ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এগুলি ধর্ম্মপূজার সময়ে অথবা অন্য কোন উৎসবাদিতে রামায়ণ ও চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতির মত নিষ্ঠাসহকারে গীত হইত।

অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের মত ধর্ম্মমঙ্গলের রচয়িতা কবির নাম অনেক পাওয়া গিয়াছে। অনেক ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে ময়ূরভট্টকে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি বলা হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গলের কবি, ঘনরাম বলিতেছেন—'ময়ূরভট্ট বন্দিব সংগীতের আদি কবি।'

অনেকের মতে খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গলে অনেক উপকথার সমাবেশ ঘটিয়াছে, কৃষ্ণলীলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ইহাতে আছে। এই কাব্যের মধ্যে একটা মহাকাব্যোচিত ঐক্য আছে। ইহাই এই কাব্যের অন্যতম গুণ। খেলারামের কাব্যের নাম 'গৌড় কাব্য'।

এতদ্ভিন্ন রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি (শূন্যপুরাণ), মাণিক গাঙ্গুলী, রূপরাম, সীতারাম, দ্বিজ রামচন্দ্র, রামদাস আদক, ঘনরাম, বলদেব চক্রবর্ত্তী, সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির ধর্ম্মমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বাকীগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল।

রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত। কবি তাঁহার কাব্যে শাহ্ ‌শুজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাঁহার কাব্য রচনার কাল স্থিরীকৃত হইয়াছে। অনেকের মতে রূপরামের কাব্যই

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গল। ধর্ম্মমঙ্গলের কোন কোন কবি রূপরামকে আদি ধর্ম্মমঙ্গল রচয়িতা বলিয়া স্বীকারও করিয়াছেন। রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনী করুণ এবং হৃদয়গ্রাহী। এই কাব্যে সেকালের বাঙ্গালী জীবনের যেরূপ পরিপূর্ণ বাস্তব অথচ মনোহর চিত্র আছে, সেরূপ দৃষ্টান্ত এক কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ভিন্ন আর কোথাও বড় একটা নাই। রূপরামের কাব্যের কোন চরিত্রই অবাস্তব নহে। বাস্তব চিত্রাঙ্কণের জন্য প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যে যে-কয়খানি কাব্য শ্রেষ্ঠত্ব অধিকার করিয়াছে, তাহার মধ্যে রূপরামের কাব্য শীর্ষস্থান অধিকারের দাবী করিতে পারে।

রূপরামের পরেই রামদাস আদকের নাম করিতে হয়। রামদাস জাতিতে কৈবর্ত্ত। ইঁহার বাসস্থান হুগলী জেলার হায়াৎপুর গ্রাম। ইঁহার কাব্য রচনার কাল ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ। রামদাস আদকের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে রূপরামের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁহার কাব্যের নাম 'অনাদিমঙ্গল'। অনাদিমঙ্গলের ভাষা সরস ও সহজ—কবিত্বপূর্ণ ভাব ও উদ্দীপনার অভাব ইহাতে নাই। ধর্ম্মমঙ্গলের অপর এক বিখ্যাত কবি সীতারাম দাস। ইঁহার নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার সুখসাগর গ্রামে। ইনি স্বপ্নাদেশে ধর্ম্মের গান গাহিয়াছেন।

উল্লিখিত ধর্ম্মমঙ্গল কয়খানি সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে কয়খানি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর কাব্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর লাভ করিয়াছে। এই কাব্যের রচনাকাল ১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দ।

ঘনরাম বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর গ্রামে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। টোলে শাস্ত্র অধ্যয়নে পারদর্শিতা দেখাইয়া তিনি 'কবিরত্ন' এই উপাধিতে ভূষিত হন। বর্দ্ধমানের অধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের আদেশে তিনি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য ভিন্ন, তিনি একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও রচনা করিয়াছিলেন।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ২৪ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। এই কাব্যের নায়ক লাউসেন। লাউসেনের অসীম বীরত্বের কাহিনী ধর্ম্মমঙ্গলে আছে। লাউসেন দেবানুগৃহীত। বিধিদত্ত অনেক গুণ তাঁহার আছে। কিন্তু তথাপি কবি তাঁহাকে মহাবীর রূপে ফুটাইতে পারেন নাই। কাব্যের সুর অত্যন্ত একঘেয়ে—একই সুরের অবিশ্রান্ত ধ্বনি মন-প্রাণকে পীড়িত করিয়া তোলে। চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে একমাত্র কর্পূর চরিত্রাঙ্কনে ঘনরাম দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন।

চরিত্রটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য অনুপ্রাস বহুল। ভারতচন্দ্রীয় যুগের যমকানুপ্রাসের পূর্ব্বাভাষ ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ধর্ম্মমঙ্গলের মধ্যে আর দুইখানির নাম করিতে হয়। একটি রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, অপরটি মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল। শূন্যপুরাণ ৫১টি অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত আছে। শূন্যপুরাণে নিরঞ্জন শূন্যমূর্ত্তির বন্দনা করা হইয়াছে। ইনিই শূন্যপুরাণের প্রধান দেবতা। এই শূন্য মূর্ত্তির পরিকল্পনায় বৌদ্ধপ্রভাব পড়িয়াছে। বৌদ্ধ ত্রিরত্নের—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের মধ্যে ধর্ম্মই কালক্রমে এদেশে প্রধান স্থান অধিকার করেন এবং দেশে ধর্ম্মপূজা প্রবর্ত্তিত হয়। শূন্যপুরাণের নিরঞ্জনই ধর্ম্ম এবং রামাই পণ্ডিত তাঁহার পূজা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শূন্যপুরাণে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব আছে, নাথধর্ম্মের প্রভাবও আছে।

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের রচনাকাল ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ। কাব্য হিসাবে ইহা ঘনরাম অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু হাস্যরসের সৃষ্টিতে মাণিক গাঙ্গুলী বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

লাউসেনের কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইভাবে অনেকগুলি ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল এবং তাহাতে বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছিল। কাব্যগুলির মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাব, অনার্য্য পূজা-পদ্ধতির প্রভাব, সেকালের সমাজচিত্রের আলেখ্য—এ সকলই পাওয়া যায়। উপরন্তু, অনেক কাব্যে কবিগণের যে আত্ম-পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের পরম লাভ, উহা বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার অমূল্য উপকরণ।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে মহাবীর লাউসেনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। লাউসেন কুলটাগণের হস্তে পড়িয়া ইন্দ্রিয়জয়ী, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি বন্য জন্তুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার অসীম সাহস ও যুদ্ধনিপুণতার পরিচয় তিনি দিয়াছেন। দেবীর আরাধনায় নিজ অঙ্গ ছেদন করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তি ও কঠোর তপস্যার পরিচয় দিয়াছেন। ইছাই ঘোষ অপরাজেয়। তাহাকে পরাজিত করিয়া বীরত্বের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছেন। বহু অলৌকিক কার্য্য তিনি করিয়াছেন। মৃত শিশুর মুখে কথা ফুটাইয়াছেন, মৃত সৈন্যের প্রাণ দান করিয়াছেন।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে ঘটনার প্রাচুর্য্য আছে—কিন্তু সকল কাব্যেই ঘটনারাশি বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়া আছে, কোন কবি সেই বিচ্ছিন্ন ঘটনারাশিকে ঐক্য দান করিতে পারেন নাই। সাহিত্যে নায়ক সৃষ্টি করিতে গেলে যে যে উপকরণের আবশ্যক হয়, ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে তাহার অভাব নাই। কিন্তু অনেক স্থলেই সেই সকল উপকরণ নায়ক চরিত্রকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। উপকরণের আধিক্য কাব্য-রচয়িতার নিপুণতার অভাবে চরিত্রবিকাশের সহায়তা না করিয়া চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, চরিত্রবিকাশের অন্তরায় হইয়াছে।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলির আদ্যন্ত একটি একঘেয়ে সুর বাজিয়াছে। এই একঘেয়েমির দরুন পাঠক-মাত্রেরই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"বর্ষাকালে জানালা খুলিয়া অলসচক্ষে বৃষ্টিপাত দেখিতে একরূপ সুখ আছে, অবিরত জলের টপ্ টপ্ শব্দ, পত্রকম্পন ও বায়ুবেগে তরুরাজির শির আন্দোলন লক্ষ্য করিতে করিতে চক্ষুর্দ্বয় মুদিত হইয়া আসে এবং শূন্য নিষ্ক্রিয় মনে পুরাতন কথা ও পুরাতন ছবির স্মৃতি অনাহূতভাবে জাগিয়া উঠে; ধর্ম্মমঙ্গলের একঘেয়ে বর্ণনা সেই বৃষ্টির শব্দের ন্যায়, তানপুরার মত তাহা হইতে অবিরত একরূপ ধ্বনি উঠিতেছে। উহা পড়িতে একরূপ অলস সুখের উৎপত্তি হয়—স্থলে স্থলে পড়িতে পড়িতে দূর-দূরান্তরের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয় এবং ঘুমঘোরে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসে।"

ধর্ম্মমঙ্গলের নায়ক লাউসেন অতিরিক্ত মাত্রায় দেবানুগৃহীত। দেবতাদিগের অত্যধিক অনুগ্রহে তাঁহার পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব তেমন ফুটে নাই। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন, নানাবিধ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু স্বীয় চেষ্টা অপেক্ষা দেবতার অনুগ্রহে লাউসেনের সকল চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। সুতরাং কাব্যে লাউসেনের চরিত্রের মাহাত্ম্য, বীরত্ব অপেক্ষা দেবদেবীর মাহাত্ম্য অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

মঙ্গল কাব্যসমূহের মধ্যে মনসামঙ্গলের নায়ক চাঁদসদাগরের পুরুষকার যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, শুধু ধর্ম্মমঙ্গলে কেন,—অন্য কোন মঙ্গলকাব্যের নায়কের চরিত্র সেরূপ ফুটিয়া উঠে নাই। চাঁদসদাগরের তুলনায় লাউসেনের পুরুষকার নিষ্প্রভ।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যসমূহে—বিশেষতঃ ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে শাস্ত্রোক্ত বচনের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। অনেক স্থলেই শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের কবিগণ বৌদ্ধপ্রভাব ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে ধর্মদেবের প্রচার উপলক্ষ্যে হিন্দু দেবদেবীগণের মহিমাই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও বৌদ্ধপ্রভাব সর্ব্বত্র প্রচ্ছন্ন থাকে নাই। মাঝে মাঝেই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে হরপার্ব্বতীর বিবাহ-কথার পাশাপাশি কানুপা, হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ সাধুগণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গলে বৌদ্ধপ্রভাব আছে, মনসামঙ্গলেও বৌদ্ধ প্রভাব আছে। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলে বৌদ্ধপ্রভাব সর্ব্বাধিক। কারণ, বৌদ্ধ শ্রমণদিগের এবং বৌদ্ধ দেবতা ধর্ম্মঠাকুরের কাহিনীই এই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যসমূহের মূল উৎস।

পল্লী-গাথা

ময়মনসিংহ গীতিকা

গীতিকবিতাই বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল। গীতিকবিতার মধ্য দিয়াই বাঙ্গলার কবিগণের খাঁটি কবিত্বরস, একান্ত ব্যক্তিগত ভাব ভাবনা ও কল্পনাবিলাস প্রকাশ পাইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় গীতিকবিতার যে উন্মেষ হইয়াছিল, সেই গীতিকবিতার আর একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী ময়মনসিংহ গীতিকায় উৎসারিত হইয়াছে দেখিতে পাই।

ময়মনসিংহ গীতিকার গাথাগুলি ময়মনসিংহ জেলায় প্রাপ্ত। বিভিন্ন গাথা বিভিন্ন কবির রচিত। দ্বিজ কানাই, নয়নচাঁদ ঘোষ, দ্বিজ ঈশান, রঘুসুত প্রভৃতি অনেক কবির গাথা পাওয়া গিয়াছে। মহিলা কবি চন্দ্রাবতী রচিত 'কেনারাম' শীর্ষক গাথাখানিও বিখ্যাত। চন্দ্রাবতী মনসামঙ্গল রচয়িতা কবি দ্বিজ বংশীদাস বা বংশীবদনের কন্যা—ইঁহার রচিত রামায়ণ কাহিনীর কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। চন্দ্রাবতী তাঁহার 'কেনারাম' শীর্ষক গাথায় তাঁহার পিতার দ্বারা দস্যু কেনারামের দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া সাধু হইবার বিবরণ লিখিয়াছেন। কবি নয়নচাঁদ ঘোষ এই চন্দ্রাবতীর জীবনের প্রণয়কাহিনীর বেদনাটুকু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন, অন্ধ কবি ফকির ফৈজু এবং মনসুর বয়াতি প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান কবির রচিত পল্লী-গাথাও পাওয়া গিয়াছে। বর্ণনার মাহাত্ম্যে, প্রেমতত্ত্ব উপলব্ধির গভীরতায় এই সকল মুসলমান কবির গাথাগুলিও অপূর্ব্ব। ময়মনসিংহ গীতিকার কবিদিগের পরিচয় বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের কাব্যসমূহ অপরূপ মাধুর্য্যমণ্ডিত। এই সকল কবিগণের আবির্ভাবকাল মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে হইয়াছিল ইহা অনুমান করা হয়।

ময়মনসিংহ গীতিকার গাথাগুলির মধ্যে ইতিহাস আছে, পুরাণ আছে, ধর্ম্মতত্ত্ব আছে, দর্শন আছে, সমাজচিত্র ও সমাজতত্ত্ব আছে। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়াও এই গীতিকাসমূহের মূল্য আছে। কিন্তু ইহাদের মূল্য খাঁটি কবিত্বরসে, মানবমনের সুখদুঃখ, প্রেম-বিরহ সম্বন্ধে প্রাণের দরদে। এই

গাথাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী, কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলার পল্লী-হৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা"। কথাটি অতি সত্য। সত্যই ময়মনসিংহ গীতিকার বিশেষত্ব এই যে, অপরাপর পুরাতন গীতিকথার মত অথবা মঙ্গল-কাব্যের মত এগুলির গল্পাংশ কোন পৌরাণিক বা লৌকিক কাহিনীর ভূয়োভূয়ঃ পুনরাবৃত্ত কাহিনীর নূতন প্রকাশ নহে। ইহার আখ্যায়িকাসকল সম্পূর্ণ নূতন এবং সেকালের নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। গল্পগুলির মধ্যে বাস্তব জীবনের স্বরূপ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তব-জীবনের হাসি-কান্না ইহার উপজীব্য। এইজন্ত আধুনিক উপন্তাসে আমরা যে রসের সন্ধান করি, তাহা ইহাতে যথেষ্ট আছে। মানুষের অন্তরের বিকাশ ও তাহাদের অন্তরের রসের উৎস ইহার মধ্যে অবারিত। এই গীতিকাগুলি কোন অভিজাত সম্প্রদায়ের কাহিনী নহে, এই সব কাব্যের নায়ক-নায়িকা সামান্ত সাধারণ মানুষ। গাঁথাগুলিতে নিছক সাধারণ সমাজচিত্র আছে। সেইজন্ত সকল কাহিনীই আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করে। এগুলি প্রায়ই ঐতিহাসিক সত্য, অথবা ইতিকথা অবলম্বনে লিখিত। তাই প্রায় প্রত্যেক গাথার মধ্যে একটা সত্যের বাস্তবতার ছাপ আছে, সত্য-ঘটনামূলক বলিয়া গাথাগুলির মধ্য দিয়া বাস্তব জীবনের প্রেমের স্বরূপ, বাস্তব প্রেমের নিবিড়তা ও তীব্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের ট্র্যাজেডি এমন সূক্ষ্ম সহানুভূতির সহিত এই সকল গাথায় বর্ণিত হইয়াছে যে, এগুলি অতি উৎকৃষ্ট আধুনিক ছোট গল্পের সমকক্ষতাও অর্জ্জন করিয়াছে।

ময়মনসিংহ গীতিকায় পূর্ব্বরাগের কাহিনীই অধিক। পরস্পর পরস্পরকে সন্দর্শন করিয়া যুবক যুবতীর মধ্যে প্রণয় সঞ্চারের কাহিনী অনলঙ্কৃত ভাষায় ও সরল ছন্দে গ্রাম্য কবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন। অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্য কোন বর্ণনার স্বাভাবিকতাটুকুকে নষ্ট করে নাই।

অলঙ্কারকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া কবিতা যে কতদূর সরস সুন্দর হইয়া উঠিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের এই ময়মনসিংহ গীতিকাগুলি। আমরা বৈষ্ণবকাব্যে বিদ্যাপতি রচিত বয়ঃসন্ধির বর্ণনা পাঠ করিয়াছি। ঈষদুদ্ভিন্ন-যৌবনা রাধিকার অপূর্ব্ব লাবণ্য ও মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে গিয়া বিদ্যাপতি অলঙ্কারের ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষ

করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাতে শৈশব ও যৌবনের সন্ধিস্থলে রাধিকার সৌন্দর্য্যটুকু অলঙ্কারের অপরূপ মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সহজ কথায় সরল ভাষায় বর্ণিত ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত বয়ঃসন্ধির বর্ণনাও কম মাধুর্য্যমণ্ডিত নহে। "মলুয়া" শীর্ষক গাথায় আমরা পাইতেছি—

ভিন দেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন।
লাজরক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন॥

লজ্জার অরুণরাগে রঞ্জিত হওয়ায় বুঝা গেল যে, কন্যার যৌবনসমাগম হইয়াছে! এ বর্ণনায় বয়ঃসন্ধি-কালের অঙ্গলাবণ্যের কথা নাই, অলঙ্কারের বর্ণচ্ছটা ইহাতে নাই। আছে সদ্যোবিকচ হৃদয়ের সহসা আপনার সৌরভ উপলব্ধির অনুভূতিটুকু, আছে আপনার সম্বন্ধে আপনি সবে-মাত্র সচেতন হইয়া উঠার লজ্জা।

ময়মনসিংহ গীতিকায় যে প্রেমের কথা আছে তাহা পুরোহিত-শাসিত বা সমাজ-শাসিত প্রেম নয়, উহা স্বচ্ছন্দ স্বাধীন হৃদয়ের আকর্ষণ। নায়ক-নায়িকাদিগের মধ্যে নারী-চিত্রগুলিই ভাল ফুটিয়াছে। রমণীর প্রেম সকল শাসন অগ্রাহ্য করিয়া তাহার প্রিয়তমের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। ইহার জন্য তাহাদিগকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকার প্রেমিকারা সকলেই দুঃখের তপস্যায় জয়ী হইয়াছে, প্রেম কাহারও নিকট অপমানিত হয় নাই,—দারুণতম দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া সকল নায়িকা প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। এই হিসাবে এই সকল নায়িকাকে বীরাঙ্গনা—এই আখ্যায় ভূষিতা করা যায়। ময়মনসিংহ গীতিকায় দুঃখের কষ্টিপাথরে নরনারীর—বিশেষতঃ নারীর প্রেমের পরীক্ষা হইয়াছে। সকল ক্ষেত্রেই প্রেমের অবাধ শক্তির জয়গান করা হইয়াছে। প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ময়মনসিংহ গীতিকায় অনেক আছে।

ময়মনসিংহ গীতিকার গাথাসমূহের সৌন্দর্য্যের প্রধান উৎস ইহাদের পরিপূর্ণ আন্তরিকতায়। গীতিকার বর্ণনা বাহুল্যবর্জ্জিত। বলিবার ভঙ্গীটি এবং ভাষা সরস সজীব। ইহাতে স্থানে স্থানে অলঙ্কার আছে, কিন্তু তাহা সংস্কৃতের নিকট হইতে ধার করা নহে। তাহা গ্রাম্য কবিদের নিজেদের উদ্ভাবন। কবিদিগের বর্ণনায় সংযম আছে—বক্তব্য ও বর্ণনা সম্বন্ধে এই সংযমই ময়মনসিংহ গীতিকার আর্ট। যেখানে থামিলে ও যতটুকু বর্ণনা করিলে পাঠকের ও শ্রোতার চিত্ত রসের অনুভবে তন্ময় হইয়া থাকিবে, ছোট

গল্প লেখার সেই আর্টটুকু লেখকদিগের আয়ত্তে রহিয়াছে দেখিতে পাই। এই সকল কবিদিগের প্রকৃত রসবোধ ছিল।

প্লট, ভাষা, বর্ণনানৈপুণ্য, খুঁটিনাটি দেখিবার ক্ষমতা, মনের ভাব অনুভব করিবার শক্তি, বাস্তবতার সহিত কল্পনার এক অপরূপ সংমিশ্রণ এবং গভীর-রসস্ফূর্তিষ্ঠ সংযত পরিসমাপ্তি ময়মনসিংহ গীতিকার বিশেষত্ব।

বৈষ্ণব কবিতা যেমন বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যের পরম সম্পদ, ময়মনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন আখ্যায়িকাও তদ্রূপ। বৈষ্ণব কবিতার উপজীব্য রাধাকৃষ্ণের প্রেম, ময়মনসিংহ গীতিকার অধিকাংশ গাথার বিষয়বস্তুও প্রেম। কিন্তু এ প্রেম রাধাকৃষ্ণের প্রেম নহে, ইহা গ্রাম্য চাষী, দরিদ্র সামান্য লোকেদের ও পল্লী রমণীগণের প্রণয়বেদনার কাহিনী। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে উপজীব্য না করিয়া বাঙ্গলায় ইহাই প্রথম গীতি-কবিতা।

বৈষ্ণব গীতি-কবিতা অধ্যাত্ম-রাজ্যের। নরনারীর প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে—পার্থিব প্রেমগীতির সুর শুনাইতে শুনাইতে উহা সহসা সুর চড়াইয়া এক অধ্যাত্ম-রাজ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে। তখন উহা অতীন্দ্রিয় ভাবের দ্যোতক হইয়াছে। কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা অধ্যাত্মরাজ্যের কথা নহে, তাহা বাস্তব জগতের প্রণয়বেদনার কাহিনী। বৈষ্ণব গীতিকবিতার সহিত ময়মনসিংহ গীতিকার পার্থক্য এইখানে। বৈষ্ণব কবিতায় আছে আধ্যাত্মিক সুর, ময়মনসিংহ গীতিকায় আছে বাস্তব প্রেমের সুরটুকু। কোন কোন গাথায় অবশ্য বাস্তবের সুর খুব উচ্চগ্রামে পৌঁছিয়াছে, তখন তাহা প্রায় অধ্যাত্মলোকে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার মত উহা বাস্তব-রস সম্পর্ক শূন্য নিছক আধ্যাত্মিক রসমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

স্থানে স্থানে বৈষ্ণব কবিদিগের পদের সহিত পল্লী গাথার কোন কোন অংশের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়—কিন্তু তাহা বৈষ্ণব প্রভাব বলিয়া মনে হয় না। উহা পল্লীগাথা রচয়িতাদিগের প্রেমতত্ত্ব উপলব্ধির গভীরতাই প্রকাশ করিতেছে। যেমন "দেওয়ান ভাবনা" এই গীতিকার—'অঙ্গের লাবণি গো সোনাইর বাইয়া পড়ে ভূমে' এই পদটী চণ্ডীদাসের—"চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়" মনে করাইয়া দেয়। পল্লীগীতিকার নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাসমূহের মধ্যেও বৈষ্ণব গীতিকবিতার সুরমূর্চ্ছনা জাগিয়া উঠিয়া পল্লীকবিদিগের বাস্তবতাকে খুব একটা উচ্চগ্রামে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

"দেওয়ান ভাবনা" শীর্ষক গীতিকার নায়িকা সোনাইয়ের সহিত মাধবের সাক্ষাৎ ঘটিল—সাক্ষাতের পর উভয়ের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে। মুগ্ধা অনুরাগিণী তাহার প্রিয়তমের সহিত মুহূর্ত্তের বিচ্ছেদ সহিতে অক্ষম। নিত্যনিরন্তর প্রিয়তমের সংসর্গ লাভ করিতে উন্মুখ হইয়া সোনাই বলিতেছে—

ধরতাম যদি পারতাম ভমরারে রাইতের নিশাকালে।
কেশেতে বান্ধিয়া তোমায় রাখতাম খোঁপার ফুলে॥

* * * *

পক্ষী হইলে সোনার বন্ধুরে রাখিতাম পিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে প্রাণের বন্ধুরে খোঁপায় রাখতাম তোরে॥
কাজল হইলে রাখতাম বন্ধুরে নয়ান ভরিয়া।
তোমার সঙ্গে যাইতাম বন্ধুরে দেশান্তরী হইয়া॥

* * * *

ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধুরে যদি কেওয়াবনে।
নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার সনে॥
তুমি যদি হইতারে বন্ধু আসমানের চান।
রাত্র নিশা চাইয়া থাকতাম খুলিয়া নয়ান॥
তুমি যদি হইতারে বন্ধু ঐ সে নদীর পানী।
তোমারে চাহিয়া দিতাম তাপিত পরাণী॥

অন্যত্র—

বাঁশী বাজাও আঁধা-বঁধু শিখাও আমায় গান।
আজি হৈতে পিয়া বঁধু পরাণে পরাণ॥
আজি হৈতে তোমায় বঁধু ছাড়িয়া না দিব।
নয়নের কাজল করি নয়নে রাখিব॥
সে কাজল দেখিয়া যদি লোকে করে দোষী।
হিয়ায় লুকায়ে বঁধু শুনব তোমার বাঁশী॥
হিয়ায় লুকানো বঁধু লোকে যদি জানে।
পরাণ কোটরা ভরি রাখিব যতনে॥
বসন করি অঙ্গে পরব মালা করি গলে।
সিন্দুরে মিশায়ে তোমা মাখিব কপালে॥

চন্দনে মিশায়ে তোমার করব দেহ শীতল।
সুখে দুঃখে করব তোমার ভুনয়ানের কাজল ॥
দুই অঙ্গ ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হইব।
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহা না শুনিব ॥

—আঁধা বঁধু

"শিলা দেবী" শীর্ষক গাথাতেও অনুরাগের তীব্রতা ও গভীরতা এইরূপই উচ্চগ্রামে গিয়া পৌছিয়াছে—

বঁধু যদি হৈতা আমার কনকচম্পা ফুল।
সোনায় বাঁধিয়া তারে কানে করতাম দুল ॥
বঁধু যদি হৈতা আমার পরণের নীলাম্বরী।
সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিয়া পরিতাম নাহি দিতাম ছাড়ি ॥
বঁধু যদি হৈতা আমার মাথার দীঘল চুল।
ভাল কইরা বাঁধতাম খোঁপা দিয়া চাঁপা ফুল ॥

ইহার সহিত চণ্ডীদাসের নিম্নোদ্ধৃত পদটি তুলনা করিলে দেখিব বৈষ্ণব কবিদিগের মতই উপলব্ধির গভীরতা এই সকল পল্লীগাথা রচয়িতাদিগের মধ্যে জাগিয়াছিল এবং তাহার ফলে কবিদিগের বর্ণনা সময়ে সময়ে অতীন্দ্রিয়-লোককে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধিকা এই সকল পল্লীগাথার নায়িকার মতই বলিয়াছেন—

সখি, আমার অঙ্গে যদি মিশাইত কালিয়া।
বঁধুরে রাখিতাম আমি হিয়ার মাঝারে লুকাইয়া ॥
শ্যাম যদি অঞ্জন হইত।
নয়নে থুইতাম আমি জনমের মত ॥
অতসী কুসুম হইত শ্যাম।
আমার কালো কেশে লোটনে বাঁধিয়া রাখিতাম ॥
সখি, চন্দন হইত শ্যাম রায়।
মাখিয়া রাখিতাম আমি সকল গায় ॥

পূর্ব্বরাগের বর্ণনায়, রূপবর্ণনায়, মিলন-ব্যাকুলতার বর্ণনায় ও বিরহ বর্ণনে এই সকল গীতিকার কবিদিগের কবিত্ব সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে।

পূর্ব্বরাগের বর্ণনা—

দেখিল সুন্দর কন্যা জল লইয়া যায়।
মেঘের বরণ কন্যার গায়েতে লুটায় ॥

এইত কেশ কন্যার লাখ টাকার মূল।
শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুল॥
ডাগল দীঘল আঁখি যার পানে সে চায়।
একবার দেখিলে তারে পাগল হৈয়া যায়॥
এমন সুন্দর কন্যা না দেখি কখন।
কার ঘরের উজল বাতি চুরি করল মন॥
জাগিয়া দেখেছি কিবা নিশার স্বপন।
কার ঘরের সুন্দর নারী, কার পরাণের ধন॥
জলের না পদ্মফুল শুকনায় ফুটে রইয়া।
আসমানের তারা ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া॥

নায়িকার রূপবর্ণনায় কবিগণ উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু সে সকল উপমা এত স্বাভাবিক যে, তাহাতে নায়িকার সৌন্দর্য্য কোথাও এতটুকু ভারাক্রান্ত হয় নাই। যথা—

আন্দাইর ঘরে থইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা॥
হাটিয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল।
মুখেতে ফুট্যা উঠে কনক-চাম্পার ফুল॥
আগল ডাগল আখিরে আসমানের তারা।
তিলেক মাত্র দেখলে কইন্যা না যায় পাশুরা।
—মহুয়া॥

চান্দের সমান মুখ করে ঝলমল।
সিন্দুরে রাঙ্গিয়া ঠুট তেলাকুচ ফল॥
জিনিয়া অপরাজিতা শোভে দুই আখি।
ভ্রমরা উড়িয়া আসে সেইরূপ দেখি॥
দেখিতে রামের ধনু কন্যার দুই ভুরু।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি কটিখানা সরু॥
কাকুনি সুপারি গাছ বায়ে যেন হেলে।
চলিতে ফিরিতে কন্যা যৌবন পড়ে চলে॥
আষার মাস্যা বাশের কেরুল মাটি ফাট্যা উঠে।
সেই মত পাও দুখানি গজন্দমে হাটে॥

বেলাইনে বেলিয়া তুলছে দুই বাহুলতা।
কণ্ঠেতে লুকাইয়া তার কোকিলে কয় কথা॥
শ্রাবণ মাসেতে যেন কাল মেঘ সাজে।
দাগল দীঘল কেশ বায়েতে বিরাজে॥
কখন খোপা বান্ধে কন্যা কখন বাঁধে বেণী।
রূপে রঙ্গে সাজে কন্যা মদন মোহিনী॥
অগ্নি পাটের শাড়ী কন্যা যখন নাকি পরে।
স্বর্গের তারা লাজ পায় দেখিয়া কন্যারে॥
আষাইঢ়া জোয়ারের জল যৌবন দেখিলে।
পুরুষ দূরের কথা নারী যায় ভুলে॥ —কমলা।

নবীন বয়স কন্যা প্রথম যৌবন।
রূপেতে রোসনাই করে চান্দমা যেমন॥
কাল চিকণ কেশে বান্দিয়াছে খোপা।
মালতীর মালা দিয়া বেড়িয়াছে সোপা॥
আশ্বিন মাসেতে যেন পদ্মের কলি।
বসনে ঢাকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি॥
স্নান করিতে যখন কন্যা জলের ঘাটে যায়।
ঝাড়িয়া মাথার কেশ পায়েতে ফেলায়॥
বাতাসে বসন রঙ্গে যখন উড়ে পড়ে।
ভৃঙ্গ যত উইড়া আসে পদ্ম ফুল ছাইড়ে॥
নাকের নিঃশ্বাসে তার বায়ুতে সুবাস।
চান্দের কিরণ যেমন অঙ্গেতে পরকাশ॥
পরথম যৌবন কন্যা সদা হাসি খুসি।
হাসিলে বদনে ফুটে মল্লিকার রাশি॥
নিতম্ব দেখিয়া তার নিতম্বের তরে।
আসমান ছাড়িতে চান্দ মনে আশা করে॥
কন্যার কণ্ঠস্বরে কোইলে পায় লাজ।
দণ্ডে দণ্ডে ধরে কইন্যা নানা রঙ্গের সাজ॥

—কমলা।

পরম সুন্দরী সুনাইগো দীঘল মাথার চুল।
মুখেতে ফুট্যাছে সুনাইর গো শতেক চাম্পার ফুল॥

—দেওয়ান ভাবনা।

প্রেমের তন্ময়তা এবং মিলনব্যাকুলতা প্রকাশেও গ্রাম্য কবিগণের বর্ণনা মর্মস্পর্শী এবং কবিত্বমণ্ডিত। নায়িকার অন্তরে প্রেম সঞ্চার হইয়াছে। নায়িকা তাহার প্রিয় মিলনের আকুতি প্রকাশ করিয়া বলিতেছে—

যে দিন হইতে দেখছি বন্ধু
তোমায় মৈশালের বাড়ী,—
সেই দিন হইতে বন্ধু,
আরে বন্ধু পাগল হইয়া ফিরি ॥

* * * *

বুক ফাটিয়া যায়রে বন্ধু,
আরে বন্ধু মুখ ফুটিয়া না পারি।
অন্তরের আগুনে বন্ধু
আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি ॥
পাখী যদি হইতারে বন্ধু,
আরে বন্ধু, রাখতাম হৃদপিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে বন্ধু,
আরে বন্ধু, গাইথা রাখতাম তোরে ॥
চান্দ যদি হইতারে বন্ধু,
আরে বন্ধু, জাইগা সারা নিশি।
চান্দ মুখ দেখিতাম বন্ধু,
আরে বন্ধু, সারা নিশি বসি ॥

এখানে সহজ কথায় সহজ স্বাভাবিক ছন্দে প্রিয়মিলনের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় বা নায়িকার যৌবন-সমাগমের চিত্রাঙ্কনেও ময়মনসিংহ গীতিকায় একটি বিশিষ্ট মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

হাসিয়া খেলিয়া লীলায় বাল্যকাল গেল।
সোনার যৈবন আসি অঙ্গে দেখা দিল ॥
শাউনিয়া নদী যেমন কুলে কুলে পানি।
অঙ্গে নাহি ধরে রূপে চম্পক বরণী ॥

* * * *

বার না বছরের কন্যা তেরতে পড়িল।
আপনে দেখিয়া আপনে চিন্তিত হইল ॥
বেশের নাহি আদর যতন কেশের বন্ধনী।
কোথা হইতে আইল পাগল জোয়ারের পানি ॥
একেশ্বরী হইয়া লীলা থাকয়ে বিজনে।
ফুটিয়া বনের ফুল থাকে যেমন বনে ॥

—কঙ্ক ও লীলা।

এই বর্ণনা পড়িতে পড়িতে একটি সমীর-চঞ্চল কূলে কূলে ভরা নদীর কথা মনে পড়ে। সুন্দরীর অঙ্গে অঙ্গে সৌন্দর্য্যের বান ডাকিয়া গিয়াছে—ভরা নদীর উচ্ছ্বসিত জলধারার ন্যায় সুন্দরীর রূপরাশি যেন উছলিয়া উঠিতেছে। সুন্দরীর শৈশবসুলভ চপলতা আর নাই। ভরা নদীর অন্তর্দ্দেশের গভীরতা, নিস্তব্ধতা ও আত্মবিস্মৃত ধ্যানশীলতা সুন্দরীর দেহে মনে সঞ্চারিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় সুন্দরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা নাই। যৌবনস্পর্শে সুন্দরীর মন যে সরস, নবীন ও চঞ্চল হইয়াছে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

বিরহ বর্ণনায় ময়মনসিংহ গীতিকার কবিগণ দক্ষ শিল্পী। বিরহিণীর অশ্রুজলে এই সকল কাহিনী সজল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রত্যেক কাহিনীতেই দেখা যায় প্রিয়তমকে লাভ করার জন্য প্রেমিকা কত দুঃখ সহ্য করিতে পারে—কত নিপীড়ন, কত অত্যাচার মাথা পাতিয়া বরণ করিতে পারে। ময়মনসিংহ গীতিকার নায়িকাগণ বিরহের আগুনে দগ্ধ হইয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে—বিরহ তাহাদের প্রেমকে মহিমান্বিত করিয়াছে।

বিরহানন্তর মিলনের আনন্দ যে কত নিবিড় তাহাও কবিগণ স্বকীয় ভঙ্গীতে বর্ণনা করিতেছেন—

মেওয়া মিশ্রী সকল মিঠা
মিঠা গঙ্গাজল—
তার থাক্যা অধিক মিঠা
শীতল ডাবের জল।
তার থাক্যা মিঠা দেখ
দুখের পরে সুখ—

তার থাক্যা মিঠা যখন
ভরে খালি বুক।
তার থাক্যা মিঠা যদি
পায় হারান ধন—
তার থাক্যা অধিক মিঠা
বিরহে মিলন।

এখানে সহজ কথায় বিরহের পরে মিলনের উল্লাসটুকু অতি সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে এই ময়মনসিংহ গীতিকা বঙ্গসাহিত্যে এক অতীব অভিনব সামগ্রী। ময়মনসিংহ গীতিকার অন্যতম বিশেষত্ব ও আকর্ষণীশক্তি হইতেছে এই যে, প্রত্যেকটি গাথায় বলিবার ভঙ্গী ও ভাষা সহজ ও সরল এবং কবিত্বরসে মধুর। কবিদিগের সৌন্দর্য্য-বর্ণনার পদ্ধতি স্বাভাবিক মাধুর্য্যমণ্ডিত। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী ভিন্ন বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহার সমকক্ষ সুন্দর কবিতা আর রচিত হয় নাই।

গাথাগুলিতে সমাজ ও সংস্কার অপেক্ষা প্রেমকে বড় করিয়া—মানুষকে বড় করিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তাই দেখা যায় যে, গাথাসমূহে জাতিবিচার, কুলশীল, পদমর্য্যাদা সমস্তই প্রেমের বন্যাস্রোতের সম্মুখে ভাসিয়া গিয়াছে, উহা প্রেমের দুর্জ্জয় শক্তির সম্মুখে ব্যবধান বা বাধা রচনা করিতে পারে নাই। বেদের মেয়ে মহুয়া নদ্যার ঠাকুরের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছে এবং উভয়ের প্রণয়ের আকর্ষণ অয়স্কান্তের মত প্রবল, "আঁধা বঁধু"-তে সাধারণ একজন বংশীবাদকের প্রতি রাজকুমারীর অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এবং সেই অনুরাগ একটা উচ্চগ্রামে পৌঁছিয়া অতীন্দ্রিয় ভাবের দ্যোতক হইয়াছে।

ময়মনসিংহ গীতিকার আর একটি বিশেষত্ব—ইহাতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির পরিচয় আছে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেদের কথা সহানুভূতির সহিতই অঙ্কিত হইয়াছে। অতএব ইহাকে বাঙ্গলাদেশের প্রকৃত অন্তরের সাহিত্য বলা যাইতে পারে।

গোপীচন্দ্র ময়নামতীর গান

ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্র ময়নামতীর কাহিনী স্মরণাতীত কাল হইতে বঙ্গের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত গীত হইত। গোপীচন্দ্র বাঙ্গলার রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের কাহিনী বাঙ্গলার বাহিরে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। বাঙ্গলাদেশের উত্তরাঞ্চলে, বিশেষতঃ রংপুর জেলায় এখনও ময়নামতী গোপীচন্দ্রের কাহিনী সুর সংযোগে গীত হইয়া থাকে।

রংপুরে অবস্থানকালে এই গানগুলির প্রতি পণ্ডিতপ্রবর গ্রীয়ারসন সাহেবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তিনিই ইহা "মাণিকচন্দ্র রাজার গান" এই নাম দিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। এই গানগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির যুগের দেবতা ধর্ম্মঠাকুরের ও নাথ যোগীদের ধর্ম্মমত একত্র মিলাইয়া রচিত। অর্থাৎ ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব রহিয়াছে, নাথ ধর্ম্মের প্রভাবও ইহাতে প্রচ্ছন্ন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন যে, "এই গীতির ভাব বৌদ্ধ জগতের। অনেক স্থলেই বৌদ্ধগণের উপাস্য ধর্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।" ময়নামতী গোপীচন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে 'মহাজ্ঞানে'র অসামান্য প্রভাবের কথা আছে। নাথ ধর্ম্মের প্রভাবেই 'এই মহাজ্ঞানে'র কথা গোপীচন্দ্রের গানসমূহে স্থান লাভ করিয়াছে। 'মহাজ্ঞানে'র কথা আমরা মনসামঙ্গলেও পাইয়াছি। এই মহাজ্ঞানের প্রভাবে রাণী ময়নামতী বহু বিপদ এবং সুকঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

গোপীচন্দ্রের গানে বৌদ্ধ প্রভাবের সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাবও মিশিয়াছে। শুধুমাত্র বৌদ্ধ প্রভাব এই গানে বর্ত্তমান থাকিলে, "এই সঙ্গীত বোধ হয় এতদিনে লুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতে দেবদেবীর কথা সংযোজিত হওয়াতে এই গীতি ঈষৎ পরিমাণে হিন্দুত্বের আভা ধারণ করিয়াছে; এবং সেই হিন্দুত্বের আভাটুকুই বোধ হয় এই গানের পরমায়ু-বৃদ্ধির কারণ।"—দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

রাজা মাণিকচন্দ্র ও রাণী ময়নামতীর পুত্র গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অবলম্বনের কাহিনী লইয়া যে গান রচিত হইয়াছিল, তাহা রাজা মাণিকচন্দ্রের গান,

ময়নামতীর গান ও গোপীচন্দ্রের গান প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। এই সব গানের রচয়িতা যে কে বা কাহারা, তাহা স্থির করা যায় না। মুখে মুখে গীত হইতে হইতে গানগুলির ভাষা আধুনিক হইয়া গিয়াছে। কোন কোন পালায় শ্রীচৈতন্যদেবের উল্লেখ থাকায় উহা যে পরচৈতন্য-যুগে রচিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। যথা—

কেশব ভারতী গুরু কথা হইতে আইল।
কিনা মন্ত্র দিয়া নিমাই সন্ন্যাসী করিল॥
—ভবানীদাসের গোপীচাঁদের পাঁচালী

ভবানীদাস, দুর্লভ মল্লিক ও শুকুর মহম্মদ নামক কবির ভণিতায় তিনখানি গাথা পাওয়া গিয়াছে। সবগুলির পুঁথিই আধুনিক।

এই গাথাসমূহ গ্রাম্য কবিদিগের রচনা। সেইজন্য ইহার মধ্যে সংস্কৃত প্রভাব আদৌ নাই। ভাষার মধ্যে বা বর্ণনার মধ্যে সংস্কৃতানুগ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, যমক, অলঙ্কার নাই। অতি সরস ভাষায় অনাড়ম্বর রীতিতে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণের কাহিনী বলা হইয়াছে।

গ্রাম্য কবিদিগের বর্ণনা বলিয়া ইহার ভাষা ও বর্ণনারীতি অত্যন্ত সাদাসিধা বটে। কিন্তু তথাপি ইহাতে ধর্মতত্ত্ব আছে, দার্শনিকতা আছে—সর্ব্বোপরি ইহাতে কবিত্ব আছে।

গানগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও কম নহে। ইহাদের মধ্যে আমরা তৎকালীন রীতিনীতি, সমাজচিত্র, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সাধারণ লোকেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখের একটি আলেখ্য পাইয়াছি। বঙ্গের গ্রামগুলির সহিত—গ্রাম্য জীবনের সহিত গাথাগুলির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; সর্ব্বত্রই গ্রামের কথা, তাহার ছড়া, প্রবাদ-বাক্য—পশু-পক্ষীর বিবরণ।

গোপীচন্দ্রের গান করুণ রসের প্রস্রবণ। মাতা ময়নামতীর চেষ্টা ও উদ্যোগে হাড়িপা বা জলন্দরি গুরুর শিষ্যত্বে নবীন নৃপতি গোপীচন্দ্রের যোগী বা সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগই গোপীচন্দ্র ময়নামতী সম্বন্ধীয় গাথার বর্ণনীয় বিষয়।

বাল্যে ময়নামতীর নাম ছিল শিশুমতি। এই শিশুমতির বাল্যকালে নাথ ধর্ম্মের অন্যতম প্রবর্ত্তক গোরক্ষনাথ, শিশুমতির পিতা তিলকচন্দ্রের প্রাসাদে পদার্পণ করেন এবং দয়াপরবশ হইয়া বালিকাকে 'মহাজ্ঞান' শিখাইয়া দেন। তিনিই বালিকা শিশুমতির নূতন নামকরণ করেন—ময়নামতী।

রাজা মাণিকচন্দ্রের সহিত ময়নামতীর বিবাহ হইলে ময়নামতী স্বামীকে 'মহাজ্ঞান' শিখিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজা স্ত্রীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি হইলেন না।

অতঃপর রাজা আরও একশত আটটি সামান্য ভার্য্যা গ্রহণ করিলেন। ফলে নবযৌবনা রাণী ময়নামতী ক্রুদ্ধা হইয়া রাজার সহিত কলহ করিলেন এবং স্বামীর সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একাকিনী ফেরুসানগরে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রাজা মাণিকচন্দ্রের গুরুতর অসুখ হইল। রাজার জীবনের আর আশা নাই। তখন ময়নামতী খবর পাইয়া রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার পিপাসার জল আনিবার জন্য লক্ষ টাকা মূল্যের ভৃঙ্গার লইয়া গঙ্গায় জল আনিতে গেলেন। এই সুযোগে যমদূত রাজার প্রাণহরণ করিল। রাণী সতী হইতে গেলেন। কিন্তু স্বর্গস্থিত দেবতাগণ তাহাতে বাধা দিলেন এবং রাণীকে একটি পুত্র দান করিলেন।

রাণীর নবজাত পুত্রের নাম হইল গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র। তিনি রাজা হইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনাকে বিবাহ করিলেন এবং পদুনাকে যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। অদুনা পদুনা গোপীচাঁদের প্রধানা মহিষী হইলেন; ইহা ছাড়া গোপীচন্দ্রের অন্য স্ত্রীরও অভাব ছিল না।

রাজকুমার ক্রমে পাটে বসিলেন এবং তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাণী ময়নামতী পুত্রকে যমের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে হাড়ি সিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ বৎসরের জন্য সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দিলেন।

মাতার প্রস্তাব শুনিয়া গোপীচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। তিনি করুণ বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিলেন—"ঘরে না থাকিতে দিল ময়নামতী মাএ।" কিন্তু ময়নামতী ছাড়িবার পাত্রী নহেন। নারীচরিত্রের চপলতা বর্ণনা করিয়া তিনি স্ত্রীলোকের প্রেমের অসারতা প্রদর্শন করিলেন এবং পুত্রের নানাবিধ প্রশ্নের সমাধান করিলেন। তখন রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অন্দরমহলে প্রবেশ করিতেই অদুনা ও পদুনা রাজাকে অন্য প্রকার মন্ত্রণা দিল এবং ময়নামতীর 'মহাজ্ঞানে'র পরীক্ষা লইবার প্রস্তাব করিল। ময়নামতী সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তখন অদুনা পদুনা ময়নামতীকে বিষ প্রয়োগ করিল, নানাবিধ পরীক্ষা-দ্বারা তাঁহার ক্ষমতা যাচাই করিল। কিন্তু সকল

পরীক্ষারই ময়নামতী 'মহাজ্ঞান'-প্রভাবে বাঁচিয়া গেলেন। রাজা গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইল এবং সন্ন্যাসাবস্থায় দ্বাদশ বৎসর নানাবিধ ক্লেশ-ভোগ করিয়া অবশেষে হাড়িসিদ্ধার সাহচর্য্যে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহাই সংক্ষেপে ময়নামতী গোপীচন্দ্রের কাহিনী। এই কাহিনীতে অতি-প্রাকৃতের স্পর্শ আছে—মহাজ্ঞান প্রভাবে ময়নামতী-কর্ত্তৃক অলৌকিক শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় দানের কথা আছে। কিন্তু এরূপ অলৌকিক কাহিনী বা অতি-প্রাকৃতের স্পর্শ কেবলমাত্র এই গোপীচন্দ্রের গানে নাই। প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যের অধিকাংশের মধ্যেই এইরূপ অতি-প্রাকৃতের স্পর্শ ঘটিয়াছে।

গোপীচন্দ্রের গানে অতি-প্রাকৃতের স্পর্শ, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক তথ্যের বাহুল্য থাকিলেও ইহাতে কবিত্ব দুর্লভ নহে। গ্রাম্য কবিদিগের বর্ণনারীতি সরল, স্পষ্ট এবং direct। কিন্তু তাহাতে কবিত্বের সুরভিটুকু বর্ত্তমান থাকিয়া বর্ণনীয় বিষয়ের সৌন্দর্য্যটুকুকে সরস করিয়া তুলিয়াছে।

রাজা গোপীচন্দ্র তাঁহার মাতা ময়নামতীর আদেশে সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প করিলে অদুনা ও পদুনা নাম্নী তাঁহার মহিষীদ্বয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত যাইতে চাহেন। মহিষীদ্বয়ের এই আবেদন সরল অনাড়ম্বর ভাষায় কবি চমৎকার করিয়াই ফুটাইয়াছেন। মহিষীদ্বয় বলিয়াছেন—

> না যাইও, না যাইও রাজা, দূর দেশান্তর—
> কার লাগিয়ে বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর ?
> নিদের স্বপনে, রাজা, হবে দরশন ;
> পালঙ্কে ফেলাইব হস্ত—নাই প্রাণের ধন !
> দশ গৃহের মা বইন রবে স্বামী লৈয়া কোলে,
> আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে।
> জীয়ব জীবন-ধন, আমি কন্যা সঙ্গে গেলে ;
> রান্ধিয়া দিমু অন্ন তোমার ক্ষুধার কালে।
> পিপাসার কালে দিমু পানী ;
> হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী।
> শীতলপাটি বিছাইয়া দিমু, বালিসে হেলান পাও;
> হাউস রঙ্গে বাঁতিমু তোমার হস্ত-পাও।

গ্রীষ্মকালে বদনত দিমু দণ্ডপাখা বাও ;
মাঘ মাসের শীতে ঘেঁসিয়া রমু গাও।

উত্তরে রাজা গোপীচন্দ্র সন্ন্যাসজীবনের ক্লেশের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার মহিষীদ্বয়কে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন—

"আমার সঙ্গে যাবু রাণি, পন্থের শোন কাহিনী।
খিদা লাগলে অন্ন পাবু না, পিয়াস লাগলে পানী॥
শালবন শিমুলবন চলিতে মান্দার।
যে দিকে হাঁটে হাড়ি-গুরু দিনতে আন্ধার॥
স্ত্রী আর পুরুষে যদি পান্থ বাইয়া যায়।
হেন বা দুষ্টের বাঘ আছে নারী ধরি খায়॥
খাইবে না খাইবে বাঘে ফ্যালাবে মারিয়া।
বৃথা কাজে ক্যান মরবু আমার সঙ্গে যাইয়া॥

উত্তরে মহিষীদ্বয় বলিতেছে—

......"শুন রাজা রসিক নাগর॥
কারে কয় এগিলা কথা কে আর পইতায়।
এমন দুষ্ট বনের বাঘ স্ত্রী পুরুষ বাছিয়া খায়॥
থাকনা ক্যানে বনের বাঘ তাক না করি ডর।
নিষ্কলঙ্ক মরণ হউক সোয়ামীর পদের তল॥

গোপীচন্দ্র ও তাঁহার মহিষীদ্বয়ের এই উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া মধুর হাস্যরস উৎসারিত হইয়াছে, স্বামীর প্রতি নারীর প্রেমের পরাকাষ্ঠা ও একান্ত আত্মনির্ভরতা প্রকাশ পাইয়াছে।

গোপীচন্দ্রের গানে বিরহিণীর করুণ বিলাপও অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী হইয়া বাজিয়া উঠিয়াছে।—

কতকাল রাখিব যৌবন আঞ্চলে বান্ধিয়া।
বাহের হৈল যৌবন হৃদয় ফাটিয়া॥
নেত্তে বান্ধিলে যৌবন নেত্তে হৈব ক্ষয়।
প্রথম যৌবন গেলে কেহ কারো নয়॥

নেতে বান্ধিলে যৌবন চটকিয়া উঠে।
স্বামীকে পাইলে যৌবন কভু নাহি টুটে॥

ইহার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের—

কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িয়া।
নিদয় হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ॥

এই চরণ দুইটি তুলনীয়। বিরহিণী রাধিকা যেমন বলিয়াছিলেন—

সখি আমার অঙ্গে যদি মিশাইত কালিয়া।
বঁধুরে রাখিতাম আমি হিয়ার মাঝে লুকাইয়া॥
শ্যাম যদি অঞ্জন হইত।
নয়নে থুইতাম আমি জনমের মত॥
অতসী কুসুম হইত শ্যাম।
আমার কালো কেশে লোটনে বাঁধিয়া রাখিতাম॥
সখি, চন্দন হইত শ্যামরায়।
মাখিয়া রাখিতাম আমি সকল গায়॥

বিরহবিশীর্ণা প্রতীক্ষ্যমানা গোপীচন্দ্রের মহিষীও সেইরূপ বলিয়াছে—

তোমা সঙ্গে প্রীতি করি আনলে দহিয়া মরি
পাঞ্জার বিন্ধিল কাল ঘুণে।
জদি মণি মুক্তা হৈত হার গাথি গলে দিত
পুষ্প নহে কেশেতে রাখিতুম॥
আসিব আসিব করি আমি রৈলাম পন্থ হেরি
নয়ান হৈয়া গেল ঘোর।

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণে তাঁহার প্রধানা মহিষীদ্বয়ের অন্তরে যে বিরহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—স্বামীর আসন্ন বিরহে এবং বিরহের পরে তাহাদের অন্তর হইতে যে করুণ বিলাপ ও মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহাই গোপীচন্দ্রের গানের প্রাণস্বরূপ, গোপীচন্দ্রের গানের সকল মাধুর্য্যের উৎস সেইখানে।

বঙ্গসাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা ও দান

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি মধ্যযুগের বহু মুসলমান শাসনকর্ত্তার যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ভূরি ভূরি রহিয়াছে। সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য মুসলমান শাসকগণের উৎসাহ এবং প্রেরণার অভাবও মধ্যযুগে যে ছিল না, আর অগণিত মুসলমান কবির দানে বাঙ্গলা সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হইয়াছে একথা সুবিদিত সত্য। এই প্রসঙ্গে একথা জানিয়া রাখা ভাল যে, মুসলমানগণের উৎসাহে ও সাহায্যে পরিপুষ্ট বাঙ্গলা সাহিত্য কেবলমাত্র মুসলমান সংস্কৃতিরই প্রচারে ব্যাপৃত হয় নাই। বরং ইহা প্রধানতঃ হিন্দুদিগেরই ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। হিন্দুর পুরাণাদির অনুবাদ—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদির অনুবাদ এবং হিন্দুর ধর্ম্মবিষয়ক উপাখ্যান এই সাহিত্যের বহুলাংশ অধিকার করিয়া আছে। সাহিত্যের ইতিহাসের দিক হইতে মুসলমান নরপতিদিগের এই উৎসাহ ও প্রেরণা এবং মুসলমান কবিদিগের দান উপেক্ষণীয় নহে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে বাঙ্গলাদেশে যে সকল মুসলমান শাসনকর্ত্তা শাসন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের উৎসাহেই মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ঐ সকল শাসনকর্ত্তার উৎসাহ ও প্রেরণায় হিন্দুদের পুরাণাদি, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদির অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল।

পঞ্চদশ শতকে কবি কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণ কাব্য অনুবাদ করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অবশ্য কোন মুসলমান শাসকের উৎসাহে অনূদিত নহে। ইহা গৌড়েশ্বর রাজা দনুজমর্দ্দন গণেশের উৎসাহে অনূদিত হয়। কিন্তু এই রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করেন এবং গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ইনি ইঁহার পিতার মতই হিন্দু কবি ও পণ্ডিতদিগকে বাঙ্গলায় রচনা করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন—কবিগণের

উৎসাহদাতা ছিলেন। ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলার বা হিন্দুর সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি ইনি বীতরাগ হন নাই।

অতঃপর গৌড়েশ্বর সামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের নাম করিতে হয়। ১৪৭৪ হইতে ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দ ইঁহার রাজত্বকাল। ইনি বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। বর্দ্ধমানের কুলীন গ্রামবাসী কবি মালাধর বসুকে ইনি ভাগবতের দশম ও একাদশ অধ্যায় অনুবাদ করিতে প্রোৎসাহিত করেন এবং অনুবাদ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে কবিকে "গুণরাজ খান" এই উপাধিতে ভূষিত করেন। মালাধর বসুর এই ভাগবতানুবাদ শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামে বিখ্যাত এবং বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই কাব্যগ্রন্থ।

গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের রাজত্বকাল বাঙ্গলা সাহিত্যের সুবর্ণময় যুগ। কারণ হুসেন শাহ বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন, তাঁহার প্রশংসায় বাঙ্গলার বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ পঞ্চমুখ। হুসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩—১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ। হুসেন শাহের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া রামকেলী নিবাসী তাঁহার এক কর্ম্মচারী—চতুর্ভুজ নামক কবি "'হরিচরিত' নামক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একখানি সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন। শ্রীখণ্ড নিবাসী বৈদ্য যশোরাজ খান বাঙ্গলাতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এই হুসেন শাহের প্রেরণায়। কবি যশোরাজ খান সগৌরবে তাঁহার কাব্যগ্রন্থের একস্থানে তাঁহার উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক সম্রাট্ হুসেন শাহের যশোগান করিয়াছেন।

শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ
সোহ এরস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর,
ভণে যশোরাজ খান॥

পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল রচিত হয়। উল্লিখিত মনসামঙ্গল দুইখানিতেই হুসেন শাহের প্রশংসা আছে। পদাবলীতেও হুসেন শাহের প্রশংসা আছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে এবং শ্রীকর নন্দীর মহাভারতেও হুসেন শাহের প্রশংসা ও গুণবর্ণনা আছে।

নৃপতি হুসন শাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥

—কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত

বাঙ্গলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়াই বঙ্গীয় সারস্বতকুঞ্জে হুসেন শাহের এত প্রশংসাগান হইয়াছিল।

হুসেন শাহের এক কর্মচারী ছিলেন তাঁহার নাম বিদ্যাপতি। এই বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইনিও হুসেন শাহের উৎসাহ লাভ করিয়া থাকিবেন—কারণ ইঁহার কোন কোন পদে হুসেন শাহের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

হুসেন শাহের পুত্র নসীরুদ্দীন নসরত শাহও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য বিভিন্ন কবিকে নানাভাবে উৎসাহ দান করেন। নসরত শাহের প্রশংসাতেও মধ্যযুগের বহু কাব্য একেবারে পঞ্চমুখ। এই নসরত শাহ একখানি মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। সেই মহাভারতখানি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে রচিত কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে এই নসরত শাহ যে একখানি মহাভারত অনুবাদ করাইয়াছিলেন—নসরত শাহ যে বিদ্যোৎসাহী এবং বঙ্গসাহিত্যের একজন উৎসাহদাতা নরপতি ছিলেন, সে কথা রহিয়াছে।—

> শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান।
> রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥
> —কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত।

এই নসরত শাহ বৈষ্ণব প্রেমগীতিকার অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলীর অনুরাগী ছিলেন। বিদ্যাপতি (শ্রীখণ্ডের) একটি পদের ভণিতায় তাহা ঘোষণা করিয়াছেন—

> সে যে নসিরা শাহা জানে,
> যারে হানিল মদন বাণে।
> চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
> কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

বিদ্যাপতির পদে গৌড়েশ্বর "প্রভু গিয়াসুদ্দীনে"র প্রশংসাও আছে।

নসীরুদ্দীন নসরত শাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফীরুজ শাহও তাঁহার পিতা ও পিতামহের মতই বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। ইঁহার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া শ্রীধর নামক জনৈক কবি একখানি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন।

হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খান চট্টগ্রাম জয় করিয়া ঐ স্থানেই শাসনকর্ত্তারূপে বসবাস করিতেন। এই পরাগল খানও বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক কবি মহাভারতের অনুবাদ করেন। এই মহাভারতখানি পরাগলী মহাভারত নামেও বিখ্যাত। মহাভারতের কথা শুনিতে সেনাপতি পরাগল খান বড়ই ভালবাসিতেন। তাই কবীন্দ্রের মহাভারত কাব্য তিনি নিত্য-নিয়মিত পাত্র-মিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রবণ করিতেন।

পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি শ্রীকর নন্দীকে দিয়া মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের একটি বিস্তৃত অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালেও—অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মুসলমান শাসকদিগের প্রেরণা পাইয়া বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি হইয়াছে এ প্রমাণও আছে। আরাকানরাজ্যের অমাত্য মাগন ঠাকুর (ইঁহার নামটি হিন্দুর মত হইলেও ইনি প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ছিলেন) সঙ্গীত ও সুকুমার শাস্ত্রের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ইঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বঙ্গের মুসলমান কবি আলাওল হিন্দী কবি মালিক মহম্মদ জয়সী রচিত "পদ্মাবৎ" কাব্যের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই মাগন ঠাকুরেরই আদেশে ইনি সফয়লমুলক ও বদিউজ্জমাল নামক ফার্সী কাব্যের অনুবাদে রত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের উৎসাহে বাঙ্গলা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ও সমৃদ্ধিসাধন হইয়াছিল।

অতঃপর বাঙ্গলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনের জন্য মুসলমান কবিগণের অবদানের কথা আলোচনা করা যাক।

বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া গীতিকবিগণ যত পদ রচনা করিয়াছেন, তত আর অন্য কোন বিষয় লইয়া নহে। সেই যুগ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তীকাল। ঐ যুগে বৈষ্ণবকবিদিগের পদাবলী বসন্তকালের অপর্য্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মত মুকুলিত হইয়া বাঙ্গলার কাব্যকানন সুশোভিত ও সুরভিত করিয়াছিল। এই যুগে বহু মুসলমান কবিও বৈষ্ণবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। ভাষার ঐশ্বর্য্যে, ভাবের গম্ভীরতায় এবং ছন্দের মাধুর্য্যে সেই সকল কবিতা সমুজ্জ্বল। কল্পনার অভিনবত্বে এবং

ভাবগভীরতায় মুসলমান কবিদিগের রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলীর সহিত জ্ঞানদাস, ঘনশ্যামদাস, নরোত্তমদাস, বলরামদাস, লোচনদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন-দিগের পদাবলীর তুলনা হইতে পারে।

মধ্যযুগে যে সকল মুসলমান পদকর্তা আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য ব্রজলীলার কাব্যোচিত মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অনেকেই প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন এবং স্ব-সমাজে নিন্দার আশঙ্কা থাকিলেও বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই অনুপ্রেরণায় একজন খাঁটি বৈষ্ণব কবির মতই স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আকবর সাহা, নসীর মামুদ, ফকির হবিব, ফতন প্রভৃতি অনেক মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে স্পষ্ট কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন—

আগম নিগম বেদ সার।
লীলা যে করত গোঠ বিহার॥
নশীর মামুদ করত আশ।
চরণে শরণ দানরি॥

কবি এখানে প্রকাশ্যভাবেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ মাগিয়াছেন।

ফকির হবিব নামক আর একজন মুসলমান পদকর্ত্তার একটি পদে আছে—

ফকির হবিব বলে কানুরে দেখিনু ভালে,
যেন শশী পূর্ণ উদয়।
হেন মনে করে হিয়া কানুরে সমুখে থুয়া,
নিরবধি দেখহুঁ সদায়॥

একেবারে বৈষ্ণবভাবাপন্ন না হইলে প্রাণের আকুতি এমনিভাবে ব্যক্ত করা যায় না। কবি সৈয়দ মর্ত্তুজা একটি পদে লিখিতেছেন—

সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে, কানুর চরণে,
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে
জীবন-মরণ ভরি॥

এখানে ত দেখিতেছি যে, কবি তাঁহার দেবতা শ্রীকৃষ্ণের পদছায়ার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

কোন কোন মুসলমান কবি আবার গৌরচন্দ্রিকার পদ রচনা করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যে ভাব ও কল্পনার একটা জোয়ার আসিয়াছিল—যিনি ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি, রাধার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন—তাঁহার অলৌকিক এবং বিচিত্র লীলাবিলাস মুসলমান কবিদিগেরও কাব্য-রচনার বিষয় হইয়াছিল।

বৈষ্ণব সাহিত্যে মুসলমান কবির সংখ্যা অল্প নহে। যেমন,—আলিরাজা, আকবর সাহা, কবীর, গরিব খাঁ, চাঁদ কাজি, নশীর মামুদ, ফকির হবিব, কতন, সেখ ভিখন, সেখ জালাল, সেখলাল, সৈয়দ মর্ত্তুজা ইত্যাদি। কবি হিসাবে ইঁহাদের অনেকেই শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে এমন একটি কোমল মধুর উজ্জ্বলতা থাকে, যাহা আমাদের প্রাণে ও মনে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা আনিয়া দেয়। এই কোমলতা ও মাধুর্য্য, Ruskin যাহাকে infinite tenderness বলিয়াছেন, জুবেয়ার যাহাকে বলিয়াছেন delicacy এবং সেক্সপীয়ার যাহাকে fine frenzy বলিয়াছেন, তাহার সন্ধান মধ্যযুগের মুসলমান বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলী আস্বাদন করিলেও পাওয়া যাইবে।

এই সকল মুসলমান বৈষ্ণব কবি ভিন্ন, বাঙ্গলা সাহিত্যে আরও কয়েকজন মুসলমান কবি বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হন। ইঁহাদের রচনার অধিকাংশই প্রধানতঃ অনুবাদ সাহিত্য অথবা আখ্যায়িকামূলক কাব্য। হিন্দী, পার্শী প্রভৃতি ভাষার কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া অনেক মুসলমান কবি বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় কবি আলাওলের। এই কবির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

মালিক মহম্মদ জয়সী রচিত হিন্দী কাব্য 'পদ্মাবৎ কাব্যে'র অনুবাদ ইঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। অনুবাদ কাব্য হইলেও আলাওলের "পদ্মাবতী" কাব্যে কবির প্রতিভার নিদর্শন আছে। হিন্দী পদ্মাবৎ কাব্যের কাহিনীকে কবি আলাওল তাঁহার স্বকীয় কল্পনার রঙে অনুরঞ্জিত করিয়া একটি নূতন রূপ দান করিয়াছেন। কবি সংস্কৃত ভাল জানিতেন, আরবী ফার্সী ভাষায়ও তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার রচনার উপর, কল্পনার ও বর্ণনাভঙ্গীর উপর জয়দেবের প্রভাব, বিদ্যাপতির প্রভাব এ সমস্তই পরিলক্ষিত হয়।

পদ্মাবতী কাব্য ভিন্ন আলাওল সয়ফলমুলুক, বদিউজ্জমাল, হফৎ পয়কর এবং দারা সিকন্দর নামা নামে কয়েকখানি ফার্সী কাব্যের অনুবাদও করেন।

আলাওলের কয়েকটি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদও পাওয়া গিয়াছে। আলাওল যে একজন রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবি ছিলেন, তাহার পরিচয় শুধু যে তাঁহার বৈষ্ণব পদাবলী হইতে পাওয়া যায় এমন নহে। তাঁহার পদ্মাবতী কাব্যে নায়িকার বয়ঃসন্ধির যে বর্ণনা আছে তাহা বিদ্যাপতির রাধিকার বয়ঃসন্ধির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

> আড় আঁখি বক্র দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।
> ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয় ॥
> চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয়।
> বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় ॥
> অনঙ্গ সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে।
> আমোদিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে।
> সুন্দরী কামিনী কামবিমোহে।
> খঞ্জন গঞ্জন নয়নে চাহে ॥
> মদনধনু ভুরু বিভঙ্গে।
> অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণ তরঙ্গে ॥

বিদ্যাপতির বর্ণনার চমৎকারিত্ব এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতির রাধিকার মতই আলাওলের পদ্মাবতী অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছেন, যৌবনসমাগমে তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে সৌন্দর্য্য ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। এই বর্ণনা পড়িতে পড়িতে বিদ্যাপতির রাধিকার মত একটি আনন্দ-চঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ কল্পনায় ভাসিয়া উঠে। পদ্মাবতীর অঙ্গে অঙ্গে সৌন্দর্য্যের ঢেউ খেলিতেছে, কখনও বা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, কখনও বা লজ্জাজনিত সঙ্কোচে তিনি তির্য্যক দৃষ্টি ইতস্তত: ক্ষেপণ করিতেছেন। নবীনা নবস্ফুটা এই যুবতী যেন নূতন করিয়া নিজের পরিচয় পাইয়া কখনও লীলাময়ী, কখনও লজ্জায় সঙ্কোচে কম্পিতা, শঙ্কিতা, বিহ্বলা।

আলাওলে জয়দেবের প্রভাবও ছিল। কবির সহজাত কবিত্ব-শক্তির সহিত তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং বিদ্যাপতি জয়দেবের বর্ণনা-চাতুর্য্য ও শব্দযোজনার সৌকর্য্য মিলিয়া আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে আর তাঁহার পদাবলীতে এক অনির্ব্বচনীয়তা আনিয়া দিয়াছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যে আলাওল ভিন্ন আর যে কয়জন কবি অনুবাদ কাব্য অথবা আধ্যাত্মিকামূলক কাব্য রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহাদের

মধ্যে নাম করিতে হয় দৌলত কাজি, সৈয়দ সুলতান, কবি শেখ চাঁদ, শাহ মহম্মদ সগীর, মহম্মদ খান, আবদুল নবী ইত্যাদির।

দৌলত কাজি আলাওলের সমকক্ষ কবি ছিলেন। ইনি 'সতী ময়না' ও 'লোর চন্দ্রাণী' নামে দুইখানি কাব্য রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী রচনাতেও ইনি নিপুণ কবি ছিলেন।

সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরাগলপুরের অধিবাসী ছিলেন। ইনি জ্ঞানপ্রদীপ, নবীবংশ এবং হজরৎ মোহাম্মদ-চরিত এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার রচিত কয়েকটি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীও পাওয়া গিয়াছে।

শেখ চাঁদের 'রসুলবিজয়' কাব্য বিখ্যাত। ইহা হজরত মোহাম্মদের জীবনী লইয়া লিখিত। কাব্যটিতে কবির প্রতিভার বিশেষত্ব ও কবি-কল্পনার অভিনবত্ব আছে।

ময়মনসিংহ গীতিকার মুসলমান কবিগণও ক্ষমতাশালী কবি ছিলেন। আমরা গোপীচন্দ্রের গানের রচয়িতা মুসলমান কবিও পাইয়াছি। তাঁহাদের দানেও বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধি হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা গেল যে, মুসলমান শাসকগণের প্রেরণা এবং মুসলমান কবিদিগের সাহিত্য-সাধনা উভয়ই বাঙ্গলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনে নানাভাবেই সহায়তা করিয়াছিল। যে সকল মুসলমান শাসকের প্রেরণায় এবং যে সকল মুসলমান কবির দানে বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্য চিরদিন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আলাওল

বঙ্গসাহিত্যে এমন এক সময় ছিল, যখন কানু ছাড়া আর গীত ছিল না। গান রচনা করিতে হইলেই কবিগণ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার কাহিনী অবলম্বন করিয়া পদাবলী রচনা করিতেন। বঙ্গসাহিত্যের সেই যুগে বহু মুসলমান কবিও পদাবলী রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সৌষ্ঠব সাধন করিয়া গিয়াছেন, মুসলমান কবিদের সে দান অবহেলা করিবার নহে। ইঁহারা অনেকেই বৈষ্ণবীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যে-সকল পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন,

তাহা বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্ হইয়া আছে। তাঁহাদের সেই সকল কবিতা ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্য্যে, এবং ছন্দের মাধুর্য্যে আজিও ঝলমল করিতেছে।

বঙ্গসাহিত্যে যে কয়জন মুসলমান কবি পদ-রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আলাওল অন্যতম। ইঁহার কয়েকখানি কাব্যও আছে। সেগুলি কবির কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য এই উভয়ের সম্মিলনে অপরূপ।

পূর্ব্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় ফতেয়াবাদ পরগণার জালালপুর নামক জায়গায় কবি আলাওলের নিবাস ছিল। সেই সময়ে জালালপুরের অধিপতি ছিলেন সাম্‌শের কুতুব নামে এক ব্যক্তি। আলাওল এই সাম্‌শের কুতুবের এক মন্ত্রীর পুত্র। যৌবনে ইনি ইঁহার পিতার সহিত জলপথে ফরিদপুর হইতে আরাকানে যাইতেছিলেন। সেই সময়ে একদল পর্ত্তুগীজ জলদস্যু আলাওল ও তাঁহার পিতাকে আক্রমণ করে। সেই আক্রমণে কবির পিতা প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু কবি কোনরূপে রক্ষা পাইয়া আরাকানের রাজার প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। আরাকানরাজ বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু মাগনঠাকুর ছিলেন মুসলমান। মুসলমান হইলেও ইঁহার নামটা হিন্দুর মত বটে। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। সে যুগে অনেক মুসলমানের এইরূপ হিন্দু নাম থাকিত। কবিতা ও সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রতি এই মাগনঠাকুরের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি আলাওলের কবিত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করিলেন যে, আলাওল কেবল কবি নহেন, তিনি বিশেষ পণ্ডিতও। আরবী, ফারসী, সংস্কৃত আর হিন্দী এই কয়টি ভাষাতে ইঁহার অসাধারণ দখল। ইহা দেখিয়া তিনি আলাওলকে অনুরোধ করিলেন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি মালিক মহম্মদ জয়সী প্রণীত 'পদ্মাবৎ' কাব্যের অনুবাদ করিতে। মাগনঠাকুরের অনুরোধে আলাওল 'পদ্মাবৎ' কাব্যের অনুবাদ আরম্ভ করিলেন। এই কাব্য শেষ করিতে তাঁহার দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। ইহা যখন শেষ হয় তখন কবি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। এই পদ্মাবৎ কাব্যের অনুবাদের মধ্য দিয়া আলাওলের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য উভয়ই অভিব্যক্ত হইয়াছে। আলাওলের সমস্ত রচনার মধ্যে এই কাব্যখানিই সমধিক প্রসিদ্ধ।

'পদ্মাবৎ' কাব্য চিতোরের রাণী পদ্মিনীর উপাখ্যান। দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন চিতোর-রাজ্ঞী পদ্মিনীর রূপে প্রলুব্ধ হইয়া যে সমরানল প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন পদ্মাবৎ কাব্যে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু আলাওলের কাব্যখানিতে প্রচলিত পদ্মিনী উপাখ্যানের কিঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটিয়াছে। কবি সর্ব্বত্র প্রচলিত

কাহিনীটিকে অনুসরণ করেন নাই। অনুবাদ করিতে গিয়া কবি অনেক নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন—অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন।

প্রচলিত পদ্মিনী উপাখ্যানে দেখি—পদ্মিনী রাজপুত মহিলা। ইনি চিলোন-পতি হামির শঙ্খের দুহিতা—চিতোররাজের পিতৃব্য বীর ভীমসিংহের সহ-ধর্ম্মিণী। পদ্মিনীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া দিল্লীশ্বর আলা-উদ্দীন অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পদ্মিনীকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত চিতোর আক্রমণ করেন। যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আমি একবার পদ্মিনীকে দর্পণে দর্শন করিতে পাইলেই চরিতার্থ হইয়া চলিয়া যাইব।" সে যুগে রমণীগণ পুরুষের সমক্ষে বাহির হইতেন না, সেই জন্য আলাউদ্দীন চিতোরের রাণার নিকট এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সরলচিত্ত ভীমসিংহ চিতোরের কল্যাণকামনায় আলাউদ্দীনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং আলাউদ্দীনকে চিতোরের দুর্গমধ্যে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর তিনি দর্পণমধ্যে অসূর্য্যম্পশ্যা পদ্মিনীর রূপ দর্শন করিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। তৎপরে তিনি যখন দুর্গের বাহিরে আসিলেন তখন ভীমসিংহ তাঁহার প্রতি সম্মান ও সৌজন্য দেখাইবার জন্য তাঁহার সহিত দুর্গের বাহিরে গমন করিলেন। এই সুযোগে আলাউদ্দীনের সৈন্যগণ ভীমসিংহকে বন্দী করিল।

ভীমসিংহ বন্দী হওয়ার পরে পদ্মিনী তাঁহার পিতৃব্য গোরা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের সহিত পরামর্শ করিয়া আলাউদ্দীনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, স্বামীর মুক্তির জন্য তিনি আত্মদানে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং তিনি পরিচারিকাদের সহিত সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হইবেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সাত শত শিবিকা চিতোর দুর্গ হইতে বাহির হইল। আলাউদ্দীনের নিকট সংবাদ গেল পদ্মিনী তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে একবার ভীমসিংহের সহিত শেষ সাক্ষাৎ-প্রার্থিনী। পদ্মিনীর প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। শিবিকাসমূহ ভীমসিংহের শিবিরের নিকটে গেল। তখন একখানি শিবিকা হইতে স্ত্রীবেশী একজন রাজপুত যোদ্ধা নামিয়া ভীমসিংহের শিবিরমধ্যে গেল। ভীমসিংহ তখন ঐ শূন্য শিবিকায় আরোহণ করিলেন—শিবিকাখানি দ্রুতবেগে চিতোর দুর্গের দিকে ধাবিত হইল। কেহ কোন সন্দেহ করিল না, ভাবিল স্ত্রীলোকের শিবিকা, দেখিবার কি আছে। ভীমসিংহ নির্ব্বিঘ্নে দুর্গে উপস্থিত হইলেন।

ওদিকে আলাউদ্দীন যখন দেখিলেন যে, বহুক্ষণ হইল পদ্মিনী ভীমসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে শিবিরে প্রবেশ করিয়াছেন, অথচ এখনও বাহির হইতেছেন না, তখন তাঁহার সন্দেহ হইল। তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে ভীমসিংহের শিবিরের দিকে সসৈন্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সাতশত শিবিকায় রাজপুত সৈন্যগণ স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া লুকায়িত ছিল। তাহারা আলাউদ্দীন ও তাঁহার সৈন্যদলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তাহাদের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিল এবং শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে পাঠানসেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আলাউদ্দীন বিপক্ষ-দমন করিতে না পারিয়া এবং পদ্মিনীলাভে অসমর্থ হইয়া ক্ষুণ্ণমনে দিল্লীতে ফিরিলেন। কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানি তিনি ভুলিতে পারিলেন না। তিনি কিছুদিন পরে পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলেন।

যুদ্ধে রাজপুতগণের সংখ্যা ক্রমেই কমিতে লাগিল, তাহাদের বলক্ষয় হইতে লাগিল। অবশেষে চিতোর রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া রাজপুত রমণীগণ সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত চিতারোহণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পদ্মিনী এবং অন্যান্য রাজপুত রমণীগণ মূল্যবান বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া চিতারোহণ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া নিজেদের সতীধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। আলাউদ্দীন পদ্মিনীকে লাভ করিতে না পারিয়া চিতোর নগরীর ধ্বংসসাধন করিয়া মনের আক্ষেপ মিটাইলেন।

কিন্তু আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে পদ্মিনী-উপাখ্যান অন্যরূপ। তিনি চিতোরাধিপতি ভীমসিংহের নাম পর্য্যন্ত বদলাইয়াছেন। তাঁহার কাব্যে চিতোরাধিপতির নাম রত্নসেন এবং কাব্যের শেষে আলাউদ্দীনের পরাজয় ঘটিয়াছে।

পদ্মাবতী কাব্যে কবির পাণ্ডিত্য, গভীর সংস্কৃত-জ্ঞান ও হিন্দুসমাজের আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। কবি প্রত্যেক অধ্যায়ের পূর্ব্বে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, কাব্যমধ্যে কবি জ্যোতিষিক আলোচনা করিয়াছেন, যাত্রার শুভাশুভ বিচার করিয়াছেন এবং হিন্দুসমাজের বিবাহাদি ব্যাপারের আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট চিত্র দিয়াছেন। কাব্যখানিতে মধ্যে মধ্যে দার্শনিকতা আছে। স্থানে স্থানে চমৎকার ঋতুবর্ণনা আছে। ঐ সকল ঋতুবর্ণনা এবং বয়ঃসন্ধি প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিয়া তাঁহাকে একজন রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবি বলিয়া মনে হয়। পদ্মাবতী কাব্য পাঠ করিয়া ইহা উপলব্ধি

হয় যে, কবির উপর বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি ও জয়দেবের প্রভাব ছিল। অনেক স্থানেই তাঁহার বর্ণনায় কথার বাঁধুনি জয়দেবের মত। বিদ্যাপতির বর্ণনা-মাধুর্য্য, কল্পনাভঙ্গী ও জয়দেবের সরল শব্দযোজনায় সৌন্দর্য্য মিলিয়া আলাওল কবির কবিতাকে সরস-সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

পদ্মাবতী কাব্য রচনার পরে আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগনঠাকুর কবিকে দুইখানি ফার্সী কাব্য অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। আলাওল অনুবাদ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সেই অনুবাদ শেষ হইবার পূর্ব্বেই মাগনঠাকুরের মৃত্যু হইল। গভীর দুঃখে কবি অনুবাদ বন্ধ করিলেন।

এই সময়ে সহসা আরাকানে এক বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা শাহ্ সুজা সেই সময়ে ভারত-সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের দ্বারা তাড়িত হইয়া আরাকানে যান। পরে আরাকানরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। আরাকানরাজ সুজার আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত তাঁহার সমস্ত অনুচরদিগকে হত্যা করিবার হুকুম দিলেন। তখন আরাকানরাজ্যে মুসলমানদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল। আলাওল শাহ্ সুজার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আরাকানরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এমন কথাও প্রচার হইল। কাজেই আলাওল বিনা-বিচারে কারাগারে বন্দী হইলেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল যে, আলাওল নির্দ্দোষ। কাজেই তিনি তখন মুক্তি পাইলেন। কিন্তু রাজার আশ্রয় আর তিনি পাইলেন না। এই সময়ে তিনি আশ্রয়হীন হইয়া বড় কষ্টে পড়িয়াছিলেন। দীন দরিদ্রের মত তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কিন্তু কিছুদিন পরে বিধাতা তাঁহার উপর সদয় হইলেন। তিনি সৈয়দ মুসা নামে একজন সদাশয় ব্যক্তির আশ্রয় পাইলেন। সৈয়দ মুসা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার অনুরোধে আলাওল পুনরায় তাঁহার অসমাপ্ত কাব্য অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অসম্পূর্ণ কাব্য দুইখানি শেষ করিলেন।

এই সময়ে কবি বেশ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। লিখিতে গেলে তাঁহার হাত কাঁপিত। দৃষ্টিও ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। তিনি তখন বেশ দরিদ্র। কিন্তু কবিত্বের উৎস তখনও তাঁহার শুকাইয়া যায় নাই। তাই ঐ বৃদ্ধবয়সেও তিনি আরও কয়েকখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

আলাওলের 'পদ্মাবতী-কাব্যে'র মধ্যে কতকগুলি ঈশ্বর স্তোত্র আছে। সেগুলি বড় সুন্দর। উহার ভিতর দিয়া কবির গভীর ঈশ্বরভক্তি এবং ঈশ্বরের অসীম সৃষ্টিশক্তির প্রতি বিস্ময় প্রকাশিত হইয়াছে।

আলাওল একজন গোঁড়া শৈবের মত শিবের বন্দনাগীতি গাহিয়াছেন—

শিরে গঙ্গাধারা-ঘটা, গলে অস্থিমালা।
অঙ্গে ভস্ম, পৃষ্ঠেতে পরণ ব্যাঘ্র ছালা॥
কণ্ঠে কালকূট, ভালে চন্দ্রমা সুচারু।
কক্ষে শিঙ্গা ভূতনাথ, করেতে ডমুরু॥
শঙ্খের কুণ্ডলী কর্ণে, হস্তেতে ত্রিশূল।
ওড়ের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল॥

আলাওলের রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদও বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচিত অভিসারের পদ মনোরম। তাঁহার পদাবলীতে বৈষ্ণব কবিদের মত উপলব্ধির গভীরতা এবং বর্ণনাকৌশল আছে। সেগুলির মধ্য দিয়া শ্রীরাধিকার করুণকোমল প্রকৃতিটি চমৎকারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই সকল পদাবলী তিনি তাঁহার জীবনের বিভিন্ন সময়ে রচনা করিয়াছিলেন—এগুলি কোনো এক সময়ের রচনা নহে। কবিতাগুলির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী বড় সুন্দর। সেইজন্য আজিও বাঙ্গলাদেশের বৈষ্ণবসমাজ খুবই অনুরাগ ও ভক্তির সহিত আলাওলের রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কবিতাসমূহ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

শাক্ত পদাবলী

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া গীতিকবিতা রচিত হয় নাই। শুধুমাত্র বৈষ্ণব কবিতা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের গীতিকবিতার নিদর্শন নহে। শাক্ত পদাবলী—অর্থাৎ শ্যামাসঙ্গীত, আগমনী ও বিজয়া গানও প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের অতি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার নিদর্শন।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতার পরে বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত গীতিকবিতার অভাব হইয়া পড়িয়াছিল। কবিগণ অনুবাদ কাব্য রচনায় অথবা কাহিনীমূলক কাব্য—অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগের শেষভাগে বাঙ্গলায় লুপ্তপ্রায় গীতিকবিতার স্রোতটি শাক্ত পদাবলীর মধ্য দিয়া পুনরায় উৎসারিত হইয়াছিল।

এই শাক্ত গীতিকবিতার বিশেষত্ব এই যে, এখানে দেবীর সহিত ভক্তের এক অতি মধুর সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাতে একটা সম্ভ্রম-মিশ্রিত ভাব থাকে, সম্ভ্রমজনিত একটা ব্যবধান গড়িয়া উঠে। সেই সম্বন্ধে দেবতার পাদপদ্মে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিয়া শুধু আত্মপ্রসাদ লাভ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভগবানের সহিত নিবিড় মিলন হইল না বলিয়া, ভগবানের সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপিত হইল না বলিয়া একটা আক্ষেপ অহরহঃ মনের মধ্যে গুমরিয়া উঠিয়া ভক্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে। আরাধ্য দেবতার সহিত ভাবপ্রবণ বাঙ্গালী চায় নিবিড় মিলন। এই মিলনের অভাবে তাহার অন্তরে জাগিয়া উঠে ব্যাকুলতা। শাক্ত পদাবলী ভগবানের সহিত এমনি একটা অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছে। শাক্ত পদাবলীতে দেবী কখনও জননী, কখনও কন্যারূপিণী—জননী এবং কন্যারূপে তিনি বাঙ্গালীর ভালবাসা স্নেহ প্রেম আকর্ষণ করিয়াছেন।

কিন্তু ভগবানের সহিত ভক্তের এই মধুর সম্বন্ধের কথা শাক্ত পদাবলীতেই প্রথম ফুটে নাই। মধ্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্য এ বিষয়ে অগ্রণী। এইরূপ কল্পনাভঙ্গী বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত

হইয়াছিল। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে, আরাধ্য ও আরাধকের মধ্যে স্নেহ ও প্রেমের সম্পর্ক বৈষ্ণব পদাবলীতেই সর্ব্বপ্রথম উন্মেষ হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ভগবানকে অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম রসময়ের সহিত একটি মধুর রসসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে।

শ্যামাসঙ্গীতেও শ্যামা মায়ের সহিত একটা মধুর সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে। আগমনী গানে উমা ও মেনকাকে লইয়া যে বাৎসল্য রসের ধারা বহিয়াছে তাহাও অপূর্ব্ব। মেনকার বাৎসল্য আমাদিগকে যশোদার বাৎসল্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হইলেও তিনি জীবের একান্ত আপনার—আত্মার আত্মীয়রূপে তিনি কল্পিত। কোথাও তিনি সখা, কোথাও যশোদার স্নেহপুত্তলি, কোথাও প্রণয়ীরূপে তিনি সমস্ত বৃন্দাবনের প্রেম আকর্ষণ করিতেছেন। এই প্রেমধর্ম্মে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত রূপ নাই। তাঁহাকে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ-বেদনার মধ্যে আনিয়া অন্তরঙ্গরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরকে শুধু ভয় ও ভক্তির বস্তু বলিয়া কল্পনা করা হয় নাই বলিয়াই পদাবলীর বাৎসল্যরসের মধ্যে মানুষেরই আনন্দ বেদনার অনুভূতি রূপ পাইয়াছে। আগমনী ও বিজয়া গানের বাৎসল্য-রসও বাঙ্গালীর আনন্দ-বেদনার বহিঃপ্রকাশ। দেবতাকে স্নেহপুত্তলিরূপে কল্পনা বৈষ্ণব পদাবলীতেই সর্ব্বপ্রথম ভাষা পাইয়াছিল। উহাই আগমনী বিজয়া গানের কবিদিগকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

বৈষ্ণব পদাবলীতে মা যশোদা যেমন পুত্রের অদর্শনে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন, আগমনী গানে উমার অদর্শনে মেনকার ব্যাকুলতাও তদ্রূপ। মেনকা বারংবার বলিয়াছেন—

কবে যাবে বল গিরিরাজ আনিতে গৌরী।
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ দেখিতে উমারে হে ॥

তাঁহার "না হেরি তনয়া-মুখ হৃদয় বিদরে"।—এইরূপ ব্যাকুলতা, মর্ম্মস্পর্শী করুণকোমলতা বৈষ্ণব সাহিত্যের বাৎসল্যভাবের কবিতার প্রাণ। আগমনী গানেও ঐরূপ একটা করুণ ভাব এবং ব্যাকুলতাই রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম প্রেমের যথার্থ স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে চায় বলিয়াই মিলনের সুর অপেক্ষা ইহাতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে বিরহের সকরুণ বিলাপধ্বনি। প্রেমাস্পদকে নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে পাইয়াও,

অঞ্চলের নিধি 'পরাণের পরাণ নীলমণি'কে কাছে পাওয়া সত্ত্বেও বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে বিচ্ছেদের আকুল আশঙ্কা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।—

গোপাল নাকি যাবে দূর বনে।
তবে আমি না জীব পরাণে॥
গোপাল যাবে বাথানে,— কি শুনিলাম শ্রবণে,
বাছু মোর নয়ানের তারা।
কোরে থাকিতে কত চমকি চমকি উঠি,
নয়ান-নিমিখে হই হারা॥

আগমনী গানেও দেখা যায়—উৎসুক প্রতীক্ষায় মেনকা কন্যা উমার আগমনের দিন গণিতেছেন। কন্যার সহিত দীর্ঘ এক বৎসর পরে তাঁহার মিলন হইবে এই আশায় তিনি বুক বাঁধিয়া আছেন। তারপর কন্যা গৃহে আসিলে মাতার অফুরন্ত প্রাণঢালা স্নেহ যেন এই কন্যাটিকে চিরদিনের জন্য ঘিরিয়া রাখিতে চায়। মনে মনে তিনি বলেন "যেতে নাহি দিব', বলেন—"ওরে নবমীনিশি, না হইও রে অবসান!"

"তুমি অস্তে গেলে নিশি,
অস্তে যাবে উমাশশী, হিমালয় আঁধার করে।"

কারণ—

গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।

কিন্তু এত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও কন্যাকে তিনি ধরিয়া রাখিতে পারেন না। কন্যার সহিত মিলনের তিনটি দিন স্বপ্নের মত গড়াইয়া যায়। নবমীর নিশি পোহাইয়া দশমীর বিদায় গোধূলি আসে। মেনকার অন্তরে তখন কন্যাবিরহের সকরুণ ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকে।

বৈষ্ণব কবিতায় যেমন বিরহ ও বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া প্রেম সার্থকতামণ্ডিত ও স্বীয় মহিমায় মহিমান্বিত হইয়াছে, আগমনী ও বিজয়া গানেও তেমনি বিরহ ও বিচ্ছেদের মধ্য দিয়াই স্নেহ প্রেম সার্থকতামণ্ডিত হইয়াছে।

বাঙ্গালী চিরদিনই ভাবপ্রবণ। বাঙ্গালীর সেই ভাবপ্রবণতাই আগমনী ও বিজয়া গানে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে

আগমনী ও বিজয়া গানের উৎপত্তির কারণ অনুমান করিতে বেগ পাইতে হয় না। চৈতন্যোত্তর যুগে চণ্ডীপূজা যখন ভক্তিতে স্নিগ্ধ ও রসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত হইয়াছিল। উহাই আগমনী ও বিজয়া গান।

বঙ্গদেশে শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়। শরতের সোনালি কিরণে তখন চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। শিশিরস্নাত শেফালিকাগুলি অরুণালোক-চ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া শুভ্রহাসি ছড়াইতে থাকে। কুন্দশুভ্র মেঘমালা আকাশের ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়ায়। এই নয়নাভিরাম পরিবেশের মধ্যে সানাই ভৈরবীর করুণ সুর বাঙ্গালী নরনারীর মনে বেদনাময়, করুণ এক অনুভূতি জাগায়। এই বেদনাময় অনুভূতিকে কবি আগমনী গানে রূপ দিয়াছেন এবং এই বেদনাময় অনুভূতিতেই আগমনী গানের জন্ম। একটি করুণ রূপক যদিও এই গানের বিষয়বস্তু, তথাপি ইহার মধ্যে যথেষ্ট বাস্তবতার ছাপ রহিয়াছে। রূপকটি এই—ভগবতী যেন বাঙ্গালী ঘরেরই ছোট মেয়ে—থাকেন বহুদূরে কৈলাসে স্বামীগৃহে। বৎসরান্তে তিনদিনের জন্য মাত্র গৃহে আসেন। তিনদিন থাকিয়া দশমীর দিবসে আবার কৈলাসে ফিরিয়া যান। পিতা হিমালয় ও মাতা মেনকার মন ইহাতে তৃপ্তিলাভ করে না। তজ্জন্য মেনকা নানাপ্রকার দুঃখ করেন, কখনও বা গিরিরাজকে ভর্ৎসনা করেন। ইহাই মোটামুটি আগমনী গানের আখ্যান-ভাগ। এই আগমনী গান বাস্তবিকই বাঙ্গলার সদ্যোবিবাহিতা কন্যাদিগের বিচ্ছেদকাতর পিতামাতার হৃদয়তন্ত্রীতে একটা ব্যথার পরশ বুলাইয়া যায়। শরৎশোভায় যখন চারিদিক ঝলমল করিয়া উঠে, তখন স্বতঃই বাঙ্গালী মায়ের মন দূরদেশবাসিনী কন্যার মুখখানি দেখিবার জন্য আকুল হয়। ব্যগ্র প্রতীক্ষায় তিনি কন্যার আগমন-প্রতীক্ষায় দিন গণিতে থাকেন। তাই দেবী ভগবতী যখন বাঙ্গালীর ঘরে পদার্পণ করেন, তখন ইষ্টদেবতাকেই কন্যারূপে ভাবিয়া মায়েরা অফুরন্ত প্রাণঢালা স্নেহ দিয়া যেন ইহাকেই চিরদিনের জন্য ঘিরিয়া রাখিতে চান। কিন্তু পারেন না। মিলনের আনন্দে তিনটি দিন স্বপ্নের মত গড়াইয়া যায়। তারপর আসে বিজয়া দশমী। যখন প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য লইয়া যাওয়া হয়, তখন বাঙ্গালী মায়েরা দেবীকে অশ্রুভরা চোখে বিদায় দেন, যেন নিজ কন্যাকেই পুনরায় স্বামীগৃহে পাঠান হইতেছে। এই করুণ দৃশ্যেই বিজয়াগানের সৃষ্টি

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনই আগমনী ও বিজয়াগানের আদি স্রষ্টা। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন কবি বাঙলা সাহিত্যে উমা ও মেনকাকে লইয়া বাৎসল্যরসের এই অপূর্ব্ব ধারা বহান নাই। শ্যামা সঙ্গীতেরও আদি কবি রামপ্রসাদ। আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতে গিরিরাণীর হৃদয়ে বিজয়ার বিচ্ছেদে যে করুণরসের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, তাহা মানবীয় ভাবের সীমা অতিক্রম করিয়া এক উন্নততর মহিমাময় ভাবরাজ্যে পৌঁছিয়াছে। স্নেহের পুত্তলী, অঞ্চলের নিধি বালিকা কন্যার স্বামীগৃহে যাইবার সময়ের বিচ্ছেদ ও তাহার পুনরাগমন কালের মিলনচিত্রে যে বিচিত্র লৌকিক স্নেহচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অতি মধুর বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত বলিয়াই রামপ্রসাদের আগমনী ও বিজয়াগান ভাবুক ও সাধক উভয় সম্প্রদায়েরই প্রিয় হইয়াছে।

আগমনী গানে কন্যা-বিরহকাতরা মেনকার আক্ষেপ মর্ম্মস্পর্শী হইয়া ফুটিয়াছে। সে বেদনা মাতৃহৃদয়ের করুণ রসের অফুরন্ত উৎস। যেমন—

গিরি, এবার আমার উমা এলে,
আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারও কথা শুনব না।
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই বলে মানব না।
শ্রীকবিরঞ্জনে কয় এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

এইরূপ স্বচ্ছ মধুর ভাবের অসংখ্য আগমনী গান বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

বিজয়ার গান বড় বেশী পাওয়া যায় নাই। আগমনী গানের জনপ্রিয়তা বেশী বলিয়া এবং বিজয়া গানের চর্চ্চার অভাবে বিজয়া গান লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

বাঙলা সাহিত্যের যুগসন্ধিকালে আবির্ভূত কবিদিগের মধ্যে আগমনী ও বিজয়া গানের বিশেষ আদর ছিল। কবিওয়ালা ও পাঁচালীকারগণও আগমনী ও বিজয়া গান রচনা করেন। এবং এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, কবিওয়ালা ও পাঁচালীকারগণ রাধাকৃষ্ণবিষয়ক এবং আগমনী ও বিজয়া গান—উভয়বিধ গীতিকবিতা রচনা করিলেও, আগমনী গান রচনাতে

তাঁহাদের দক্ষতা যতখানি প্রকাশ পাইয়াছিল, বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে তাঁহাদের নিপুণতা ততখানি প্রকাশ পায় নাই।

রামপ্রসাদের আগমনী ও বিজয়া গান বঙ্গের নরনারীর মনে ও প্রাণে বেশ একটা অনুরণন জাগাইয়াছিল, একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে জনসাধারণের মধ্যে আগমনী ও বিজয়া গান বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। জনসাধারণের সমাদর এবং সর্ব্বোপরি এই সকল গানের সহজ সরল ভাবব্যঞ্জনা রাম বসু প্রমুখ কবিওয়ালাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। রাম বসু ভিন্ন এই সকল আগমনী ও বিজয়া গান গোপাল উড়ে, দাশরথি রায়, নিধুবাবু প্রভৃতিকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহারাও আগমনী ও বিজয়া গান রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আগমনী গান রচনায় কবিওয়ালাদিগের মধ্যে রাম বসুর শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। বাঙ্গালীর ঘরের সুখদুঃখের অনুভূতিটুকু রাম বসুর আগমনী গানে বেশ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাম বসুর বিরহ গীতি অপেক্ষা আগমনী গান সৌন্দর্য্যে, ভাবে, সরলতায় ও স্বাভাবিকতায় অনেক বেশী উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অন্যান্য কবিওয়ালা-দিগের 'সখীসংবাদ' অথবা 'বিরহ'গান রাম বসুর ঐ শ্রেণীর গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। কিন্তু আগমনী গানে রাম বসুর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিতভাবে স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

বাঙ্গালী মাতা ও কন্যার বিচ্ছেদ ও মিলনের চিত্রে তিনি এমনই একটি সহজ সরল এবং স্বাভাবিক ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহা সময়ে সময়ে আগমনী গানের আদি কবি রামপ্রসাদকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ আগমনী গানের বিষয়বস্তু দূর দেশবাসিনী কন্যার জন্য বিচ্ছেদবিধুরা মাতার ব্যগ্র, বিষাদাচ্ছন্ন প্রতীক্ষা। কিন্তু রাম বসুর গানে ঐ প্রতীক্ষা বিষাদাচ্ছন্ন নয়। ভবিষ্যৎ মিলনের উজ্জ্বল সুখস্বপ্নে তাহা পরিপূর্ণ।

কবিওয়ালাগণের আগমনী গানে, বিশেষতঃ রাম বসুর গানে বেশ একটা বিশিষ্ট মাধুর্য্য এবং স্বকীয়তা ফুটিয়া উঠিলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে,তাঁহারা রাম প্রসাদ, কমলাকান্ত এবং অন্যান্য শাক্ত পদকর্ত্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

কবিওয়ালা এবং পাঁচালীকারদিগের রচিত আগমনী ও বিজয়া গানই বাঙ্গলার শৈবধর্ম্মের সর্ব্বশেষ সাহিত্যিক নিদর্শন। মণিমাণিক্যের ন্যায় উজ্জ্বল এই সঙ্গীতগুলি।

রামপ্রসাদ সেন

শাক্ত পদাবলীর আদি কবি রামপ্রসাদ সেন। আনুমানিক বাঙ্গলা ১১২৯ সালে, ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত গঙ্গাতীরস্থ কুমারহট্ট বা হালিশহর নামক গ্রামে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইনি ইঁহার রচিত 'বিদ্যাসুন্দর কাব্যে' ইঁহার বংশপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, কবির পিতামহের নাম ছিল রামেশ্বর সেন ও পিতার নাম রামরাম সেন। রাম-প্রসাদের বংশ ছিল শাক্তবংশ। শাক্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া রামপ্রসাদ নিজেও শক্তির উপাসক ছিলেন। ইনি বাল্যকালে পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন, সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতেও কিছুদিন অধ্যয়ন করেন, এবং এক মৌলবীর নিকট কিছুদিন ফার্সী শিক্ষাও করিয়াছিলেন। সুতরাং কবি সংস্কৃত ভাষায় ও ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত ও ফার্সী সাহিত্যের রস আস্বাদন করিয়া তিনি কাব্যানুরাগী হইয়াছিলেন। বাল্যকালেই রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তি উৎসারিত হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি পরমার্থ চিন্তায় রত থাকিতেন এবং স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির সাহায্যে শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্যামা-মায়ের বন্দনা-গান মুখে মুখে রচনা করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেন। বিষয়নিস্পৃহ কবির দিন এমনিভাবে নিশ্চিন্ত আরামেই অতিবাহিত হইতেছিল। ইতিমধ্যে কবির পিতৃবিয়োগ হইল। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সাংসারিক চিন্তায় চাকরী সংগ্রহের জন্য চেষ্টিত হইতে হইল। তিনি কলিকাতায় তাঁহার ভগিনীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সহায়তায় একটি চাকুরী সংগ্রহ করিলেন।

কবিকে এক ধনীর গৃহে হিসাবরক্ষকের কাজ করিতে হইত। কিন্তু ইহাতে কবির কবিত্বস্রোত শুকাইয়া যায় নাই। হিসাব-রক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিয়াও তিনি তাঁহার আরাধ্যা দেবী শ্যামা-মাকে ভুলেন নাই। তাই শ্যামা-মায়ের প্রতি ভক্তির আবেগে প্রায়ই তাঁহার কবিত্বশক্তি উৎসারিত হইত এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তিনি হিসাবের খাতার মধ্যেই গান রচনা করিয়া রাখিতেন।

কবি ধনীর তহবিলদারী ও মুহুরীগিরি করিতেন। কিন্তু তাহা ভুলিয়া একদিন নিজেকে শ্যামা-মায়ের তহবিলদার মনে করিয়া লিখিয়া বসিলেন—

আমায় দে মা তবিলদারী

আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥ ইত্যাদি।

এইরূপ ভক্তির আবেগে উৎসারিত অসংখ্য গানে সেই ধনী মনিবটির হিসাবের খাতাখানি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন তাঁহার এক উপরিতন কর্মচারী উহা লক্ষ্য করিলেন এবং লক্ষ্য করিয়া মনিবের কাছে রামপ্রসাদের নামে নালিশ করিলেন। কিন্তু ইহাতে কবির ভালই হইল। রামপ্রসাদের মনিব তাঁহার কবিত্বশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে মাসিক ৩০৲ টাকা মাসহারা দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইয়া স্বগ্রামে গিয়া কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করিতে বলিলেন। অতঃপর রামপ্রসাদ কুমারহট্টে ফিরিয়া গিয়া নিশ্চিন্তমনে শ্যামা-মায়ের বন্দনায় রত হইয়া সেই বন্দনাচ্ছলে মুখে মুখে অসংখ্য গান রচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, কবি ও জ্ঞানী-গুণীর তিনি সমাদর করিতেন। তাঁহার রাজসভায় বঙ্গসাহিত্যের অমর কবি ভারতচন্দ্র সমাদৃত হইয়াছিলেন—তাঁহারই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যাদি রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের লালিত্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার কুমারহট্টে আসিয়া রামপ্রসাদের ভগবদ্‌ভক্তিমূলক গান শুনিয়া সবিশেষ মুগ্ধ হন এবং কবিত্বের পুরস্কার স্বরূপ রামপ্রসাদকে কবিরঞ্জন উপাধি দান করেন এবং একশত বিঘা নিষ্কর জমি উপহার দেন। কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে রামপ্রসাদ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্য, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, শিবকীর্ত্তন প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদের যশ ঐ সকল কাব্যরচনার জন্য নহে। তাঁহার যশ সঙ্গীত রচনার জন্য। তিনি ভক্ত সাধক ও প্রকৃত কবি ছিলেন। তাই তাঁহার দ্বারা ফরমায়েসী আদিরসপ্রধান বিদ্যাসুন্দর কাব্য অথবা অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি তেমন সুরচিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার গানগুলি অতুলনীয়। কারণ সেগুলি তাঁহার প্রাণের অন্তস্থল হইতে উৎসারিত। রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের তুলনায় বিদ্যাসুন্দর রচনায় খাটো হইলেও, তিনি তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নানা ছন্দ, যমক, অনুপ্রাস এবং অন্যান্য অলঙ্কার প্রয়োগে ও কবিত্ব-প্রকাশে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

রামপ্রসাদ আজীবন ধর্মানুরাগী ছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল ভক্তিময়। তাঁহার ভক্তির আবেগ গানের আকারে উৎসারিত হইত। মানস-চক্ষুতে তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার আরাধ্যা দেবী শ্যামা-মাকে দেখিতেন এবং সেই সাক্ষাৎকারের আনন্দ গানের আকারে অভিব্যক্ত হইত।

রামপ্রসাদী সঙ্গীতের বিশেষত্ব ও মাধুর্য্য উহাদের সুরের মনোহারিত্বে ও ভক্তির ঐকান্তিকতায়। তাঁহার গানে প্রাণের সহজ কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। কবির আরাধ্যা দেবী কালী তাঁহার গানে স্নেহময়ী মাতার ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছেন। কবি কেবল সম্ভ্রমভরে মায়ের বন্দনা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। সরল শিশু যেমন তাহার মাতার সহিত ভক্তিমিশ্রিত ভাব লইয়া আদর-আবদার প্রকাশ করে, রামপ্রসাদের গানে সেইরূপ সরলতা প্রকাশিত। তাঁহার গানে দেখা যায় যে, কখনও তিনি তাঁহার আরাধ্যা দেবী শ্যামা-মায়ের সহিত কলহ করিতেছেন, কখনও আব্দারে ছেলের মত মাকে গালি দিতেছেন। কিন্তু সেই গুলি কপট, স্নেহ ভক্তি ও আত্ম-সমর্পণের কথায় পরিপূর্ণ। রামপ্রসাদী সঙ্গীত এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তি ও ভালবাসার সংমিশ্রণে সৃষ্ট বলিয়া উহার মাধুর্য্য বাঙ্গালীমাত্রকেই মুগ্ধ করিয়াছে। কবির গানে আরাধ্য ও আরাধকের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক—সম্ভ্রমপূর্ণ ভালবাসার সম্পর্ক ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া তাঁহার গানের মাধুর্য্যে বাঙ্গালী মুগ্ধ। কারণ বাঙ্গালীও যে ঐ ভাবের ভাবুক! বাঙ্গালী জগজ্জননীকে কেবল দেবীরূপে ভক্তি করিয়া তৃপ্ত নহে। জগজ্জননীকে স্নেহময়ী জননীরূপে কল্পনা করিতে বাঙ্গালী অভ্যস্ত।

রামপ্রসাদের গানে উদার আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জাঁকজমকের সহিত পূজা করার বিরোধী ছিলেন। মূর্ত্তিপূজার অসারতাও তিনি উপলব্ধি করিয়া গাহিয়াছিলেন—

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বস্‌রে ধ্যানে॥
জাঁকজমকে কর্‌লে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তারে কর্‌বে পূজা জান্‌বে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু-পাষাণ মাটি মূর্ত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে॥
আলো চাল আর পাকা-কলা কাজ কি রে তোর সে আয়োজনে।
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে তৃপ্ত কর আপন মনে॥

ঝাড়-লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে রোসনাইয়ে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে, দাও না জ্বলুক নিশি-দিনে॥
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী, জয় কালী বলে, দেও বলি ষড়রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল, কাজ কিরে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলি' দেও করতালি,
মন রাখো সেই শ্রীচরণে॥

মূর্ত্তিপূজার অসারতা ব্যক্ত করিয়া এবং জগতের সকল সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে তিনি তাঁহার আরাধ্যা দেবী-মূর্ত্তির রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না?
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না!
ওরে ত্রিভুবন সে মায়ের মূর্ত্তি।
জেনেও কি তাই জান না!
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটির মূর্ত্তি,
গড়িয়ে করিস উপাসনা!

অন্যত্র—

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা,
দিয়ে কত রত্ন সোনা,
ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস তাঁয়
দিয়ে ছার ডাকের গহনা!

কবির মন যে সকল প্রকার সংস্কারের কত উর্দ্ধে ছিল তাহা উল্লিখিত গানগুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তিনি বিশ্বজগতের পালনকর্ত্রী অন্নদাত্রীকে নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়া অর্চ্চনা করার অসারতা ব্যক্ত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা;
ওরে, কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয়,
আলোচাল আর বুট-ভিজানা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা,
পশুপক্ষী কীট নানা;

ওরে, কেমনে দিতে চাস বলি,
মেষ-মহিষ আর ছাগলছানা ॥

তীর্থ-ভ্রমণের নিরর্থকতা ব্যক্ত করিয়া তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"কি কাজ রে মন যেয়ে কাশী"—"মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী" এবং তিনি মনে করেন যে, "নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র হেঁটে"।

রামপ্রসাদের আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতে বিচ্ছেদকাতরা জননীদিগের হৃদয়ে যে করুণরসের অফুরন্ত উৎস উঠে তাহাই অভিব্যক্ত। বাঙ্গালীর ঘরের স্নেহের পুত্তলী, অঞ্চলের নিধি বালিকা-কন্যার স্বামীগৃহ গমনকালের বিচ্ছেদ-দুঃখ এবং পিতৃগৃহে তাহার পুনরাগমনকালের মিলনচিত্রে যে বিচিত্র স্নেহচ্ছবি ফুটিয়া উঠে, তাহা অতি মধুর বাৎসল্য-রসে অভিষিক্ত হইয়া রামপ্রসাদী আগমনী ও বিজয়া গানে প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্য রামপ্রসাদী আগমনী গান এবং বিজয়া গান ভাবুক ও সাধক সকলের কাছেই প্রিয় হইয়াছে।

কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র

ভারতচন্দ্র প্রাচীন যুগের শেষভাগের কবি। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যত কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রতিভার দীপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইঁহার খণ্ডকবিতা ও কাব্যসমূহের শব্দবৈভব ও ছন্দ অপূর্ব্ব। শব্দবিন্যাসে, ভাবপ্রকাশে ও ছন্দ-সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কোনও কবি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আবির্ভূত হন নাই। তিনি প্রথম শ্রেণীর কবি-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা জীবন্ত ও সুন্দর।

ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদেরই সমকালের কবি। হাবড়া আমতার নিকটে পেঁড়ো বসন্তপুর নামে এক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ঐ স্থানের জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের আসল পদবী মুখোপাধ্যায়। ভারতচন্দ্র তাঁহার পিতার চতুর্থ পুত্র। ভারতচন্দ্রের শৈশব-কালে তাঁহার পিতার সহিত বর্দ্ধমানের রাণীর বিবাদ হয়। ফলে নরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহার জমিদারী হারাইয়া তাঁহার শ্বশুরালয়ে গিয়া আশ্রয় লন। অতঃপর ভারতচন্দ্র তাঁহার মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হইতে থাকেন। সেখানে থাকিয়া তিনি সংস্কৃত, ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া অল্প বয়সেই পণ্ডিত হইয়া উঠেন। ইহার কিছুদিন পরে ভারতচন্দ্রের পিতা পুনরায় তাঁহাদের স্বগ্রামে ফিরিয়া যান। ইতিমধ্যে ভারতচন্দ্রের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদে দুঃখিত হইয়া কবি হুগলীর নিকটে দেবানন্দপুরে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। দেবানন্দপুরের মুন্‌সিবাবু সমাদরের সহিত ভারতচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়া তাঁহার বাড়ীতে রাখেন। এই মুন্‌সি বাড়ীতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার বিকাশ হয়। এই স্থানেই তিনি উত্তমরূপে ফার্সী শিক্ষা করেন।

একদা মুন্‌সি বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা হইল। ব্রতকথার পুঁথি পড়িবার ভার দেওয়া হইল ব্রাহ্মণ ভারতচন্দ্রের উপর। কিন্তু তিনি গোপনে স্বয়ং এক পাঁচালী রচনা করিয়া সেই দিন পাঠ করিলেন। কিন্তু পাঁচালীর শেষে ভারতচন্দ্রের ভণিতা শ্রবণ করিয়া সকলে তাঁহার কবিপ্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিমুগ্ধ হইয়া গেল। ভারতচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র ১৫ বৎসর।

ভারতচন্দ্র ফার্সী পড়িয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন জানিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বর্দ্ধমানে ফিরিয়া গিয়া জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সেই সময়ে ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানাধিপতির কতকগুলি অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিলে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি কারাধ্যক্ষের অনুগ্রহে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বঙ্গদেশের সীমা ত্যাগ করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং সেখানে পুরীর রাজা শিবভট্টের আশ্রয়ে কিছুদিন থাকেন। পরে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া বৈষ্ণবদের দলে মিলিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলে তাঁহার শ্যালীপতি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া নিজের আশ্রয়ে লইয়া যান।

যে কবি এতদিন জীবনস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন, এই সময়ে তাঁহার জীবনে আলোকরেখা দেখা দিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবিত্বরস-পিপাসু ছিলেন। তিনি কবি ও গুণীর বিশেষ সম্মান করিতেন—তাঁহাদিগকে ভালরকম বৃত্তি প্রভৃতি দিয়া নিজ রাজ্য-মধ্যে আশ্রয় দিতেন। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইলেন, এবং কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সভাকবি নিযুক্ত করিলেন। রাজসরকার হইতে মাসিক বৃত্তি পাইয়া তাঁহার অবস্থা ভাল হইল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরে গিয়া একখানি কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

কাব্যখানির নাম 'কালিকামঙ্গল'। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত ছিলেন। তাঁহারই সন্তোষের জন্য, তাঁহারই ইচ্ছামত কবি এই কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে কালিকামাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। গীতিকাব্য রচনায় ভারতচন্দ্রের এই প্রথম উদ্যম। উত্তরকালে যখন ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেরই আদেশে তাঁহার অমর কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেন তখন এই 'কালিকামঙ্গল' কাটিয়া-ছাঁটিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া অন্নদামঙ্গলের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের আখ্যানরূপে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন।

কালিকামঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যদুইখানি শ্রবণ করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের কবিত্বে এত চমৎকৃত ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে কবিগুণাকর উপাধি দিয়া ভূষিত করেন।

কবিগুণাকরের অন্নদামঙ্গল তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"রাজসভাকবি রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি

তাহার কারুকার্য্য।" অন্নদামঙ্গল কাব্যখানিতে দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যকীর্ত্তন হইয়াছে এবং উহাতে প্রসঙ্গক্রমে কবি তাঁহার আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের শেষ কীর্ত্তি ও তাঁহার ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জীবনের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে মঙ্গল-কাব্যের অনুরূপ দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণ ইত্যাদির বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দর। যে বিদ্যাসুন্দর রচনার জন্য ভারতচন্দ্রের যশ এককালে সমগ্র বাঙ্গলাদেশে ছাইয়া গিয়াছিল, সেই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অন্নদামঙ্গল কাব্যেরই একটী অঙ্গ। এককালে ভারতচন্দ্রের এই বিদ্যাসুন্দর যাত্রা প্রভৃতিতে গীত হইত। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বঙ্গসাহিত্যে আরও অনেক কবি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ সেনও বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের-উপাখ্যান এত বিখ্যাত যে, বাঙ্গলায় ভারতচন্দ্র ভিন্ন অন্যের রচিত বিদ্যাসুন্দর যে আছে সে সংবাদই অনেকে রাখেন না। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান আদিরস-প্রধান। সেইজন্য অনেকে ইহা পছন্দ করেন না। কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে যে, ইহার উপাখ্যানভাগে চরিত্রচিত্রণ সুন্দর হইয়াছে, আর পাণ্ডিত্যের প্রভায় বইখানি উজ্জ্বল হইয়াছে। বইখানি পাঠ করিতে করিতে বহু সংস্কৃত কবির কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। বহু সংস্কৃত কাব্য হইতে উৎকৃষ্ট ছন্দ ও বর্ণনা এই কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় ভাগের নাম 'মানসিংহ'। এই অংশে মানসিংহের যশোহর বিজয় ও ভবানন্দ মজুমদারের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

ছন্দের বৈচিত্র্য ও শব্দৈশ্বর্য্যে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রত্নমালার মত উজ্জ্বল। ইহার আদ্যোপান্তই যেন মাজা-ঘষা ও পরিষ্কার-করা। পংক্তিগুলি যেন সমস্থূল মুক্তামালা। ভারতচন্দ্র এই কাব্যখানি রচনা করিতে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক কবির কাব্য হইতে মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে তিনি উপকরণ লইয়াছেন, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কবির অলৌকিক প্রতিভাবলে অন্নদা-মঙ্গল এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে কবির অসামান্য কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। অন্নদামঙ্গলে ছোট ছোট ঘটনাগুলিও কবির অসামান্য

প্রতিভার আলোকসম্পাতে হীরকখণ্ডের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট চরিত্রাঙ্কনেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যেকটি চরিত্র আপন আপন বিশিষ্টতায় মনোহর। অন্নদামঙ্গলে কবির চরিত্রসৃষ্টি ও পরিহাসরসিকতা অপূর্ব্ব। চণ্ডীমঙ্গলে কবিকঙ্কণ যেমন দারিদ্র্য-দুঃখ বর্ণনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, অন্নদামঙ্গলেও ভারতচন্দ্র তেমনিই দক্ষতার সহিত দারিদ্র্যদুঃখের একটি পরিষ্কার চিত্র আঁকিয়াছেন। অনেক বিষয়ে কবিকঙ্কণের চণ্ডী অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য উৎকৃষ্ট। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু-ব্যাধের নিকটে ভগবতী ছলে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু অন্নদামঙ্গলে ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে যাইবার সময়ে ঈশ্বরী পাটনীর সমীপে অন্নপূর্ণার পরিচয় দান তদপেক্ষা অনেক বিশদ ও অনেক মনোরম হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, ছন্দপ্রয়োগনৈপুণ্যে ও শব্দৈশ্বর্য্যে ভারতচন্দ্রের সহিত কবিকঙ্কণের তুলনাই হয় না। এই দুই বিষয়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য অনেক উৎকৃষ্ট। সেইজন্য বলা হয় যে, ভারতচন্দ্র প্রাচীনযুগের বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি।

ভারতচন্দ্রের কবিতার মাধুর্য্য—শব্দ-প্রয়োগে তাঁহার অসাধারণ নিপুণতায়, বিচিত্র ছন্দব্যবহারে ও অসামান্য পাণ্ডিত্যে। তাঁহার কবিতায় চমৎকার চমৎকার উপমা দেখা যায়। তিনি উৎকৃষ্ট শব্দ-কবি। শ্রুতিসুখকর শব্দের পসরা সাজাইয়া তিনি তাঁহার কাব্য ও কবিতাবলীকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের অনুপ্রাস মাধুর্য্যমণ্ডিত। নিম্নে কবিগুণাকরের দুইটি পদ উদ্ধৃত হইল, প্রত্যেকটিতে অনুপ্রাসের ঘটা ও শব্দবিন্যাস অপূর্ব্ব।

কল কোকিল, অলিকুল বকুল-ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে॥
কমল পরিমল, লয়ে শীতল জল, পবনে ঢলঢল উছলে কূলে;
বসন্ত রাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী, করিলা রাজধানী অশোক-মূলে॥
কুসুমে পুনঃপুনঃ, ভ্রমর গুনগুন, মদন দিলা গুণ ধনুক-হুলে।
যতেক উপবন, কুসুম সুশোভন, মধু-মুদিত-মন ভারত ভুলে॥—অন্নদামঙ্গল

জয় কৃষ্ণ-কেশব রাম রাঘব
কংসদানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন নন্দ-নন্দন
কুঞ্জকানন রঞ্জন॥

জয় কেশিমর্দ্দন কৈটভার্দ্দন
গোপিকাগণমোহন।
জয় গোপবালক বৎসপালক
পূতনা-বক-নাশন ॥—অন্নদামঙ্গল

এই সকল বর্ণনার শব্দমন্ত্র এমনই মনোমুগ্ধকর যে, উহা যেন সঙ্গীতের ন্যায় কর্ণে সুধাবর্ষণ করে, শব্দের ঘাত-প্রতিঘাতে এই সকল অংশে চমৎকার একটা ঝঙ্কার যেন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ শেষোক্ত পদটিতে সংস্কৃত ও বাঙ্গলার যেন হরগৌরী মিলন হইয়া গিয়াছে। চৈতন্য-জীবনী রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ আর শ্যামাসঙ্গীত ও আগমনী গানের আদি কবি রামপ্রসাদ তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গলার মিলন ঘটাইতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের ক্ষমতা এবং পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ—ঐ দুইজন কবি অপেক্ষাও অধিক। তাই তিনি তাঁহার কাব্যের অনেক স্থলেই অনায়াসে সংস্কৃত ও বাঙ্গলার মিলন ঘটাইয়াছেন। সেই মিলন এত সুন্দর ও সার্থক হইয়াছে যে, তাহাতে কবির কাব্যের চমৎকারিত্ব বাড়িয়া গিয়াছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের অনেকস্থানে কেবল ছন্দ ও শব্দের মাধুর্য্যে এক একটি মূর্ত্তি নিখুঁতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন,—

মহারুদ্র-রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল-টলট্টল-কলক্কল-তরঙ্গা॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণীফণ্ণ গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলম্মল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা।
কটিকট্ট সদ্যোমরা হস্তী-ছালা॥
পচাচর্ম্ম ঝুলি করে লোল ঝুলে।
মহা ঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে॥

থিয়া তাথিয়া তাথিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচ পিশাচে॥

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে, অরে দক্ষ, দে রে সতীরে॥

ইহা মহাদেবের ভৈরব-মূর্ত্তির বর্ণনা।

ভারতচন্দ্র অসাধারণ ছন্দশিল্পী ছিলেন। তিনি অসংখ্য সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গলায় প্রবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের ছন্দভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভুজঙ্গপ্রয়াত, তোটক, তূণক, কত সংস্কৃত ছন্দ যে উহাদের লালিত্য ও মাধুর্য্য লইয়া বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া বঙ্গবাণীর অঙ্গরাগ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব ও ছন্দ রচনায় শক্তি তাঁহার নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় ও অমর করিয়া রাখিয়াছে।

যুগসন্ধিকালের কাব্য

কবিওয়ালা পাঁচালীকার ও টপ্পা-রচয়িতাগণ

বাঙ্গলার প্রাচীন কাব্য সাহিত্য আর আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদিগের গান, পাঁচালী গান ও টপ্পা গান রচিত হইয়াছিল। এই যুগটিকে বলা হয়—বাঙ্গলা সাহিত্যের যুগসন্ধিকাল। বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের ইহা এক অন্ধকারময় যুগ। এই যুগ হইতেছে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের পরে এবং মধুসূদনের পূর্ব্বে। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আবির্ভাব মধুসূদনের পূর্ব্বে হইয়াছিল এবং তাঁহার কবিতায় আধুনিকতার উপকরণ যথেষ্ট ছিল। তথাপি ভারতচন্দ্রীয় যুগের যমকানুপ্রাসের বাহুল্য থাকার দরুণ এবং কবিওয়ালাদিগের প্রভাব তাঁহার উপর অল্পবিস্তর বর্ত্তমান থাকার দরুণ তাঁহাকেও এই যুগসন্ধিকালের কবি হিসাবেই ধরা সমীচীন।

ভারতচন্দ্রের তিরোধান হয় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার মৃত্যুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদনের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত চিরন্তন বা শাশ্বত কোন সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিয়াছেন এমন কোন প্রতিভাবান্ কবির আবির্ভাব বঙ্গদেশে হয় নাই।

বাঙ্গলা সাহিত্যের এই যুগসন্ধিকালেও গীতি-কবিতা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এ যুগের গীতিকবিতার অধিকাংশেরই মধ্যে একটা লঘুতা আছে। এ যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তীকালের কবিতায় সেরূপ লঘুতা লক্ষিত হয় না। এই যুগের কবিতার ভাষা ও রাগিণী যেন একটু কৃত্রিম। ছন্দ এবং নৈপুণ্যের যেন বেশ একটু অভাব। এই যুগসন্ধিকালে আবির্ভূত কবিদিগের অনেক গানের ভাষায় এবং কল্পনায় নৈপুণ্য যদি বা কোথাও কোথাও আছে, কিন্তু প্রকৃত কবিত্ব নাই। Fancy আছে imagination নাই, wit আছে humour নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ যুগের এক একটি গান এক একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, আর প্রত্যেকটির ভিতর একটি সহজ সম্পূর্ণতা আছে।

এই যুগসন্ধিকালের কবিদের মধ্যে সত্যকারের কবিত্বের অভাব ছিল। কিন্তু সত্যকারের লিরিক বলিতে যাহা বুঝায়, বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহারা

তাহা দিয়া গিয়াছেন। সত্যকারের লিরিক—গানের মত যাহা প্রাণের অন্তস্থল হইতে স্বতঃ উৎসারিত—যাহা নিতান্ত মনের কথা, একজনের উদ্দেশ্যে আর একজনের মনের কথা—এমনি লিরিক যুগসন্ধিকালের অনেক কবিই রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল কবিতা বিস্মৃতপ্রায়। কল্পনা ও কবিত্বের অভিনবত্ব এ যুগের অধিকাংশ কবিতার মধ্যে না থাকিলেও, কোন কোন কবিতার মধ্যে যে তাহা ছিল একথা অনস্বীকার্য্য।

কবির গান রচয়িতাগণের গানের বিষয় ছিল প্রেম ও সামাজিক বিষয়সমূহ। প্রথম প্রথম ইঁহারা বৈষ্ণব যুগ হইতে প্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীতি গান করিতেন। কিন্তু ইহাতে বৈষ্ণব কবিতার অনাবিল ভক্তি বা আবেগ, কবিত্ব বা মাধুর্য্য থাকিত না। ক্রমে সামাজিক বিষয় লইয়া ইঁহারা গান বাঁধিতে থাকেন। বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে—রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা লইয়া যখন কবির দল গান বাঁধিতেন তখন সে সকল গান বৈষ্ণব কবিতার মত অনির্ব্বচনীয় না হইলেও, উহা বেশ একটা উচ্চগ্রামে গিয়া পৌঁছিত। কিন্তু যখন সামাজিক বিষয়াদি লইয়া কবির গান বাঁধা হইতে থাকে, তখন ইঁহাদের সঙ্গীতের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল—অশ্লীলতা, কৃত্রিমতা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইয়াছিল। যেখানে কবির গান রচয়িতাগণ প্রাচীন গীতিকবিতারই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন সেখানে তাঁহাদের গানে একটা মধুর সুর বাজিয়াছে। কিন্তু সামাজিক বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া কবিদিগের কবিত্ব বা কল্পনা সকলই বিসর্জ্জিত হইয়াছে, দুর্গত হইয়াছে। আগমনী ও শ্যামাসঙ্গীতের অনুসরণেও কবির গান রচিত হইয়াছিল। কবিওয়ালাগণ সখীসংবাদ ও বিরহ সম্বন্ধীয় বহু গান বাঁধিয়া গিয়াছেন।

কবির গান রচয়িতাদিগকে 'দাড়াকবি' এই আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর কবির দল আসরে দাঁড়াইয়া মুখে মুখে গান বাঁধিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতেন বলিয়াই এই নামে তাঁহারা আখ্যাত হইয়াছেন।

কবির গান রচয়িতাদিগের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—রাসু ও নৃসিংহ, রঘুনাথ দাস, গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভবানীচরণ বণিক, রাম বসু, ভোলা ময়রা, নীলু ও রামপ্রসাদ ঠাকুর, আণ্টনী ফিরিঙ্গি, শ্রীধর কথক প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী কবি ছিলেন রাম বসু।

রাম বসু অনেক কবির দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। ইনিই 'কবির লড়াই' বা আসরে দাঁড়াইয়া গানে প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর দিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। রাম বসুর গানগুলি সরল ভাষায় প্রাণের কথা দিয়া লেখা। তাঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমগীতিগুলি সত্যই প্রশংসার যোগ্য। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রাম বসুর কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাংলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু।" বাস্তবিক তাঁহার গানে এমন একটা সুর বাজিয়াছে যাহা আমাদের প্রাণে ও মনে একটা অনুরণন জাগাইতে সমর্থ। রাম বসু বিরহ বর্ণনায় ওস্তাদ কবি ছিলেন। তাঁহার—

কোকিল! কর এই উপকার—
যাও নাথের নিকটে একবার,
ব্যথায় ব্যথিত হও তুমি আমার।
নিঠুর নাগর আছে যথায়
পঞ্চস্বরে গান শুনাও গে তায়—
শুনে তব ধ্বনি বলিয়ে দুঃখিনী
অবশ্য মনে হইবে তার।
হায়, যে দেশে আমার প্রাণনাথ,
কোকিল বুঝি নাই সেই দেশে?
তা যদি থাকিত তবে সে আসিত
বসন্ত সময়ে নিবাসে॥

এই বিরহগীতিটির মধ্যে বিরহিণীর যে অন্তর্বেদনা ফুটিয়াছে তাহা আমাদের মনকে স্পর্শ করে।

রাম বসুর রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদেও একটা অনির্ব্বচনীয়তা ফুটিয়াছে। রাধা জলে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের রূপ নির্নিমেষ নয়নে দেখিতেছেন। পাছে তাঁহার সেই তন্ময়তা সখীগণ জলে ঢেউ তুলিয়া নষ্ট করেন সেই আশঙ্কায় তিনি ব্যাকুল। এই ব্যাকুলতা রাম বসু অতি অল্প কথায় অত্যন্ত স্পষ্ট এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।—

ঢেউ দিয়োনা এ জলে
বলে কিশোরী—
দরশনে দাগা দিলে
হবে পাতকী!

রাধিকার যে স্নিগ্ধ চিত্রটি এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অতুলনীয়।

পাঁচালী গানের উদ্ভব কীর্ত্তন গান হইতে। উনবিংশ শতকের প্রথমে কীর্ত্তনের পদ্ধতিতে কৃষ্ণলীলাত্মক পাঁচালী গান লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন মধুসূদন কিন্নর ও রূপচাঁদ অধিকারী। পাঁচালীর পালা বাঁধা থাকিত এবং কীর্ত্তনের মতই ব্রজলীলা বিষয়ক হইত। পাঁচালীর সহিত কীর্ত্তনের তফাৎ হইতেছে এই যে, ইহাতে গায়ক অঙ্গভঙ্গী করিতেন, কখনও পাত্র-পাত্রীর সাজ সাজিতেন; মধ্যে মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিতেন। কীর্ত্তনের সুরের মধ্যে যে বিশুদ্ধি, পাঁচালীর গানের ঢঙে সে বিশুদ্ধি ছিল না। ইহাতে খেমটা ও কবিওয়ালাদিগের প্রভাবও পড়িয়াছিল। পাঁচালী গান তানপুরা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা প্রভৃতির সাহায্যে গীত হইত। ইহাতে কোন কোন সময়ে কবি গানের লড়াইয়ের মত দুই দল থাকিত, তবে কবির লড়াইয়ের খেউড় হইত না। এই পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব হয়। তবে যাত্রার সঙ্গে পাঁচালীর পার্থক্য এই যে, পাঁচালীতে মূল গায়ক বা পাত্র একটি। কিন্তু যাত্রায় একাধিক পাত্র-পাত্রী ও গায়ক গায়িকা থাকে।

দাশরথি রায় বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকার। দাশরথি রায় কবির দলেও গান বাঁধিয়া দিতেন—তাঁহার মধ্যে কবিত্বশক্তি ছিল। তিনি ৬০-টিরও অধিক পাঁচালীর পালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। দাশু রায়ের ছড়া ও পাঁচালী এককালে লোকে অত্যন্ত আগ্রহ ও সমাদর করিয়া শুনিত। তিনি শ্যামাসঙ্গীত ও বৈষ্ণবসঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই শ্রেণীর কবিতার অনেকগুলিতেই কবিত্ব, আন্তরিকতা, ভাবমাধুর্য্য ও আবেগ আছে।

দাশরথি রায়ের কবিতা অনুপ্রাসবহুল। তাঁহার শব্দচাতুর্য্য ছিল অসাধারণ, এবং রসিকতামিশ্রিত ব্যঙ্গরচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি উপমার মালা গাঁথিয়া শ্রোতাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিতেন। কিন্তু অনুপ্রাসবহুল শব্দের বাঁধুনি ও বিদ্রূপ করিবার নিপুণতা তাঁহার কবিতায় থাকিলেও বিষয় ও চরিত্রবর্ণনার কৌশল তাহাতে বিশেষ পাওয়া যায় না। দাশরথি রায়ের লেখনী ছিল ক্ষিপ্র ও অবিশ্রান্ত। তাঁহার রচনার অনেক স্থলেই অশ্লীলতার ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত একটা ইঙ্গিত দেখা যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, এই যুগসন্ধিকালে আবির্ভূত কবিদিগের মধ্যে আদিরসাশ্রিত রসিকতা করাই ছিল রীতি। কবির গান ও পাঁচালী গানের শ্রোতা ইতর-ভদ্র মিলিয়া যাইত—সাধারণ লোকের রুচি সেকালে তেমন মার্জ্জিত ও

উন্নত ছিল না। তাই এ যুগের কবির গানে যেমন অশ্লীলতা স্পর্শ করিয়াছে, পাঁচালী গানেও তদ্রূপ অশ্লীলতা স্পর্শ করিয়াছে। সে যুগের জনসমাজ স্থূল কাব্যরস আস্বাদনেই পরিতৃপ্ত হইতেন, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ বা সূক্ষ্ম সৃষ্টির মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। তাই কবিগণও অশ্লীলতা-দুষ্ট স্থূল কাব্যরস পরিবেশন করিয়া জনসাধারণের মনস্তুষ্টি করিয়াছিলেন। কবির গানে এবং পাঁচালী গানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই স্থূল কাব্যরসই উৎসারিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে কোন কোন গানে অবশ্য বেশ উঁচু সুরে বাঁধা বীণার ঝঙ্কার ঝঙ্কৃত হইয়াছে, এই পর্য্যন্ত।

কবির গান ও পাঁচালী গান রচনার যুগেই টপ্পা গান রচিত হইয়াছিল। টপ্পা গান হিন্দী খেয়ালের অনুকরণে রচিত ললিত পদবহুল প্রণয়-সঙ্গীত। এই শ্রেণীর গান বিশেষ সুরে লয়ে ও ঢঙে গাওয়া হয়। ইহা বৈঠকী গান। বাঙ্গলা টপ্পা গানের প্রবর্ত্তক রামনিধি গুপ্ত—ইনি নিধুবাবু নামে বিখ্যাত এবং নিধুবাবুর টপ্পা বঙ্গদেশে বিশেষ বিখ্যাত। টপ্পা রচয়িতা হিসাবে নিধুবাবুর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই যুগসন্ধিকালের বঙ্গসাহিত্যে যে সকল কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন—অর্থাৎ সমস্ত কবির গান রচয়িতা অথবা পাঁচালীকারদিগের মধ্যে রামনিধি গুপ্তের স্থানই সর্ব্বোচ্চে।

রামনিধি গুপ্তের টপ্পাসমূহ প্রণয়-সঙ্গীত। মধ্যযুগের পদাবলী রচয়িতা-গণও প্রণয়-সঙ্গীত শুনাইয়া গিয়াছেন, কবির গান রচয়িতাগণও প্রণয়-সঙ্গীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে সকলের অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়গীতি। রামনিধি গুপ্তই সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করেন যে—

> "এই প্রেমগীতি হার
> গাঁথা হয় নরনারী মিলন-মেলায়,
> কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।"

সাধারণ নরনারীর মিলন-বিরহ, অনুরাগ-সোহাগ লইয়া গান রচনা করিয়া নিধুবাবু প্রকৃত গীতিকবিতা রচনার পথ প্রদর্শন করিয়া যান। তাঁহার টপ্পার সুরই উহার প্রাণস্বরূপ। সুর ব্যতীত কেবল কথায় তাঁহার গানের সৌন্দর্য্য সম্যক উপলব্ধি হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বরচিত গানের সম্বন্ধে একবার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার একশ্রেণীর গান আছে যেখানে সুরটাই

প্রধান, কথা নয়। সেই শ্রেণীর গানে সুর না থাকিলে তাহা নেভানো প্রদীপের মত। একথা নিধুবাবুর টপ্পা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সুর না থাকিলে নিধুবাবুর টপ্পাও নেভানো প্রদীপের মত দ্যুতিহীন।

তথাপি তাঁহার রচনার মধ্যে কবিত্ব, মনস্তত্ত্ব আর আন্তরিকতা এমন আছে যে, কেবল কবিতা হিসাবে তাহাদের রসাস্বাদন করিয়াও তাহাদের মূল্য যে কত তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না।

রামনিধি গুপ্ত কর্ত্তৃক রচিত নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় প্রিয়দর্শনের আনন্দ ব্যক্ত হইয়াছে—

যবে তারে দেখি, অনিমেষ আঁখি
হয় লো তখনি।
সুখে অচেতন হয় মোর মন,
শুন লো সজনী।
তৃষিত চাতকী যেন
নিরখিয়ে নবঘন—
বিনা বারি পানে কত সুখী মনে
কে জানে না জানি!

আবার কোথাও বা তদ্গতচিত্তার বিরহ অতি অল্প কথায় প্রকাশ পাইয়াছে—

সখি, সে কি তা জানে—
আমি যে কাতরা তারি
বিরহবাণে?
নয়নের বারি নয়নে নিবারি
পাসরিতে নারি
সেই জনে;
এখনও রয়েছে প্রাণ
তাহারি ধ্যানে।

রামনিধি গুপ্ত প্রণয়-সঙ্গীত ভিন্ন স্বদেশ ও মাতৃভাষা সম্বন্ধেও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "নানান্ দেশের নানান্ ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা!" কবিতাটি এই শ্রেণীর কবিতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

মোটামুটিভাবে যুগসন্ধিকালে আবির্ভূত কবিদিগের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইল। এই যুগের কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য অথবা ভাবের উচ্চতা পাওয়া যাইবে না। কারণ ইঁহাদের সকলেই জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিবার ভার লইয়া ছন্দ ও ভাষার নৈপুণ্য বিসর্জ্জন দিয়া কেবল সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুটা অলঙ্কার লইয়া কাজ সারিয়াছেন। ভাবের উৎকর্ষও ইঁহাদের কবিতায় সর্ব্বত্র লক্ষিত হয় না। এ যুগের সমাজ যেরূপ ছিল, ইহার সাহিত্যও তদ্রূপ হইয়াছে। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আস্বাদন করিবার অবসর বা যোগ্যতা অতি অল্প লোকের ছিল। তখনকার সমাজ সাহিত্যরস সম্ভোগ করিতে চাহিত না। তাহারা দুই দণ্ডের উত্তেজনা চাহিত। সুতরাং এ যুগের গানগুলিও ক্ষণিক উত্তেজনার রসদ জোগাইতে উপস্থিতমত রচিত। উচ্চাঙ্গের কাব্যরস উহাদের মধ্য দিয়া উৎসারিত হয় নাই।

তথাপি এই কবির গান, পাঁচালী গান এবং টপ্পা গান বাঙ্গলা সাহিত্যে বিশেষ একটি স্থান অধিকার করিয়াছে। কারণ ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য-সৃষ্টি কেবলমাত্র রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই সময় হইতে জনসাধারণ সাহিত্যরসের প্রতি উন্মুখ হইয়া উঠিল এবং জনসাধারণকে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্বুদ্ধ করেন এই যুগের কবিবৃন্দ। জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে উত্তরকালের সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা হইবে এ আভাষ এই যুগসন্ধিকালের সাহিত্য আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বাঙ্গলাসাহিত্যকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—প্রাচীন যুগ ও আধুনিক যুগ। প্রাচীনযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র, আর আধুনিক যুগের প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এই প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সন্ধিকালে যে কবি বঙ্গসাহিত্যে আবির্ভূত হইয়া কাব্যরচনা করিয়া সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যের স্রোতটিকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন তিনি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের যুগসন্ধিকালের কবি। তখন প্রাচীন কাব্যের স্রোত শুষ্কপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, আধুনিক কাব্যের ধারা বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে রসসিঞ্চন করিয়া উহার নবীনতা সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তে ভারতচন্দ্রীয় যুগের আভাস দেখিতে পাই। আবার যে কবিতা ইংরেজি শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বাভাসও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার পূর্ব্বকালের ও সমসাময়িক কবিওয়ালা শ্রেণীর কবিদিগের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে অশ্লীলতা ও শব্দাড়ম্বর-প্রিয়তা দোষ অল্পবিস্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের অনুপ্রাসের ঘটা এবং ভাষা ও ছন্দ প্রাচীনযুগের আদর্শকে—বিশেষতঃ ভারতচন্দ্রীয় যুগের আদর্শকে স্মরণ করাইয়া দেয়। আবার, আধুনিক যুগোপযোগী কাব্যরস পরিবেশনেও তিনি অক্ষম ছিলেন না, ইহার পরিচয়ও আমরা তাঁহার কাব্য হইতে পাইয়াছি। দেশপ্রীতিমূলক কবিতা প্রাচীন-সাহিত্যে দুর্লভ। পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে স্বদেশপ্রেমের কবিতা সর্ব্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং ঈশ্বর গুপ্তই এই শ্রেণীর কবিতা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। সুতরাং আধুনিক কাব্যের উপকরণ ঈশ্বর গুপ্তে মিলিবে। আধুনিক যুগোপযোগী স্বদেশবাৎসল্য তাঁহার কবিতায় অভিব্যক্ত—আধুনিক কবিদের মত তিনি ঋতু-বর্ণনা করিয়াছেন, খণ্ড কবিতা রচনা করিয়াছেন, কবিতার মধ্য দিয়া নিজের অনুভূতিটুকু বিবৃত করিয়াছেন, ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন এবং সামাজিক ও ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা ১২১৮ সালের (১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে) চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পাঠশালায় ইনি লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু শৈশবেই ইঁহার কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছিল। পড়াশুনা না করিলেও ইনি মুখে মুখে কবিতা ও ছড়া রচনা করিতে পারিতেন। শোনা যায় যে যখন তাঁহার বয়স মাত্র তিন বৎসর, তখন তিনি একবার কলিকাতায় গমন করেন এবং কলিকাতার মশা-মাছির উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া আপন মনে বলিতেছিলেন—

রেতে মশা দিনে মাছি
এই তাড়িয়ে কলকাতায় আছি।

ইহা ভিন্ন, মাত্র বারো বৎসর বয়স হইতেই ঈশ্বর গুপ্ত কবির দলে গান বাঁধিয়া দিতেন।

ভাল করিয়া তিনি লেখাপড়া শিখেন নাই বলিয়া, তাঁহার রচনায় মার্জ্জিত রুচির অভাব দেখা যায়। কিন্তু তথাপি তাঁহার যে অসাধারণ কবিপ্রতিভা ছিল একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার আবির্ভাবকাল কবি-ওয়ালাদিগের যুগ। সেই যুগে অশিক্ষিত কবিওয়ালাদিগের কবিতাবলীও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ—উহাতে মার্জ্জিত রুচির অভাব। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার অশ্লীলতা আর কবিওয়ালাদিগের অশ্লীলতা এক নহে। মার্জ্জিত রুচির অভাব ঘটিলেও, ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় প্রতিভার ছাপ আছে। কিন্তু কবিওয়ালাদের রচনা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিভার দীপ্তিশূন্য।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশীয় যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া ঈশ্বর গুপ্তের খ্যাতির পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর কাব্যামোদী ও সাহিত্যরসিক ছিলেন। তিনি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা-রচনার শক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উভয়ের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্র একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই সুবিখ্যাত ‘সংবাদ প্রভাকর’। ‘সংবাদ প্রভাকর’ প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, পরে উহা সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হইতে থাকে, অবশেষে উহা দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়।

কিশোর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় ‘সংবাদ প্রভাকর’ অতি অল্পদিনের মধ্যেই দেশের সকলের সমাদর লাভ করিয়াছিল। তখনকার

কালের সকল লেখকই 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিবার জন্ত ব্যাকুল ছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' কোনো লেখকের কোন রচনা প্রকাশ হইলে সেই লেখক উহাতে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। ক্রমে এমন হইল যে কবি-যশঃপ্রার্থী নবীন লেখকেরা 'সংবাদ-প্রভাকরে' লিখিয়া শিক্ষানবিশী করিতেন। ঈশ্বর গুপ্তও নবীন লেখকদিগকে উৎসাহ দিতেন, মধ্যে মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার জন্ত পুরস্কার ঘোষণা করিতেন। এইভাবে ঈশ্বর গুপ্ত অতি অল্পদিনের মধ্যেই নবীন লেখকদিগের শিক্ষাগুরুর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কত গন্ধ-রচয়িতা, কত কবি যে ইঁহার নিকট হাতেখড়ি দিয়া উত্তরকালে যশস্বী হইয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সকলেই ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ-প্রভাকরে লিখিয়া হাত মক্স করিয়াছিলেন। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্ত কেবল কবি ছিলেন না। তিনি বহু গন্ধ-লেখক ও কবিদিগের উৎসাহদাতাও ছিলেন। তিনি স্বরচিত কবিতাকুসুম দিয়া বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যের ফুলের সাজি পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। উপরন্তু, অনেক কবি ও লেখককে সমাদরের সহিত আহ্বান করিয়া বঙ্গবাণীর পূজা এবং আরতির ডালা সাজাইয়াছিলেন।

'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরলোক-গমনে উক্ত পত্রিকাখানি উঠিয়া যায়। কিন্তু পরে অন্তান্ত কয়েকজন ধনী ও বদান্ত ব্যক্তির সহায়তায় ঈশ্বর গুপ্ত আরও কয়েকখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং সেগুলির সম্পাদকতা করেন। কিন্তু 'সংবাদ-প্রভাকরে'র সম্পাদনা করিয়াই তিনি অক্ষয় যশ অর্জন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্য 'সংবাদ-প্রভাকরে'র নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

'সংবাদ-প্রভাকর' ভিন্ন, ঈশ্বর গুপ্ত 'পাষণ্ডপীড়ন' ও 'সাধুরঞ্জন' নামে পর পর দুইখানি পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

সে যুগে বাঙ্গলায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরাগী তাঁহার এক শিষ্যমণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছিল। কবি তাঁহাদের লইয়া সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান করিতেন। সেই সম্মেলনে তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইতেন, শিষ্যদিগের কবিতা আগ্রহের সহিত শুনিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

ঈশ্বর গুপ্ত সাহিত্যসেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আজীবন তিনি সাহিত্যসেবা করিয়া গিয়াছেন। সংবাদপত্র-সম্পাদনা, নবীন-লেখক-

দিগকে উৎসাহ দেওয়া ভিন্ন, তিনি বহু লুপ্তপ্রায় বাঙ্গলা কবিতা ও কবির জীবনী সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টাও অবহেলা করিবার নহে। যে সকল কবির জীবনী বাঙ্গালী ভুলিতে বসিয়াছিল, যে সকল কবির কবিতা আমরা হারাইয়াছিলাম, কবি তাহা ধূলা হইতে তুলিয়া সযত্নে ঝাড়িয়া-মুছিয়া বঙ্গবাণীর ভাণ্ডারে সযত্নে রাখিয়া গিয়া বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা বঙ্গসাহিত্যকে একটি নূতন অনুপ্রেরণা ও শক্তি দান করিয়াছিল। ফলে বঙ্গসাহিত্যের সেই যুগের মজ্জাগত অশ্লীলতা দোষ অনেকখানি সংশোধিত হইয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার অন্যতম বিশিষ্টতা স্বদেশপ্রেম। স্বদেশপ্রীতি-মূলক কবিতাবলী তিনিই বঙ্গসাহিত্যে প্রথম রচনা করেন। তাঁহারই আদর্শানুযায়ী রঙ্গলাল, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের কাব্যে স্বদেশপ্রেম উৎসারিত হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের রচনার অপর বিশিষ্টতা ব্যঙ্গকবিতা এবং যাহা প্রত্যক্ষ তাহার বর্ণনায় তাঁহার নিপুণতা। তাই আনারস, পাঁঠা, পৌষপার্বন, বড়দিন, তপ্‌সে মাছ প্রভৃতি তাঁহার বর্ণনার বিষয় হইয়াছিল। এই সকল কবিতার ভিতর দিয়া অনাবিল হাস্যরস উৎসারিত হইয়া নিরানন্দ বাঙ্গালীর মুখে হাসি ফুটাইয়াছিল।

আনারস সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

ক্ষীরদ নহে ত তুমি, নহ সুধাকর।
তবে কিসে সুধাভরা তব কলেবর ?
পুণ্যবতী কেবা আছে তোমার সমান ?
মৃত হয়ে লোকেরে অমৃত কর দান ॥
পঞ্চানন পঞ্চমুখে নাহি করে সীমা।
এক মুখে কি কহিব, তোমার মহিমা ॥

কৃপণের কর্ম্ম নয়, তোমায় আহার।
ছাড়াবার দোষে সেই, নাহি পায় তার ॥
ডাঁটা বোঁটা নাহি বাছে, মনে লোভ ঝোঁকে।
চোক শুদ্ধ খেয়ে ফেলে চোকখেকো লোকে ॥

ফলে আমি মিছা কেন নিন্দা করি তায়।
সাধ পূরে বাদ দিতে, বুক ফেটে যায়॥
ছাল ফেলে কাটি কিন্তু চক্ষু ভাসে জলে।
ভয় আছে লোকে পাছে চোকখেকো বলে॥
লুন মেখে নেবু রস—রসে যুক্ত করি'।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা চিনি তায় ভরি॥

... ...

অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে।
গালে এসে বাস করো মরণের কালে॥

পাঁঠার বন্দনা করিয়া কবি বলিয়াছেন—

রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥
তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান্।
সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সন্তান॥
চাঁদমুখে চাঁপদাড়ি গালে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ খাড়া, ছাড়া ছাড়া, লোমে লোমে থোপ॥

... ...

সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে॥
হাড়িকাঠে ফেলে দিই ধরে দুটি ঠ্যাঙ্।
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাডাং ছ্যাডাং॥
এমন পাঁঠার নাম, যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা॥

তপ্‌সে মাছ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

কষিত কনককান্তি কামিনীর প্রায়।
গালভরা গোঁপদাড়ি, তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা তোমার শরীরে॥
একবার রসনায় যে পেয়েছে তার।
আর কিছু মুখে নাহি ভাল লাগে তার॥

দৃশ্য মাত্র সর্ব্ব গাত্র প্রফুল্লিত হয়।
সৌরভে আমোদ করে ত্রিভুবনময় ॥
প্রাণে নাহি দেরী সয় কাঁটা আঁশ বাছা।
ইচ্ছা করে একেবারে গালে দেই কাঁচা ॥

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, হেন আর নেই।
যে দিলে তপস্যা নাম, সাধু সাধু সেই ॥

ঈশ্বর গুপ্ত এই শ্রেণীর কবিতার ভিতর দিয়া বাঙ্গালীকে অনাবিল আনন্দ দান করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ঋতু-বর্ণনার কবিতাগুলিও অপূর্ব্ব। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্যে ঋতুবিষয়ক খণ্ড-কবিতা আর কোন কবি রচনা করেন নাই। তিনি প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, রজনীর বর্ণনা করিয়াছেন,—বর্ষা, বসন্ত, শরৎ, শীতের চমৎকার বর্ণনাও করিয়া গিয়াছেন।

গুপ্ত কবির প্রশংসায় সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চমুখ ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার বিশেষত্ব সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।—

"যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ—ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি।...তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপ্‌সে মাছে মৎস্য-ভাব ছাড়া তপস্বী-ভাব দেখেন। পাঁঠায় বোকা গন্ধ ছাড়া, একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান।... ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত Satirist।"

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার বাস্তবতা এবং ব্যঙ্গরস সে যুগের কাব্যের অশ্লীলতা দোষটুকু দূরীকরণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। যুগসন্ধিকালে আবির্ভূত কবিদিগের কবিতায় যে অশ্লীল ভাবস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, ঈশ্বর গুপ্তের realism ও satire-ই তাহাকে ব্যাহত করিয়া বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যের উন্নতির পথটিকে প্রশস্ততর করিয়াছিল।

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গকবিতায় বিদ্বেষের লেশমাত্র ছিল না বলিয়া উহা বঙ্কিমচন্দ্রের খুব ভাল লাগিত। তাই তিনি বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন

না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ।......

"মেকির উপর (তাঁহার) যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা 'নস্য-লোসা দধি-চোষা'র দল গালি খাইতেন। হিন্দু ছেলে মেকি খ্রীষ্টিয়ান্ হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার সহ্য হইত না। মিশনারীদের ধর্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্সের উপর রাগ।..."

এইরূপে ভাবের দিক দিয়া ঈশ্বর গুপ্ত বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে নূতনত্ব আনিয়াছিলেন, বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া সাহিত্যকে মধ্যযুগের প্রভাবমুক্ত করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের যুগ পর্য্যন্ত কবিগণ প্রধানতঃ আধ্যাত্মিকামূলক কাব্য রচনা করিতেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তই সর্ব্বপ্রথম আধ্যাত্মিকা নিরপেক্ষ স্বানুভাবাত্মক কবিতা বা Subjective কবিতা রচনা করেন। বিবিধ বিষয় অবলম্বন করিয়া খণ্ড কবিতা রচনা করার পথ-প্রদর্শকও ঈশ্বর গুপ্ত।

আধুনিক যুগের কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব হয় বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণে। সে যুগে পাশ্চাত্ত্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব এবং পাশ্চাত্ত্য সমাজের রীতি-নীতির প্রভাব বাঙ্গলার সমাজ ও সাহিত্য-ক্ষেত্রকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য এবং পাশ্চাত্ত্য সমাজের আদর্শের সহিত সংঘর্ষে প্রাচ্যের সামাজিক রীতি-নীতি ধর্ম ও সাহিত্যে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই বিপ্লবের প্রতিকারের জন্য —প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের একটা সামঞ্জস্য-সাধনের জন্য স্বদেশপ্রাণ মহাত্মারা তখন বদ্ধপরিকর। সে যুগে দেশের কুপ্রথাসমূহের মূলোচ্ছেদ হইতেছে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব দেশের মধ্যে ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি সমস্ত দিকেই পরিবর্তন পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর পুরাতন রুচি ও প্রবণতার পরিবর্তন হইয়াছে, বাঙ্গালীর মধ্যে এক নূতন আকাঙ্ক্ষা ও অভাবের আবির্ভাব হইয়া বাঙ্গালীকে নূতন উৎসাহে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ঠিক এই যুগে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার দত্তের সমবেত প্রাণপাত প্রচেষ্টায় বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য শক্তিশালী ও সকল প্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগী হইয়া উঠিতেছিল। পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে এবং ভাবে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গলা গদ্যসাহিত্য তখন এক অভিনব পথে পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যের কোনও উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধিত হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য কবিগণের অনুসৃত আদর্শ অথবা পাশ্চাত্ত্য কাব্যের সৌন্দর্য্য বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রবাহিত করাইয়া দিবার জন্য কোন প্রতিভাশালী কবির তখনও আবির্ভাব হয় নাই।

তখনও বাঙ্গলা সাহিত্যের পদ্য-বিভাগে গুপ্তযুগ—অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব তখনও বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যে অপ্রতিহত। অবশ্য ভারতচন্দ্র এবং তাঁহার অনুসরণকারী কবিগণ আদিরসের প্লাবনে বাঙ্গলা সাহিত্যকে যে-ভাবে

পঙ্কিল করিয়া গিয়াছিলেন, কেবলমাত্র ঈশ্বর গুপ্তই কবিতার মধ্য দিয়া হাস্যরস পরিবেশণ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের রুচি পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গলা সাহিত্যে যে আদিরসের প্লাবন বহিয়াছিল, গুপ্ত কবি উহার মুলোৎপাটন করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু তাঁহার কবিতাও একেবারে অশ্লীলতাবর্জ্জিত ছিল না। বিশুদ্ধ রুচির অভাবে, যমকানুপ্রাসের প্রাচুর্য্য এবং অর্থহীন শব্দবিন্যাসপ্রিয়তার জন্য গুপ্ত কবির কবিতা সেই যুগের ইংরাজি শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারে নাই। সেই যুগের বাঙ্গালী যুবকমাত্রেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পাশ্চাত্য কাব্যরসপিপাসু হইয়া উঠিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের অসাধারণ প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সাধ্য ছিল না যে, তিনি তাঁহার কবিতার দ্বারা বাঙ্গলার নব্য পাঠক সম্প্রদায়ের কাব্যরসপিপাসা মিটাইবেন।

ঠিক এই যুগে অসাধারণ প্রতিভা লইয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙ্গলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। প্রকৃতিদত্ত শক্তি, প্রতিভা এবং অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে বাঙ্গলার এই নবীন কবি পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট করিলেন, গাম্ভীর্য্য ও ভাববৈচিত্র্যে বাঙ্গলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। মাইকেল মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম দেখান যে, বাঙ্গলা ভাষায় কেবল বাঁশীর মৃদুমধুর গুঞ্জরণ অথবা বেণু-বীণানিকণ ধ্বনিত হয় না। প্রতিভাশালী লেখকের হস্তে ইহার ভিতর দিয়া ভেরীর সুগম্ভীর রবও প্রকাশিত হইতে পারে। মধুসূদনই ইহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গলা ভাষা নির্জ্জীব নহে, ইহা সজীব ভাবধারার বাহন হইতে পারে,—দৃঢ়তায় ও স্থিতিস্থাপকতায় ইহা অন্য যে কোনও উন্নতিশীল ভাষার সমকক্ষ। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, মধুসূদনই উনবিংশ শতাব্দীর যুগপ্রবর্ত্তক কবি। মধুসূদনই বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যকে আধুনিকতায় দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যে বর্ত্তমানে যে যুগ চলিয়াছে, তাহার উদ্বোধন করেন মাইকেল মধুসূদন। আধুনিক যুগের উন্মেষে বাঙ্গলা গদ্যের শক্তি আবিষ্কার করেন বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার ও বঙ্কিম। আর মাইকেল মধুসূদন আবিষ্কার করেন বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত শক্তি।

কপোতাক্ষ নদের তীরস্থ যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫-এ জানুয়ারী শনিবারে এক সঙ্গতিপন্ন কায়স্থ পরিবারে

কবিবর মাইকেল মধুসূদনের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ছিল রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবী দেবী। অতি বাল্যকাল হইতে তাঁহার চরিত্রের দুইটি বিশিষ্ট গুণ পরিস্ফুটভাবে আত্মপ্রকাশ করে—প্রথমতঃ অধ্যয়নাসক্তি ও দ্বিতীয়তঃ কাব্যপ্রীতি। বিদ্যা-শিক্ষায় ইনি কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। অনলসভাবে ইনি বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। কি শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায়, কি যৌবনে হিন্দু কলেজ অথবা বিশপস্ কলেজে অধ্যয়নকালে, কখনও ইনি পড়াশুনায় কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন, ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না। ইহা ভিন্ন, অতি শৈশবেই তিনি তাঁহার জননীর নিকট হইতে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিতেন, আর উহা শুনিতে শুনিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। এই রামায়ণ মহাভারত যাবজ্জীবন মধুসূদনের আদরের বস্তু ছিল। ঐ কাব্য দুইখানি পাঠ করিতে তিনি চিরজীবনই বড় ভালবাসিতেন এবং এই দুই অমূল্য গ্রন্থই তাঁহার প্রকৃতিদত্ত অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। বালকবয়সে আগমনী ও বিজয়ার গান শুনিয়া মধুসূদনের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া যাইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বালকবয়সেই মধুসূদনের অন্তর অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল।

গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন সমাপন করিয়া মধুসূদন ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে কলিকাতায় হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন।—এই হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে মধুসূদন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সন্ধান পান। এই সময়েই তাঁহার কবিত্বশক্তির উন্মেষ। এই সময়ে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন এবং যখন তাঁহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর তখনই তিনি ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া বিলাতের মাসিক-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইতে সাহসী হইয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজে পড়িবার সময়ে দুইজন ইংরেজ অধ্যাপকের প্রভাব তাঁহার চরিত্রে পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায়, ইঁহাদের নাম ডিরোজিও ও ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন্। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন, সে সময়ে যদিও ডিরোজিও সাহেব কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ছাত্রমহলে যে বিপ্লব-তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা মধুসূদন অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ডিরোজিও তাঁহার ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সকল বিষয়েরই দোষগুণ আলোচনা করিয়া নিজেদের গন্তব্যপথ নির্ণয় করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন। মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে

ডিরোজিওর ছাত্র না হইলেও, ডিরোজিওর শিক্ষা তাঁহার জীবনে কার্য্যকরী হইয়াছিল। রিচার্ডসনও ডিরোজিওর ন্যায় কবির আদর্শস্বরূপ ছিলেন। রিচার্ডসন তৎকালে হিন্দু কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছাত্রদিগের ভাবগ্রাহিতাকে উদ্দীপিত করিতেন, তাহাদিগকে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে শিখাইতেন। ইনি ছিলেন ইঁহার ছাত্রদিগের কল্পনাজগতের পথপ্রদর্শক। তৎকালীন ছাত্রসমাজ রিচার্ডসনকে বড় ভালবাসিতেন, তাঁহারা তাঁহার মত সুলেখক হইতে চাহিতেন। মধুসূদনের নিকট এই রিচার্ডসন এত প্রিয় ছিলেন যে, মধুসূদন তাঁহার গুণগুলির ত অনুকরণ করিতেনই, এমন কি তিনি তাঁহার দোষগুলিও অনুকরণ করিতে ভালবাসিতেন—অনুকরণ করিয়া গর্ব্ব বোধ করিতেন। সুতরাং বালকবয়সে প্রকৃতির লীলাভূমি কপোতাক্ষ নদের তীরে লালিত-পালিত হইয়া এবং রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া, মধুসূদনের অন্তরে যে কবিত্বশক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, রিচার্ডসনের শিক্ষায়, আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় তাহা যে উদ্ভিন্ন হইবার সুযোগ পাইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রিচার্ডসনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি কলেজের নিম্নশ্রেণী হইতেই ইংরেজিতে গদ্য-পদ্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ছাত্রাবস্থায়—শুধু ছাত্রাবস্থায় কেন, জীবনের প্রথম ভাগে মাইকেল মধুসূদন কেবল ইংরেজিতেই কবিতা রচনা করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় অথবা প্রথম জীবনে মধুসূদন দুই-একটি ভিন্ন বাঙ্গলা কবিতা রচনা করেন নাই। আর সেই সব কবিতাও অপরিপক্ক ও অপরিণত প্রতিভার পরিচায়ক—উহাতে কাঁচা হাতের ছাপ বর্ত্তমান। বরং সেই তুলনায় সে সময়কার রচিত তাঁহার ইংরেজি কবিতা অনেক উৎকৃষ্ট হইত।

আশ্চর্য্য এই যে, যিনি বঙ্গসাহিত্যের যুগপ্রবর্ত্তক কবি বলিয়া আজ বিখ্যাত, তিনি তাঁহার প্রথম জীবনে বঙ্গভাষার প্রতি একান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেকালের অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তির মত তাঁহারও ধারণা ছিল যে, ইংরেজি ভাষায় গদ্য-পদ্য রচনা করিয়াই তিনি যশ ও প্রতিপত্তি লাভ করিবেন। তাঁহাকে সে সময়ে মধ্যে মধ্যে এমন কথাও বলিতে শুনা যাইত—"বাঙ্গলা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।" যাহা হউক, পরে তাঁহার এই ভুল ভাঙ্গিয়াছিল এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বিদেশী ভাষায় যতই অধিকার থাকুক না কেন, তাহাতে গদ্য-পদ্য রচনা করিয়া চিরস্থায়ী গৌরব

অর্জ্জন করা যায় না। ভুল ভাঙ্গিবার পরে মধুসূদন বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলায় কাব্য, নাটক প্রভৃতি রচনা করিয়া অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে মধুসূদন বিজাতীয় ভাব ও আদর্শে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। এই বিজাতীয় ভাবের প্রাধান্য হেতু হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই তিনি তাঁহার স্নেহময় জনক-জননী, সাংসারিক সুখসম্পদ সমস্ত জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়া হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করায় মধুসূদনের হিন্দু কলেজে আর স্থান হইল না। অতঃপর তাঁহাকে বাধ্য হইয়া হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিশপস্ কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইল।

হিন্দু কলেজে মধুসূদনের ভাবপ্রবণতা জাগরিত হইয়াছিল—তাঁহার কবি-প্রতিভা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। ঐ কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁহার রচনাশক্তির উন্মেষ হয়। কিন্তু বিশপস্ কলেজও তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনকে গঠিত করিতে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল। বিশপস্ কলেজ তাঁহার ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্র। ইংরেজি, লাটিন্, গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের অভ্যন্তরে যে সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান, বাঙ্গলা ভাষায় কাব্য রচনা করিবার সময়ে উহা তিনি বাঙ্গলা কাব্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বিশপস্ কলেজে লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষাসমূহ শিক্ষা করিতে আরম্ভ না করিলে মধুসূদনের কাব্যে আমরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সমাহৃত দেখিতে পাইতাম না।

মধুসূদন বিশপস্ কলেজে মাত্র চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি মাদ্রাজে গমন করেন। মাদ্রাজে মধুসূদনের প্রবাস-জীবন দারুণ দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যে পূর্ণ। এই স্থানে থাকিতে প্রথমে তিনি এক অনাথ-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতেন। ক্রমে অবশ্য তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও মাদ্রাজের তদানীন্তন বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা Spectator-এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার দারিদ্র্য দূর হয় নাই। তাই দারিদ্র্যমোচনের জন্য এবং দারিদ্র্যদুঃখ ও নৈরাশ্য বিস্মৃত হইবার জন্য তিনি মাদ্রাজে থাকিতেই নিজেকে সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত করেন। এইরূপে প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে প্রতিভার যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা উদগত হইবার সুযোগ পাইল। তিনি মাদ্রাজের বহু সাময়িক পত্রিকায় ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন

—ইংরেজিতে Captive Lady ও Visions of the Past রচনা করিলেন।

কিন্তু যে দারিদ্র্যদশা মোচনের জন্য তিনি উক্ত গ্রন্থদ্বয় এবং প্রবন্ধাদি রচনা করিতেছিলেন তাঁহার সে দারিদ্র্য দূর হইল না। তখন মধুসূদনের দৃঢ় ধারণা হইল যে, বাঙ্গলা ভাষাই তাঁহার কবিত্বস্ফুরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং যদি তিনি কোনও ভাষায় অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন তবে তাহা এই বাঙ্গলা ভাষাতেই। মাদ্রাজে অবস্থানকালেই তিনি বাঙ্গলা ভাষায় রচনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। যে বাঙ্গলা ভাষার প্রতি এতদিন কবির বিরাগ ছিল, এইবার সেই বাঙ্গলা ভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মিল। রামায়ণ মহাভারত তাঁহার চিরসঙ্গী ছিল। অনুরাগের সহিত তিনি মাদ্রাজে বসিয়া উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিতেন এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য ভাষার অনুশীলন করিয়া ঐ সকল পাশ্চাত্ত্য ভাষার কাব্যকানন হইতে মনোহর কুসুম চয়ন করিয়া উহা দ্বারা বঙ্গবাণীর দেউল সাজাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

এইভাবে মনে মনে বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন করা স্থির করিয়া—বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহার তেমন অধিকার ছিল না, তাই বাঙ্গলা ভাষার সেবা করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া—তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি সৌভাগ্যক্রমে বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা-বিকাশের উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পান।

মধুসূদন প্রধানতঃ ছিলেন কবি, এবং বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যে মধুসূদনের প্রথম দান 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। তিলোত্তমাসম্ভব কবির প্রথম কাব্য হইলেও তাঁহার প্রতিভার উন্মেষ হয় নাটক রচনার মধ্য দিয়া। তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্ম্মিষ্ঠা' ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং ইহাই মধুসূদনের প্রথম উল্লেখযোগ্য বাঙ্গলা রচনা। ইতিপূর্ব্বে ছাত্রাবস্থায় তিনি যে দুই-একটি বাঙ্গলা কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে বর্ণাশুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ভাষাগত, ভাবগত প্রায় সমস্ত প্রকার দোষ লক্ষিত হয়। কিন্তু 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটকে চরিত্রাঙ্কণ ও ঘটনা-বর্ণনার রীতি বঙ্গ-সাহিত্যে নূতনত্বের সন্ধান দিয়াছিল। 'পদ্মাবতী নাটক' কবির দ্বিতীয় রচনা। প্রথম নাটকের ন্যায় ইহা পাশ্চাত্ত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত অভিনব সৃষ্টি। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন এবং সৌন্দর্য্যসাধন করিয়া মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে

অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ছন্দ প্রথমে তিনি 'পদ্মাবতী নাটকে'র অংশবিশেষে প্রয়োগ করেন; পরে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র আদ্যোপান্ত রচনা করেন।

বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের উৎপত্তি-কাহিনী অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। অতি সামান্য ঘটনা হইতে কত সময়ে যে কত গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম-ইতিহাস তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সংস্পর্শে আসিয়া মধুসূদন যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় সাহিত্যরসিকের সহিত পরিচিত হন, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁহাদের অন্যতম। মধুসূদনের সহিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের প্রায়ই সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইত। মধুসূদন প্রথম নাটক রচনা করিবার সময়ে বুঝিয়াছিলেন যে, মুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ব্যতীত বাঙ্গলা নাটকের উন্নতির আশা নাই। তাই একদা কথাপ্রসঙ্গে কবি মধুসূদন যতীন্দ্রমোহনকে বলিলেন, "যতদিন বাঙ্গলাভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন না হইবে, ততদিন বাঙ্গলা নাটক সম্বন্ধে উন্নতির বিশেষ কোন আশা নাই।" উত্তরে মহারাজা বলিলেন যে, বাঙ্গলা ভাষার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এই ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। মধুসূদন উত্তর দিলেন, "বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা। এরূপ জননীর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।" এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর হইতে শেষে আত্মশক্তিতে আস্থাবান্ বাঙ্গলার উদীয়মান কবি মাইকেল মহারাজার সম্মুখে অকস্মাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে, তিনি অমিত্রচ্ছন্দে কাব্য রচনা করিবেন। 'পদ্মাবতী নাটকে'র মধ্যে এই ছন্দের প্রথম প্রয়োগ করিয়া এবং 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র আদ্যোপান্ত অমিত্রচ্ছন্দে রচনা করিয়া কবিবর তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। প্রতিভাশালী কবির নেতৃত্বে বাঙ্গলা পদ্যসাহিত্য স্বপ্নাতীত এক অভাবনীয় পথে পরিচালিত হইল, বাঙ্গলা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' কেবল যে ছন্দের অভিনবত্ব ও বিশেষত্ব আছে তাহা নহে, ইহার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কল্পনার অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। কবি তাঁহার অতুলনীয় সৃজনীশক্তির সাহায্যে দেশীয় এবং বৈদেশিক সাহিত্যের আদর্শ এবং রচনাপদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া এই কাব্যে সৌন্দর্য্যের যে মায়াকানন রচনা করিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিভার অবিনশ্বর নিদর্শনই নহে, তাহা

বঙ্গসাহিত্যে কবির শ্রেষ্ঠ এবং অমর দান। বর্ণনাচ্ছটা এবং কল্পনাবিলাসে ইহাতে ভারতের অমর কবি কালিদাস এবং ইংলণ্ডের কবি কীটস্ ও মিল্‌টনের প্রভাব সুস্পষ্ট। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগৃহীত হইলেও ইহাতে কবির ব্যক্তিগত কল্পনা ও সৌন্দর্য্যবর্ণনাও যথেষ্ট আছে।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' গুপ্ত যুগের অবসান সূচনা করিয়া প্রাচীন সাহিত্য-যুগের সীমানা নির্দ্দেশ করে। ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যে যে আধুনিকতা ছিল না তাহা নহে—কিন্তু তাহা প্রধানতঃ মধ্যযুগেরই আদর্শ। কিন্তু মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভবে আমরা পাই ভাব, ভাষা ও ছন্দের একটা আমূল পরিবর্ত্তন। ইংরেজি সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের সঙ্গে বাঙ্গলা সাহিত্যে একজন যুগ-প্রবর্ত্তক কবির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল, মধুসূদন সেই পরিবর্ত্তন সাধনপূর্ব্বক বাঙ্গলার কাব্য-সাহিত্যের স্বর্ণ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া বাল্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিলেন।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রকাশিত হওয়ার পরে মধুসূদনের অপূর্ব্ব সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য' বঙ্গ-সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কবির প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং ইহারই উপর কবির অমরত্বের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত। এই কাব্যে কবি একজন দক্ষ স্রষ্টা—ইহার আগস্ত কবির উদ্দাম কল্পনাশক্তি, বর্ণনাভঙ্গী ও মৌলিকতা সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র মতই স্বদেশীয় ও পাশ্চাত্ত্য কাব্য-কানন হইতে ভাবকুসুম চয়ন করিয়া আনিয়া কবি এই মহাকাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' কবির যে মাধুকরী বৃত্তি অপরিণত ছিল, মেঘনাদবধে সেই ক্ষমতা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাব ও কল্পনার সমন্বয়-সাধনের ক্ষমতা—পূর্ণ পরিণত হইয়া উঠিয়াছে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মূল আখ্যায়িকা রামায়ণ হইতে গৃহীত। রামানুজ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক রাবণের পুত্র মেঘনাদের নিধন ইহার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু প্রাচ্যের এই বিষয়বস্তু-বর্ণনায় বহু-গ্রন্থপাঠী মধুসূদন পাশ্চাত্যের বহু কাব্য হইতে নানা উপকরণ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেন। ইলিড, ডিভাইনা কমেডিয়া, জেরুজালেম ডেলিভার্ড, প্যারাডাইস্ লষ্ট, বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কুমারসম্ভব প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কাব্যের ভাব, কল্পনা ও বিষয়বস্তুর দ্বারা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র

সৌন্দর্য্য সাধিত হইয়াছে। প্রাচ্য কাব্য, নাটক প্রভৃতিতে নান্দী, স্তুতি বা মঙ্গলাচরণের পর যেভাবে গ্রন্থ আরম্ভ করা হয়, সেই রীতি পরিত্যাগ করিয়া কবি এই কাব্যে বীণাপাণির বন্দনা-গীতি গাহিয়াছেন। ইহাতে কবির উপর গ্রীক কবি হোমার, ইতালীয় কবি ভার্জিল ও ইংরেজ কবি মিল্‌টনের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। এইভাবে কবি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য কাব্য-সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ 'মেঘনাদবধ কাব্যে' পরিবেশণ করিয়াছেন নববেশে সুসজ্জিত করিয়া। এই অনুকরণে কাব্যের সৌন্দর্য্যহানি হয় নাই, অথবা কবির মৌলিকতার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। পরন্তু তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা ও সৃজনীশক্তিরূপ যাদুদণ্ড-স্পর্শে বৈদেশিক উপকরণসমূহ এবং আদর্শ নবালঙ্কারে ভূষিত হইয়া কবির কাব্যে এমনভাবে সজীব ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা আমরা বঙ্গসাহিত্যে কবির বিশিষ্ট দান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু তাহাই নহে,—এই সূত্রে বঙ্গসাহিত্যে পাশ্চাত্ত্যপ্রভাব বেশ ভালভাবে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক যুগের উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও 'মেঘনাদবধ কাব্যে' অনেক নূতনত্ব বিদ্যমান। রামচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি এবং রাক্ষসদিগের প্রতি বিরাগ উদ্রেক করাই রামায়ণের কবির উদ্দেশ্য। কিন্তু মেঘনাদবধে মধুসূদন এই চিরপুরাতন আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুকম্পা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। কবির বর্ণনাগুণে আমরাও রাক্ষসপরিবারের জন্য অশ্রুমোচন না করিয়া পারি না। রাক্ষসপরিবারের স্বজাতি-প্রেমে আমরা মুগ্ধ হই—তাহাদের বিপর্য্যয়ে আমাদের দুঃখ উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

মধুসূদন রামায়ণের প্রচলিত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া রাবণ ও রাক্ষস-পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতির চরিত্রকে ভীরু কাপুরুষ ও শাস্তরূপে চিত্রিত করিয়া রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা, সরমা প্রভৃতির চরিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। কবির নিজের স্বদেশপ্রীতি খুব প্রবল ছিল, তাই তাঁহার কাব্যে রাক্ষসগণ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে তিনি দেখিয়াছেন যে, একজন বিদেশী সসৈন্যে আসিয়া অপরের দেশ আক্রমণ করিয়াছেন। সেই আক্রান্ত দেশের—অর্থাৎ লঙ্কার স্বাধীনতা বিপন্ন। সেই আক্রান্ত রাজা স্বদেশ ও আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে

হারাইয়াও অদম্যভাবে প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। মধুসূদন রাবণ চরিত্রে একটি বেগ ও উদ্যম লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি স্বাধীনতা রক্ষায় জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এইজন্ত উদ্যমী রাবণ কবির সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। দেশরক্ষায় মেঘনাদের অসাধারণ বীরত্ব কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। এইজন্যই বীর মেঘনাদের চরিত্র কবি অতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রমীলা বীরাঙ্গনা। তাই উহাকে তিনি তেজস্বিনী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রমীলায় বীরাঙ্গনার তেজ ও কুলবধূর কোমলতা মিলিত হইয়া তাহাকে অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছে। সরমা রাক্ষস-বধূ বিভীষণের পত্নী। রাক্ষসপুরীতে সহায়হীনা সীতার প্রতি তাহার আন্তরিক সহানুভূতি, রাবণের পাপাচরণের প্রতি ঘৃণা তাহার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়াছে। অপরপক্ষে রামের চরিত্রকে নিতান্ত হীন না করিলেও, কবি তাঁহাকে অত্যন্ত শান্ত, বিপদে কাতর ও দুর্ব্বলচিত্ত করিয়াছেন, আর লক্ষ্মণকে কাপুরুষ করিয়াছেন। রামের দুর্ব্বলতা এবং লক্ষ্মণের ভীরু কাপুরুষের মত মেঘনাদকে বধ করা কবির ভাল লাগে নাই। কিন্তু রাবণ ও মেঘনাদ স্বদেশরক্ষায় জন্ত যেরূপ আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন ও অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিয়া পরাধীন দেশের অধিবাসী মধুসূদন বিস্ময় ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই।

এই রাক্ষস-পক্ষপাত হেতু তিনি রাবণ, মেঘনাদ প্রভৃতি লঙ্কার রাক্ষসগণকে নরখাদক বীভৎস জীব করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। উহারাও তাঁহার কাব্যে মানুষ। উহাদের অন্তর হইতে মানুষের মতই স্নেহ ভালবাসা স্বজাতিপ্রীতি প্রভৃতি উৎসারিত হইয়া উহাদিগকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। 'মেঘনাদবধ-কাব্যে'র রাবণ মহিমান্বিত সম্রাট, স্নেহশীল পিতা, নিষ্ঠাবান ভক্ত এবং স্বদেশবৎসল বীর। মেঘনাদও ধর্ম্মভীরু পবিত্রাত্মা স্বদেশপ্রেমিক। তিনি রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ-যাত্রার প্রাক্কালে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করিয়াছেন—দেব-পূজার রীতি অনার্য্য রাক্ষস সমাজেও প্রচলিত ছিল। প্রমীলা আর্য্য-রমণীর মতই মেঘনাদের সহিত চিতারোহণ করিয়া সহমৃতা হইয়াছিলেন।

'মেঘনাদবধ কাব্য' করুণরস-প্রধান। যদিও কবি তাঁহার কাব্যের প্রথমেই বলিয়াছেন—

'গাইব মা বীররসে ভাসি' মহাগীত'

তথাপি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আদ্যোপান্ত করুণ-রসই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; স্থানে স্থানে বীররস উৎসারিত হইয়াছে মাত্র। সমগ্র কাব্যের মধ্যে এক

অতি সকরুণ সুর ধ্বনিত হইয়া কাব্যখানিকে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। আদিম যুগের প্রভাতে যেমন করিয়া ক্রৌঞ্চবধূর কাতর ক্রন্দন মহর্ষির হৃদয়বীণায় করুণ ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, ঠিক তেমনিভাবে ভারতের মহাকবির পদাঙ্ক-অনুসরণকারী কবি মধুসূদনের হৃদয়তন্ত্রীও ভগ্নহৃদয় দশানন এবং পুত্রশোকাতুরা মন্দোদরীর বিলাপে করুণ সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল—রক্ষোনরের সংগ্রামের বিশ্ববধিরকারী রুদ্রনাদও সে করুণ রাগিণীকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। মেঘনাদকে সেনাপতিপদে বরণকালে রাবণের উচ্ছ্বাস, সীতা ও সরমার কথোপকথন, লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্ট অংশেই করুণরস প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে রাবণের করুণ বিলাপে এবং পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে মেঘনাদের মৃত্যুতে প্রমীলার সহমরণ ও রাবণের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদের সহিত। এক কথায় বলিতে গেলে, পরাজয়ের কারুণ্যই সমগ্র 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিষয়বস্তু এবং কাব্যে বর্ণিত ঘটনা-পরম্পরার কেন্দ্রস্বরূপ।

'মেঘনাদবধ কাব্য' মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা দ্বিতীয় কাব্য। ইহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনেকাংশে পরিণত ও অপরূপ মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। কবি অমিত্রচ্ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা করিলে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার অমিত্রচ্ছন্দকে 'উৎকট'—'বাঙ্গলা ভাষার অনুপযোগী' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্যে' এই ছন্দের পূর্ণপরিণতি দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যান। সকলে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—নির্ঝরিণী কুলুকুলু নিনাদে অভ্যস্ত বঙ্গভাষায় জল-প্রপাতের ভীষণ গর্জ্জন আসে কোথা হইতে! বীণাধ্বনি শ্রবণে অভ্যস্ত তন্দ্রালস বাঙ্গালীর কর্ণে গম্ভীর ভেরীনিনাদ প্রবেশ করে কেমন করিয়া! সত্যই 'মেঘনাদবধ কাব্যে' এক অমিত্রাক্ষর ছন্দের বাহনে করুণ সুর এবং বীরোচিত ভাব উভয়ই অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এতদিন বাঙ্গলা ছন্দে কেবল কোমল-মধুর সুরই বাজিত। কিন্তু মধুসূদন সেই ভাষায় এমন এক ছন্দ উদ্ভাবন করিলেন, যাহা দ্বারা বীরত্বব্যঞ্জক ভাব প্রকাশও সম্ভব হইল। কোমল আনত নবীন লতিকার ন্যায় ক্ষীণকায়া বাঙ্গলা ভাষার অভ্যন্তরে যে এ শৌর্য্য ও তেজস্বিতা বর্ত্তমান থাকিতে পারে, মধুসূদন কর্তৃক অমিত্রাক্ষর ছন্দ-সৃষ্টির পূর্ব্বে এ ধারণা কাহারও ছিল না। ভারতচন্দ্র কবিতাকে যে পথে পরিচালিত করেন, ঈশ্বরচন্দ্র যে পথের গৌরববর্দ্ধনে

যত্নবান হন, মধুসূদনের অলৌকিক প্রতিভা ও সৃজনী-শক্তিবলে সেই পথ এইরূপে পরিত্যক্ত হইল। মধুসূদন অসাধ্য-সাধন করিলেন। বঙ্গভাষায় যুগান্তর সূচিত হইল।

প্রতিভা এমনই জিনিস যে, ইহা যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহাই বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত হয়। কবি মধুসূদনের প্রতিভা ঠিক এইরূপ ছিল। তিনি যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই সোনার দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার প্রতিভা বাস্তবিকই সর্ব্বতোমুখী ছিল। যাঁহারা তাঁহাকে কেবলমাত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা বলিয়া জানেন, তাঁহারা কবি-প্রতিভার সমগ্র রূপটি দেখিতে পান নাই। মিত্রছন্দে কাব্য রচনা করিয়া নূতন ধ্বনি-মাধুর্য্যে এবং ছন্দের লালিত্যে উহাকেও যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দান করিতে পারা যায়, তাহাও কবি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কবির 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'। ব্রজাঙ্গনা বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে রচিত কাব্য। ব্রজাঙ্গনার ভাব, ভাষা ও ছন্দে বিশিষ্টতা আছে। বৈষ্ণব কবিতার আদর্শে রচিত হইলেও ব্রজাঙ্গনায় নূতনত্ব আছে। বৈষ্ণব-কবিতায় বৈষ্ণব সাধক-কবিদের ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মধুসূদন তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা করিয়াছিলেন কেবল ভাবের আবেগে। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা বা ভক্তি আছে, ব্রজাঙ্গনায় তাহা নাই। ব্রজাঙ্গনায় ভক্তি অথবা আধ্যাত্মিকতা না থাকিলেও কবিত্ব আছে। এই কাব্যের ভাষা ও ছন্দ বঙ্গসাহিত্যের একটি মহামূল্য সম্পদ্। ছন্দে বৈচিত্র্য ও নূতনত্বের সুর অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য মধুসূদন একবার বলিয়াছিলেন—ইটালীর মিশ্র-ছন্দকে বাঙ্গলায় আনা যায় না কি? মধুসূদনের যেরূপ প্রতিভা ছিল তাহাতে তাঁহার পক্ষে বঙ্গসাহিত্যে নূতন কিছু প্রবর্ত্তন করা অসম্ভব ছিল না। সুতরাং ইটালীর মিশ্র-ছন্দের আদর্শে অতিশয় সফলতার সহিত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' তিনি মিশ্র-ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বাঙ্গলা পয়ার ও লাচাড়ী ছন্দের সংমিশ্রণে যে কত অগণিত মিশ্র-ছন্দের উৎপত্তি হইতে পারে, মধুসূদনের পূর্ব্বে আর কোনও কবি তাহা দেখাইতে পারেন নাই।

ব্রজাঙ্গনার পরে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা পত্রকাব্য। পত্রাকারে যে কাব্য রচনা করা সম্ভব, এই ধারণার জন্য মধুসূদন ইটালীর কবি ওভিদের নিকট ঋণী। কিন্তু 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু, কবিত্ব ও প্রকাশভঙ্গী—সমস্তই কবির নিজস্ব। ইহাতে এগারখানি পত্র আছে। প্রত্যেকটি পত্র নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে মনোহর—প্রত্যেকখানিতে

নব নব ভাব পল্লবিত। ভারতীয় পুরাণান্তর্গত রমণীগণের—যেমন, শকুন্তলা, জনা, দ্রৌপদী প্রভৃতির পত্র ইহাতে আছে। কোনও পত্রে অপরূপ করুণ-কোমলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোনটিতে বা গাম্ভীর্য্য ও তেজ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র ছন্দ অমিত্রাক্ষর। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র পর 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং উহার পরে 'বীরাঙ্গনা কাব্য'—এই তিনখানি কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। তিলোত্তমাসম্ভবে অথবা মেঘনাদবধে অমিত্রচ্ছন্দের যেটুকু দোষ ছিল, তাহা 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' লোপ পাইয়াছে। এই কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ পূর্ণ-পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি ভাষায় যে কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহার দ্বারা ইহার সংস্কার অথবা উন্নতিসাধন হয় নাই; পরবর্ত্তী যুগের কবিদিগের দ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু কবি মধুসূদনের গৌরব এই যে, তিনি বাঙ্গলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন ও চরম উৎকর্ষ-সাধন উভয়ই করিয়া গিয়াছেন। মধুসূদনের পরে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গলার প্রতিভাশালী কবিগণ অমিত্রচ্ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে কাহারও ছন্দ মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' ছন্দ অপেক্ষা উন্নততর হয় নাই।

মধুসূদন একবার তাঁহার বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন—"I want to introduce the sonnet into our literature"—অর্থাৎ আমি আমাদের সাহিত্যে সনেট-জাতীয় কবিতা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহি। যে কবি একদিন বাঙ্গলা ভাষার প্রতি অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন, অথচ যিনি কেবলমাত্র জিদের বশে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিলেন—যিনি ইটালীয় মিশ্র-ছন্দের আদর্শে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র মিশ্র-ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কি? তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে সনেট-জাতীয় কবিতা রচনা করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! সনেট-জাতীয় কবিতা বাঙ্গলায় ছিল না। মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম এই শ্রেণীর কবিতা বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্ত্তন করিয়া ইহার রচনার আদর্শ এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পরবর্ত্তী কবিদিগের জন্ত একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন।

সনেট-সমূহ—অর্থাৎ 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের এক অভিনব কীর্ত্তি। এই জাতীয় কবিতা কবির হৃদয়ের আলেখ্যস্বরূপ। ইহাতে

কবির ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাব স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়। তাই মধুসূদনের হৃদয়ের পরিচয় পাইতে হইলে, তাঁহার 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' পড়িতে হইবে। বিজাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেও কবি যে তাঁহার ভাষা-জন্মভূমি বাঙ্গলাকে কত ভালবাসিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় এই 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা'সমূহ পাঠ করিয়া। মধুসূদন যখন ইউরোপে ছিলেন, তখন সেই সুদূর প্রবাসে বসিয়া তিনি এই সকল কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু সেই দূরদেশে বসিয়া কবি স্কাইলার্ক পাখী অথবা ড্যাফোডিল্ ফুলের বিষয়ে কবিতা রচনা করেন নাই। প্রবাসী কবির মনে পড়িয়াছে জন্মভূমির তুচ্ছতম দৃশ্যের কথা, স্বদেশের অতি সামান্য ছোটখাট জিনিসের কথা। স্বদেশের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তুচ্ছতম ব্যাপারটি কবি মধুসূদন হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা'র মধুসূদন ভারতের কবি জয়দেব, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। ভারতের দেবদেবী, বাঙ্গলার পূজাপার্ব্বণ, স্বীয় জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদের কথা, 'বউ কথা কও' পাখীর কথা, শ্রীমন্তের টোপর, ঈশ্বরী পাটনীর কথা—সকলই এক অভিনব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হইয়া কবির স্মৃতিপটে উদিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি, নিষ্ঠা এবং অনুরাগ প্রদর্শনই মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা'র মর্ম্মকথা।

মধুসূদন ইউরোপে অবস্থানকালে এই 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' ভিন্ন আর কিছুই রচনা করেন নাই। ইউরোপ হইতে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি আর উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা করেন নাই। 'মায়াকানন' এবং 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামক দুইখানি নাটক তিনি ইউরোপ হইতে ফিরিয়া লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ঐ দুইখানি গ্রন্থ অসমাপ্তই থাকিয়া যায়। বিজয় সিংহের সিংহল-বিজয় বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া তিনি একখানি মহাকাব্য রচনা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছাও তাঁহার ফলবতী হয় নাই।

মধুসূদন অতি অল্পকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে এবং ঐ অল্পসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াই তিনি মাতৃভাষার যে উন্নতিসাধন করিয়া যান, তাহাতে তাঁহার সহিত এক রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কোনও কবির তুলনা

হয় না। তিনি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার দ্বারা মাতৃভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গলা ভাষার যে উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাসে তাঁহার স্থান চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যুর পরে সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, "মহাকবির সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখসাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য-নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক। বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবি-শূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।" সত্যই মধুসূদনের বিয়োগে বঙ্গসাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছিল, হেমচন্দ্র ঐ শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের আবির্ভাবের সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যে পৌরাণিকী আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া মহাকাব্য রচনার একটা ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই ধারাটিকে অব্যাহত রাখিয়াছিলেন হেমচন্দ্র। মধুসূদনের মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' আর হেমচন্দ্রের মহাকাব্য 'বৃত্রসংহার' ও 'বীরবাহু কাব্য'। শুধু মহাকাব্য রচনায় হেমচন্দ্রের প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি অতি উৎকৃষ্ট খণ্ড-কবিতা এবং কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি বঙ্গসমাজে সমাদৃত হইয়াছিল। 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'বৃত্রসংহার কাব্য', 'বীরবাহু কাব্য', 'ছায়াময়ী', 'দশমহাবিদ্যা', 'চিত্তবিকাশ' ও 'কবিতাবলী' হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। হেমচন্দ্রের কাব্য ও কবিতায় এমন একটা সহজ সরল সঙ্গীত ও মাধুর্য্য আছে, এমন একটা স্বদেশপ্রিয়তা ও বীররসের স্থায়িভাব উচ্ছ্বসিত হইয়াছে যে, তাহার ফলে তাঁহার কবিতা বাঙ্গালীমাত্রেই অতিশয় অনুরাগের সহিত এককালে আবৃত্তি করিতেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে,—বাঙলা ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে কবি হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র ইঁহার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হেমচন্দ্র তাঁহার গ্রামেরই পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। অতঃপর হেমচন্দ্রের মাতামহ তাঁহাকে কলিকাতায় খিদিরপুরে লইয়া আসেন। এইখানে থাকিয়াই তাঁহার উচ্চশিক্ষা আরম্ভ হয়। তাঁহাকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। সেখানেই তিনি পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি ঐ বিদ্যালয়ে এবং পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। হিন্দু কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। যখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করেন, সেই সময়ে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তাঁহার আর পাঠ করা সম্ভব হয় নাই। বাধ্য হইয়া তিনি ঐ সময়ে সামান্য বেতনে চাকুরী করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কবির আকাঙ্ক্ষা ছিল উচ্চ এবং তাঁহার উৎসাহ ও ধৈর্য্য ছিল অদম্য। তাই অফিসে কেরাণীগিরি করিতে করিতেই তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং কলিকাতার ট্রেণিং স্কুলে শিক্ষকতা-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই শিক্ষকতা-কার্য্য করিতে করিতে হেমচন্দ্র বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং শ্রীরামপুরে মুন্সেফ নিযুক্ত হন। কয়েকমাস মুন্সেফীর কার্য করিয়া স্বাধীনচেতা কবি, স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিবার মানসে মুন্সেফী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ওকালতিতে ইঁহার যশ অতি অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অনতিকালমধ্যে তিনি সরকারী উকিলের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ সময়ে তিনি যথেষ্ট অর্থ ও সম্মান লাভ করেন। কিন্তু শেষ জীবনের জন্য হেমচন্দ্র এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করেন নাই। তাঁহার হৃদয় কবি-সুলভ কোমল ছিল। তাই যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহা আত্মপর না ভাবিয়া—পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া, দান করিয়া ফেলিতেন। এই কারণে শেষ জীবনে তাঁহাকে দারুণ অর্থকষ্টে ভুগিতে হইয়াছিল। উপরন্তু, কবি শেষ জীবনে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার আর দুঃখের অবধি ছিল না। একে অর্থকষ্ট, তাহার উপর অন্ধ—এই অবস্থায় তাঁহার শেষ জীবন দারুণ দুঃখে অতিবাহিত হয়। যিনি একদিন মুক্তহস্তে দান করিয়া কত দুঃখীর দুঃখ দূর করিয়াছিলেন, সেই কবিকে এই সময়ে দেশের লোকের বদান্যতার

উপর নির্ভর করিয়া দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে দিন-যাপন করিতে হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের বন্ধুস্থানীয় ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণের উদ্যোগে যে চাঁদা সংগৃহীত হইত, তাহাতেই কবির দিন চলিত। আর গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক ২৫৲ বৃত্তি দিতেন। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! যিনি একদিন কতজনকে কত পঁচিশ টাকা দান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে গভর্ণমেণ্টের নিকট মাসিক পঁচিশ টাকা মাত্র পাইবার জন্য হাত পাতিতে হইত। এইরূপ অর্থকষ্ট ও মনোকষ্ট সহ্য করিয়া কবিবর হেমচন্দ্র ১৩২০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ অনন্তধামে গমন করিলেন। হেমচন্দ্র অনন্তে মিশাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কাব্য-কীর্তি অনন্তকাল ধরিয়া বঙ্গের সারস্বত-কুঞ্জে উজ্জ্বল রহিবে।

হেমচন্দ্র যখন হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময়েই তাঁহার কবি-প্রতিভার উন্মেষ হয়—তিনি তখন হইতেই কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। 'চিন্তাতরঙ্গিণী' কবিবরের প্রথম পুস্তক। পুস্তকখানি হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উহা জন-সমাজে সমাদৃত হয়।

অতঃপর কবির বিখ্যাত কবিতা 'ভারত-সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়। কবিবরের তীব্র স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতি-প্রীতি ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা এই 'ভারত-সঙ্গীতে'র প্রতিটি ছত্রে অভিব্যক্ত। স্বাধীনতার জয়গান ও ভারতের অতীত গৌরবকে উজ্জ্বলবর্ণে রূপায়িত করিয়া তুলিয়া, নির্জ্জীব নিশ্চেষ্ট আধুনিক ভারতকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দান করাই 'ভারত-সঙ্গীতে'র অন্যতম উদ্দেশ্য। ভারতবাসীকে স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কবি 'ভারত-সঙ্গীতে' গম্ভীর শঙ্খধ্বনি করিয়াছেন। সেই উদাত্ত ধ্বনি স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে প্রজ্বলিত করিয়া তুলে, তূরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করিয়া তুলে।—

বাজ রে শিঙ্গা, বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে.
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!
আরব্য মিশর, পারশ্য তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,

দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!

* * * *

কিসের লাগিয়া হলি দিশে হারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান-বুদ্ধি-জ্যোতিঃ, তেমনি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়িয়া লুটাও!
অই দেখ! সেই মাথার উপরে,
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপ দিক শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল!
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্বে হবে না উজ্জ্বল?
বাজ রে, শিঙ্গা, বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?

স্বজাতির অধঃপতন দেখিয়া কবিচিত্ত ব্যথিত হইয়াছে। তাই দুঃখিত-চিত্তে জাতিকে ভৎর্সনা করিয়া কবি 'ভারত-সঙ্গীতে'র আর এক স্থানে বলিয়াছেন—

হয়েছে শ্মশান এ ভারত-ভূমি!
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি!
আর কি ভারত সজীব আছে?

স্বাধীনতার জয়গান করিয়া কবিতা রচনায় হেমচন্দ্র যেমন নিপুণতা দেখাইয়া গিয়াছেন, ভক্তিরসাশ্রিত কবিতা রচনায়ও তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কবির 'ভারত-সঙ্গীতে' স্বজাতিপ্রীতি উচ্ছ্বসিত

হইয়াছে, আর 'দশমহাবিদ্যায়' ভক্তিরস উৎসারিত হইয়াছে। 'দশমহাবিদ্যা' ধর্মভাবমূলক উচ্চাঙ্গের গীতি-কবিতা। এই কাব্যে শিবের বিলাপ অপূর্ব। এই অংশে কবি নূতন এক ছন্দ উদ্ভাবন করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে ছন্দের ক্ষেত্রে কবির সৃজনীপ্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে—

'রে সতি! রে সতি কান্দিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ॥'

হেমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকৃতি তাঁহার 'বৃত্রসংহার কাব্য'। মেঘনাদবধ-কাব্যের ন্যায় ইহাও মহাকাব্য। মেঘনাদবধের ন্যায় 'বৃত্রসংহার কাব্যে'ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কল্পনার সমন্বয় ঘটিয়াছে।

হেমচন্দ্র মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। খুব সম্ভবতঃ সেই সময়ে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অনুকরণে, এবং ঐরূপ প্রণালীতে একখানি কাব্য রচনা করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা জন্মে। বৃত্রসংহার সেই ইচ্ছার ফল।

মহাভারতে বনপর্বে বৃত্রবধের উপাখ্যান আছে। মহাভারত-বর্ণিত এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া 'বৃত্রসংহার কাব্য' পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারতে আছে যে, শঙ্করের বরে বৃত্র অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী হয়। অতঃপর সে দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। স্বর্গরাজ্য-চ্যুত হইয়া দেবগণ পাতালে গমন করেন, ইন্দ্রপত্নী শচী নৈমিষারণ্যে গমন করেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র নিয়তির আরাধনার জন্য কুমেরু পর্বতে বহুকাল বাস করেন। বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলা ঐশ্বর্য্য-গর্বে গর্বিতা হইয়া শচীকে দাসী করিবার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া স্বর্গমধ্যে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন ও অপমানিত করেন। ওদিকে ইন্দ্র নিয়তির উপাসনা শেষ করিয়া শঙ্করের নিকট গমন করিলে, তিনি দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্রনির্মাণ করাইয়া তাহা দিয়া বৃত্রবধ করিবার উপদেশ দেন। শচীর অপমানে কুপিতা গৌরী বৃত্রাসুরের ভাগ্যলিপি খণ্ডন করিলেন। অনন্তর দেব ও দানবে তুমুল সংগ্রাম হইল। শেষ পর্য্যন্ত দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা যে বজ্র নির্মিত হইয়াছিল, তাহার আঘাতে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। বৃত্রাসুরের

পুত্র রুদ্রপীড় ইন্দ্রের শরজালে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণ হারাইল। আর গর্ব্বিতা ঐন্দ্রিলার সকল দর্প চূর্ণ হওয়ায় সে হতাশায় উন্মত্ত হইয়া দেশে দেশে উন্মাদিনীর ন্যায় পর্য্যটন করিতে লাগিল।—ইহাই বৃত্রসংহারের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান। কিন্তু মহাভারত-বর্ণিত এই সংক্ষিপ্ত বৃত্রবধ উপাখ্যান কবির কল্পনাবলে এক বিশাল কাব্যে পরিণত হইয়াছে। অঙ্কুরে ও বৃক্ষে যেরূপ প্রভেদ—মহাভারতোক্ত কাহিনীতে ও কবিরচিত 'বৃত্রসংহার কাব্যে' সেইরূপ প্রভেদ। বৃত্রসংহারে হেমচন্দ্র যে-সকল চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা মনোরম ও স্বাভাবিক হইয়াছে। উহা হইতে চরিত্রসৃষ্টিতে কবির দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'বৃত্রসংহার কাব্যে'র প্রধানা নায়িকা ইন্দুবালা। তাহার অন্তর স্নেহে পরিপূর্ণ, তাহার হৃদয় বড় কোমল। সে স্বার্থশূন্যা, শত্রুপক্ষের শোণিতপাতেও তাহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাহার পতি রণে উন্মত্ত—দেবাসুরের সেই যুদ্ধে তিনি কত-শত যোদ্ধার প্রাণনাশ করিতেছেন। ইহাতে কত-শত রমণীর পতি, কত-শত মাতার সন্তান গতাসু হইয়াছেন, এই কথা চিন্তা করিয়া ইন্দুবালা আকুলা।—

"পুত্র-শোকাতুরা আহা মাতার রোদন,
সখি রে বিদরে হিয়া, বিদরে লো প্রাণ
স্বামিহীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন;
ভগিনীর খেদ-স্বর ভ্রাতার বিয়োগে!
হায়, সখি! বল্ তোরা—বল্ কি উপায়ে
দনুজের এ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারি!
এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল্,
নিবাই সমরানল তনু সমর্পিয়া।"

বাস্তবিক এরূপ আদর্শ-চরিত্র দেখা যায় না। শত্রুর রক্তপাতেও ইন্দুবালার প্রাণ কাঁদিয়াছে। ইন্দুবালার চরিত্র এক অপরূপ কারুচিত্র। পরদুঃখকাতরতা ও কোমল-মধুরতা তাহার চিত্রটিকে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে।

শুধু ইন্দুবালার চরিত্র নহে। 'বৃত্রসংহার কাব্যে'র প্রত্যেকটি চরিত্র আপন আপন বৈশিষ্ট্যে মনোহর। বৃত্র, ঐন্দ্রিলা, রুদ্রপীড়, শচী, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং দধীচির চরিত্র অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। বৃত্রাসুর ও

তাহার পুত্র রুদ্রপীড়ের বীরত্ব আমাদিগকে রাবণ ও মেঘনাদের কথা মনে করাইয়া দেয়। ঐন্দ্রিলার গর্ব্ব, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সহিষ্ণুতা, দধীচির পরোপকারের জন্য আত্মত্যাগ—এ সকল ব্যাপার পাঠ করিয়া মুগ্ধ না হইয়া উপায় নাই।

'বৃত্রসংহার কাব্যে' পরহিত-ব্রতের অতুলনীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইন্দ্রের দধীচির আশ্রমে গমন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন এবং দেবগণের মঙ্গলের জন্য দধীচির দেহত্যাগের মত উদার, গম্ভীর ও সকরুণ দৃশ্য বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্রের মত আর কোনও কবি আঁকিয়া দেখাইতে পারেন নাই।

'বৃত্রসংহার কাব্যে'র আদ্যন্ত স্বদেশানুরাগের স্রোতটি অব্যাহতভাবে রহিয়াছে। ইহাতে স্বদেশপ্রীতির কথা আছে—আর আছে পরহিতের জন্য অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের কথা। সেই হিসাবে এই কাব্যখানি বাঙ্গলার জাতীয় সাহিত্যের গৌরব। মধুসূদনে আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি প্রচলিত পৌরাণিকী আখ্যায়িকাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে জাতীয় আদর্শটি হীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হেমচন্দ্র পৌরাণিকী আখ্যায়িকাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাতে রং ফলাইয়াছেন। তিনি অমুকৃত কাহিনীটিকে উন্নত করিয়াছেন। ফলে জাতীয় আদর্শটি বেশ উজ্জ্বল বর্ণে অভিব্যক্ত হইয়াছে। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে জাতীয় ভাবের অভাব। কিন্তু হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে জাতীয়তাই মজ্জাগত।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মত হেমচন্দ্র তাঁহার 'বৃত্রসংহার কাব্য' আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করেন নাই। ইহাতে তিনি মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর এই উভয়বিধ ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন। ছন্দের বিচিত্রতা এবং মাধুর্য্য সম্পাদন করিবার জন্য কবি এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ছন্দের উপর কবির অধিকারের পরিচায়ক নহে। এক অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে বিচিত্র সুর ও মাধুর্য্য ফুটাইতে মধুসূদন সক্ষম হইয়াছিলেন, হেমচন্দ্র তাহা পারেন নাই বলিয়াই তিনি বিচিত্র ছন্দের আশ্রয় লইয়াছেন।

মধুসূদন যেমন তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্যে' স্থানে স্থানে বীররস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, বৃত্রসংহারের অনেক স্থলেই সেইরূপ বীররস উৎসারিত হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হয় যে, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র এই দুই কবি, বঙ্গের কবিতার রীতিপ্রবাহ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। করুণরসের একতন্ত্রীটা ছাঁটিয়া ফেলিয়া

ইঁহারা গম্ভীর তানপুরার সঙ্গে তাঁহাদের ওজস্বী পুরুষোচিত কণ্ঠ মিলাইয়া বাঙ্গালীকে এক নূতন সঙ্গীত-রসের রসিক করিয়া তুলিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র বিবিধ বিষয় লইয়া কাব্যরচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি পৌরাণিক-আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। তিনি রাজনীতিবিষয়ক কবিতা লিখিয়াছেন, ধর্ম্মবিষয়ক কবিতা রচনা করিয়াছেন. সমাজ সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিয়াছেন, জন্মভূমির গৌরব কীর্ত্তন করিয়া তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার কাব্য ও কবিতাসমূহ হইতে বীর ও করুণ এই উভয়বিধ রসই উৎসারিত হইয়াছে। মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যই তাঁহার কাব্য ও কবিতার গুণ। এতদ্ভিন্ন অধিকাংশ কাব্যেই তাঁহার স্বদেশানুরাগের পূর্ণ বিকাশ দেখা গিয়াছে। স্বদেশপ্রীতি তাঁহার অধিকাংশ কাব্য ও কবিতার মূলগত ভাব —একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার খণ্ড-কবিতার সমষ্টি 'বিবিধ কবিতা', 'কবিতাবলী' প্রভৃতিতে কল্পনার বিকাশ, শব্দমাধুর্য্য, ছন্দনৈপুণ্য প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

বঙ্গভাষার পরিপুষ্টির জন্য হেমচন্দ্র অনুবাদ, অনুকরণ ও উদ্ভাবন সকলই করিয়া গিয়াছেন। এ্যালেক্জাণ্ডার পোপ, টেনিসন, ড্রাইডেন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের কবিতার তিনি সুন্দর সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন। কাব্যরচনায় তিনি বিদেশী সাহিত্য হইতে আখ্যায়িকা, ভাব, উপমা ইত্যাদি আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে নূতন আকর্ষণী শক্তি সঞ্চার করেন। সৃষ্টির উপকরণের জন্য তিনি বাঙ্গালী কবি কাশীরাম দাস, হিন্দী কবি তুলসীদাস, অথবা ইংরেজ কবি সেক্সপীয়ার, শেলী প্রভৃতি—কাহারও দ্বারস্থ হইতে লজ্জাবোধ করেন নাই। ঐ সকল উপকরণ হেমচন্দ্রের কাব্যে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহার 'বৃত্রসংহার কাব্যে'র কথা বলা যাইতে পারে। 'বৃত্রসংহার কাব্যে' তিনি মহাভারতের পুরাতন কাহিনীকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। তিনি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, সুন্দর গীতিকাব্যও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে স্বদেশপ্রেমের বজ্রনির্ঘোষ বাজিয়াছে, করুণরস উৎসারিত হইয়াছে। আবার তাঁহার হাস্যরস-সমন্বিত কবিতাবলীতে স্বদেশের লোক প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছে।

হেমচন্দ্রের কাব্যে বৈষ্ণব কবিগণের মাধুর্য্য, কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের প্রাঞ্জলতা, কবিকঙ্কণের চরিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা, ভারতচন্দ্রের পদলালিত্য, ঈশ্বর

গুপ্তের ব্যঙ্গরসিকতা বিদেশী ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অপরূপ এক মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহাতে তাঁহার কাব্য বৈচিত্র্যের সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

কবি বার্ণস্ যেমন স্কটল্যাণ্ডবাসীদিগের জাতীয় কবি—তিনি যেমন স্কটল্যাণ্ডবাসীদিগের প্রাণে প্রবেশ করিয়াছেন,—হেমচন্দ্র তেমনি বাঙ্গলার জাতীয় কবি। তাঁহার কবিতার নিরাভরণ সরলতা বাঙ্গালীর প্রাণের দ্বারে পৌঁছিয়াছে। তাঁহার কবিতা বাঙ্গালীর প্রাণে আশা উন্মাদনার সঞ্চার করিয়াছে। চিরপরাধীন এই দেশে তাঁহার কবিতার মধ্য দিয়াই স্বাধীনতার পাঞ্চজন্য বাজিয়াছে।

নবীনচন্দ্র সেন

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র—এ তিনজনেই আধুনিক যুগের প্রথম ভাগের কবি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের আসরে মধু, হেম ও নবীন প্রায় এক সময়েই আবির্ভূত হন। প্রথমে মধুসূদন ও পরে হেম, নবীনের আবির্ভাবে বঙ্গসাহিত্য বেশ ভাল করিয়াই আধুনিকতার দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর বাঙ্গলার সাহিত্যস্রোত এক নূতন পথ ধরিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে পথে বৈচিত্র্য অনেক, নূতনত্বও অনেক। বিশেষতঃ, বঙ্গসাহিত্যের আসরে নবীনচন্দ্রের যখন আবির্ভাব হইল, তখন মধ্যযুগের দেবদেবীর কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত মঙ্গলকাব্য অথবা ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্য যে বাঙ্গলার সমাজে আর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, এ সম্ভাবনা রহিল না।

নবীনচন্দ্র ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা ১২৫৩ সালের মাঘ মাসে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি আজীবন তাঁহার 'সরিৎমালিনী শৈলকিরীটিনী চট্টলাকে' নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল গোপীমোহন সেন। ইনি মুন্সেফ ছিলেন।

পাঠ্যাবস্থায়ই নবীনচন্দ্র কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং পাঠ্যাবস্থায়ই ইঁহার বহু কবিতা বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া ঐ সকল পত্রিকাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। কবির প্রথম বয়সের এই সকল কবিতাবলী তাঁহার 'অবকাশরঞ্জিনী' নামক কবিতাগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 'অবকাশরঞ্জিনী'ই নবীনচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

'পলাশীর যুদ্ধ' কবির দ্বিতীয় কাব্য। এই কাব্য-গ্রন্থখানি প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নবীনচন্দ্র কবিযশ লাভ করেন এবং বহু-বিখ্যাত হইয়া পড়েন। 'পলাশীর যুদ্ধ'-খানি মহাকাব্য। মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবের পরে ও তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনার পর বঙ্গসাহিত্যে মহাকাব্য রচনার একটা উৎসাহ জাগিয়াছিল। সে যুগের সেই প্রেরণাই নবীনচন্দ্রকে মহাকাব্য রচনায় উৎসাহিত করিয়াছিল।

নবীনচন্দ্রের কাব্যের মূলকথা দেশপ্রীতি। কাব্যের মধ্যে দেশানুরাগ প্রকাশ করা নবীনচন্দ্রের সাহিত্যের বিশেষত্ব। 'পলাশীর যুদ্ধ' কবির প্রথম বয়সের রচনা হইলেও, ইহার মধ্য দিয়া তাঁহার স্বদেশপ্রেম এবং অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির জন্য তীব্র বেদনা খুব স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। নবাব সিরাজের জীবন-নাট্যের যবনিকা পতন, অথবা চতুর বীর ক্লাইভের বীরপণা নবীনচন্দ্রের উন্নত প্রতিভাকে আকৃষ্ট করে নাই। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির ভীরুতা ও মানসিক হীনতা দর্শনে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইয়াছে। সেই ভীরুতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও মানসিক হীনতার জন্য বাঙ্গালী যে তাহার স্বাধীনতারূপ দুর্লভ রত্ন হারাইল, উহা কবির অন্তরে তীব্র অনুশোচনার সৃষ্টি করিয়াছে। কবি যে স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন, পরাধীনতার গ্লানি যে তাঁহাকে কি রকম পীড়িত করিত, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি হইতে তাহা সপ্রমাণ হইবে—

পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস !

স্বাধীনতা হারাইবার জন্য কবির যে দারুণ অন্তর্দাহ, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে 'পলাশীর যুদ্ধে'। সুতরাং স্বাধীনতার জয়গান এবং পরাধীনতার গ্লানির জন্য ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত কবিহৃদয়ের বাষ্পোচ্ছ্বাসই এই কাব্যের মর্মকথা। এই কাব্যে মোহনলালের ভিতর আমরা কবিরই অনুতপ্ত আত্মার পরিচয় পাইয়াছি। যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের মুখ দিয়া কবির নিজেরই প্রাণের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। কবিরই অন্তরের ক্রন্দন মোহনলালের বাণীতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বাঙলার স্বাধীনতার শেষ দিনে মোহনলালের যে ক্রন্দন, উত্তেজনা ও উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী—উহা যেন কবির অন্তরের কথা বলিয়াই মনে হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে বীর মোহনলালের গর্জ্জন—বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ও যবন-সেনার প্রতি তাহার তিরস্কার যেন আমাদের কর্ণে আজিও ধ্বনিত হইতেছে—

"দাঁড়া রে! দাঁড়া রে ফিরে! দাঁড়া রে যবন!
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ!
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"—
গর্জ্জিল মোহনলাল—"নিকট শমন
আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন।"

* * *

সেনাপতি! ছি ছি এ কি! হা ধিক্ তোমারে
কেমনে বল না হায়!
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে!
ওই দেখ ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ!
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির?
দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর?

* * *

নিশ্চয় জানিও রণে হ'লে পরাজয়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল-ভার
ঘুচিবে না জন্মে আর,
অধীনতা-বিষে হবে জীবন সংশয়!
যেই হিন্দুজাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দুজাতি সনে,
নিশ্চয় জানিবে মনে,
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত।

অধীনতা অপমান, সহি' অনিবার,
কেমনে রাখিবে প্রাণ,
নাহি পাবে পরিত্রাণ,
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক হইবে অঙ্গার !

পরাধীনতার দুঃখ ও গ্লানি যে কত দুঃসহ, মোহনলাল সে কথাও সকরুণভাবে বলিয়াছেন। সে বিলাপ স্বয়ং কবিরই বলিয়া মনে করা যাইতে পারে—

সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বৎসর,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত
করে অনিবার, প্রীত
বরঞ্চ হইব তাহে, তবু হা ঈশ্বর !
একদিন—একদিন—জন্ম-জন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন,
যন্ত্রণা অপরিসীম
নাহি সহি যেন নর-গৃধিনীর করে !

অতঃপর যেদিন বঙ্গের সৌভাগ্য-রবি চিরতরে অস্তমিত হইল—সেদিনও মোহনলাল স্বাধীনতার জন্য করুণ বিলাপ করিয়াছেন। নিশাবসান হইবামাত্র বঙ্গদেশ ইংরেজের নিকট পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে একথা উপলব্ধি করিয়া সে বলিয়াছিল—

কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র কিরণ
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি !
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন,
আসিবে যবন-ভাগ্যে বিষাদ রজনী !
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্দ্দয় অন্তরে
ডুবায়ে যবন-রাজ্য যেয়ো না তপন !
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে,
কি দশা দেখিয়া, আহা ! ডুবিছ এখন !
পূর্ণ না হইতে অর্দ্ধ আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমনে !

গভীর অনুশোচনাবশতঃ সে বলিয়াছে—

নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গে আজি শোক-সিন্ধু-জলে?
যাও তবে, যাও দেব! কি বলিব আর?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে।
কি কাজ বল না, আহা! ফিরিয়া আবার?
ভারতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ!
কালি পূর্ব্বাশার দ্বার খুলিবে যখন
ভারতে নবীন দৃশ্য করিবে দর্শন।

'পলাশীর যুদ্ধে' কবি বাঙ্গালীচরিত্রের দুর্ব্বলতা অতি অল্প কথায় সুন্দররূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

স্বর্গ মর্ত্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে দুর্জ্জয়!
কার্য্যকালে খোঁজে সব নিজ নিজ পথ।

দেশানুরাগের আদর্শের কথা বাদ দিলেও, কাব্য হিসাবে নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' একখানি অনবদ্য সৃষ্টি। কল্পনার লীলায় ও বিকাশে, ছন্দের মাধুর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে, ভাষার লীলাচাঞ্চল্যে ও গতির দ্রুততায়, বাঙ্গালীর মর্ম্মকথা প্রকাশে বঙ্গসাহিত্যে আজিও দ্বিতীয় 'পলাশীর যুদ্ধ' রচিত হয় নাই। কবির এই সৃষ্টি এখনও একভাবে বঙ্গসাহিত্যের আসরে দাঁড়াইয়া কবির যশোগাথা কীর্ত্তন করিতেছে।

'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যখানির ছন্দ অমিত্রাক্ষর। নবীনচন্দ্র ছিলেন ছন্দকুশল কবি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবেগ, গতি ও সৌষ্ঠবের অভাব হেমচন্দ্রে মাঝে মাঝে ঘটিয়াছে। কিন্তু নবীনচন্দ্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবেগ, গতি ও সৌষ্ঠব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের দেশপ্রীতির দ্বিতীয় চিত্র 'রঙ্গমতী'। এই কাব্যের ঘটনা-ক্ষেত্র কবির জন্মভূমি চট্টগ্রাম। কবি তাঁহার স্বীয় জন্মভূমির সৌন্দর্য্যে বিস্মিত ও আত্মহারা হইয়া স্বাধীনতার সঙ্গীত গাহিয়াছেন এবং দেশমাতার চরণতলে

আত্মবিসর্জ্জন দিয়া তাহার কল্যাণকামনা করিয়াছেন। কল্পনার ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া দেশের অধ্যাত্মভাবকে জাগাইয়া তুলিয়া একটা বিরাট জাতি গড়িবার অভিলাষকে নবীনচন্দ্র প্রচার করিয়াছেন তাঁহার 'রঙ্গমতী'তে। সেই হিসাবে ইহা একাধারে স্বাধীনতামূলক এবং অধ্যাত্ম-ভাবমূলক কাব্য।

অতঃপর কবি তাঁহার বিখ্যাত কাব্যত্রয়—রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস রচনা করেন। 'পলাশীর যুদ্ধে'র মত এই তিনখানি কাব্যকেও মহাকাব্য বলা যায়। এই কাব্যত্রয়ে কবি পৌরাণিক মহাভারতের আখ্যায়িকাকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন। প্রত্যেকখানি কাব্য মহাভারতের পৌরাণিক উপাখ্যানের অংশবিশেষ লইয়া রচিত। কিন্তু প্রত্যেকটি কাব্যে কবি মহাভারতের অলৌকিক ঘটনাবলীকে পরিবর্ত্তিত করিয়া এবং নূতন সাজে সজ্জিত করিয়া এক অভিনব ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যত্রয়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অবতারশ্রেণী হইতে মানবত্বের শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়া তাঁহার পূজা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে দেবতা নহেন—তিনি এক বিরাট পুরুষ। এই কাব্যত্রয়ের শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ব্যাসদেব শৌর্য্য, মহত্ত্ব এবং জ্ঞানের অবতার। মানুষীশক্তির আতিশয্যে ইঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া ভ্রম হয় মাত্র। কিন্তু ইঁহারা সবাই মানুষ। এই কাব্য তিনখানির মূলকথাও স্বদেশপ্রীতি। কবির স্বদেশ-প্রীতি এই তিনখানি কাব্যে নূতনরূপে প্রকাশিত। দেশের অন্তরে ভগবানের অনুভূতিকে জাগাইয়া তুলিয়া, ভগবদ্ভক্তির আনন্দময় স্রোত প্রবাহিত করিয়া, দেশকে নীতির দিক দিয়া উন্নত ও ধর্ম্মপ্রাণ করিয়া তুলিবার যে আকুল প্রয়াস—তাহাই নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে প্রকাশ পাইয়াছে। কবি এই কাব্যত্রয়ে প্রেমময় ও কর্ম্মময় শ্রীকৃষ্ণকে মহাভারতের অলৌকিক ঘটনা-রাশির মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন এবং তাঁহাকে ভারতের ধর্ম্ম-সংস্কারক ও মহা-ভারতপ্রতিষ্ঠাতারূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এক বিশাল একতাবদ্ধ জাতিগঠনের অভিলাষ প্রকাশ পাইয়াছে এই কাব্যত্রয়ে। এই কাব্যত্রয়ে অন্তর্বিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহে খণ্ডিত ভারতের অবনতি ও ধ্বংস নিবারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একটা বিশাল ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য—যাহাকে কবি বলিয়াছেন 'মহাভারত'—এবং এক বিরাট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছেন। এই পুণ্য ভারতভূমিতে 'এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক রাজ্য' স্থাপনের প্রয়াসী হইয়া কবি এক উচ্চ আদর্শের মহতী বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। খণ্ড ভারতে রাজ্যভেদ ভুলিয়া, গৃহভেদ ভুলিয়া, জাতিভেদ

ভুলিয়া, স্বার্থপরতা ভুলিয়া,—ভারতে প্রেমময়, প্রীতিময় পবিত্রতাময় 'মহাভারত' স্থাপনের মহাব্রত গ্রহণ করিবার জন্ত কবি উপদেশ দিয়াছেন।

এক ধর্ম, এক জাতি এক রাজ্য, এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি-সর্ব্বভূতহিত ;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম লক্ষ সে পরম ব্রহ্ম—
'একমেবাদ্বিতীয়ম্'! করিব নিশ্চিত,
এই ধর্মরাজ্য 'মহাভারত' স্থাপিত।

কবি বলিয়াছেন যে, সমস্ত ভারতবাসী এক মহাজাতিসঙ্ঘে পরিণত হইলে, জাতিভেদ, ধর্মভেদ সকল বৈষম্য ভুলিয়া এক ভিত্তিতে সকলে প্রতিষ্ঠিত হইলে,—সকল প্রকার হীনতা সঙ্কীর্ণতা স্বার্থপরতা খণ্ডতা অপসারিত হইলে, ব্যাসের জ্ঞানবল ও অর্জ্জুনের বাহুবল সম্মিলিত হইলে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে।

নবীনচন্দ্র কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সাম্যের মহিমা প্রচার করেন নাই। তিনি বুদ্ধদেবের সাম্যবাদের চারুচিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার 'অমিতাভ' নামক কাব্যে। 'অমিতাভ' কাব্যে জন্ম হইতে মহানির্ব্বাণ পর্য্যন্ত বুদ্ধদেবের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। কবি মহাপুরুষ যীশু খৃষ্টের জীবনী অবলম্বন করিয়াও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যখানির নাম 'খৃষ্ট'। তবে, কি শ্রীকৃষ্ণ, কি বুদ্ধ, কি খৃষ্ট—সকলেই তাঁহার কাব্যে মহাপুরুষরূপে চিত্রিত। কেহই দেবতার অবতাররূপে অঙ্কিত হন নাই।

নবীনচন্দ্রের রচিত যে কয়খানি গ্রন্থের নাম করা হইয়াছে, ইহা ভিন্ন তিনি গীতা ও চণ্ডীর পদ্যানুবাদ করেন, 'ভানুমতী' নামে একখানি গদ্য-পদ্যময় উপন্যাস রচনা করেন। 'প্রবাসের পত্র' এবং 'আমার জীবন' কবির গদ্য রচনা। 'আমার জীবনে' কবির বাল্য ও কৈশোরের জীবনকাহিনী সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

কল্পনামাধুর্য্য ও কবিত্ব প্রকাশের জন্য এবং স্বদেশানুরাগ প্রকাশের জন্ত নবীনচন্দ্রের কাব্যসমূহ বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্রে চিরদিন বিস্ময়ের বস্তু হইয়া থাকিবে।

আধুনিক গীতিকবিতার উন্মেষ ও বিকাশ
বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

যে যুগে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেম, নবীন প্রভৃতি কবিগণ Verse Tale বা কাহিনী-কাব্য এবং মহাকাব্য রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, ঠিক সেই যুগেই যে কবির কবিবীণায় খাঁটি গীতিকবিতার সুর ধ্বনিত হইতেছিল, তিনি কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কাহিনীকাব্য এবং মহাকাব্য রচনার একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিহারীলালের কবিপ্রতিভা সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া গীতিকাব্য রচনার দিকেই ধাবিত হইয়াছিল। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেম, নবীন প্রভৃতির মত বিহারীলাল ইতিহাস অথবা পুরাণের কাহিনীর উপর কাব্য-সৃষ্টির জন্য নির্ভর করেন নাই। তিনি নিজের প্রাণের কথা, নিজের উপলব্ধির কথা, সৌন্দর্য্যবোধের কথা নিজের সুরেই গাহিয়াছিলেন। প্রাচীন গীতিকবিদের সহিত তাঁহার প্রতিভার পার্থক্য ছিল। প্রাচীন গীতিকবিগণ তাঁহাদের কাব্যের নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়া নিজেদের ভাব-ভাবনা প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-গীতিকবিগণের পদাবলীতে রাধার বেনামী কবিগণের প্রেম-প্রীতি উৎসারিত হইয়াছে। কিন্তু বিহারীলাল নিজস্ব সুরে নিজের অনুভূতিকেই রূপায়িত করিয়াছিলেন। বিহারীলালই বাঙ্গলা গীতিকবিতার নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গলা গীতিকবিতাকে আধুনিকতার দীক্ষা দিয়াছিলেন। আধুনিক কবিদৃষ্টি ও কল্পনাদর্শ অনুযায়ী গীতিকবিতা রচনার পথপ্রদর্শক তিনিই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"এদেশে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য হইতে আনীত নব-গীতিকবিতার আদি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। মহাকাব্যের উচ্চ শিখর হইতে অবতরণ করিয়া গীতিকবিতার স্বর্ণসিংহদ্বার তিনিই বিশেষভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন।" একথা খুব সত্য। কারণ, আধুনিক বাঙ্গলা গীতিকবিতা রচনার প্রথম যুগে যে কয়জন গীতিকবির আবির্ভাব বাঙ্গলা সাহিত্যে হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ইঁহারা সকলেই বিহারীলালের প্রদর্শিত পথে চলিয়াছিলেন—বিহারীলালের কল্পনাদর্শে ইঁহারা সকলেই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

বিহারীলালের প্রতিভার অন্যতম বিশিষ্টতা এই যে, মহাকাব্য রচনার যুগে আবির্ভূত হইয়াও তিনি নব-গীতিকবিতার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন এবং উত্তরকালের কয়েকজন ক্ষমতাশালী কবিকে—এমন কি রবীন্দ্রনাথের মত বঙ্গসাহিত্যের যুগান্তরকারী কবিকে পর্য্যন্ত তাঁহার কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মহাকাব্যের যুগেই বিহারীলালের মধ্য দিয়া এই যে নব-গীতিকাব্যের প্রকাশ এবং উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাকে বঙ্গসাহিত্যের একটি শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। মহাকাব্য রচনার মূলে ছিল অনুকরণাত্মক প্রতিভা। কিন্তু বিহারীলালের প্রতিভা অনুকরণাত্মক ছিল না। তাঁহার কাব্যে কবির নিজের অনুভূতি অপূর্ব্ব রূপে ও রঙে মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। মাইকেল প্রভৃতি মহাকাব্য রচয়িতা কবিদিগের ভাষায় সংস্কৃত-বাহুল্য ছিল। কারণ, মহাকাব্য রচনার পক্ষে ঐরূপ ভাষাই উপযোগী। কিন্তু আড়ম্বরহীন সরল ভাষা লিরিক রচনার উপযোগী। লিরিকের ভাষা সূক্ষ্ম ধারাল। লিরিকে মহাকাব্যের মত বস্তুগৌরব না থাকিলেও, থাকে সুগভীর ভাব-ভাবনা ও অনুভূতি এবং কবির সেই অনুভূতি প্রকাশ পায় সরল অনাড়ম্বর ভাষায়। বিহারীলালের মধ্যে এই বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার কল্পনাদর্শ যেমন নূতন ছিল, তাঁহার ভাষা ও ছন্দ ছিল তেমনি নূতন।

বিহারীলাল ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার নিমতলা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্ত্তী। বিহারীলাল সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কবিতা রচনার শক্তি ইঁহার বাল্যেই বিকাশলাভ করিয়াছিল।

যৌবনে ইনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর সহিত পরিচিত হন এবং রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব হয়। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপূর্ব্ব কবিতাবলী রচনা করিতেছিলেন। 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' নামক কাব্যখানি আজিও দ্বিজেন্দ্রনাথের অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতেছে। ইহার মধ্য দিয়াও খাঁটি লিরিক কাব্যরস উৎসারিত হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত বন্ধুত্ব হইলে পর দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিহারীলাল পরস্পরের প্রভাবে কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার কবি-বন্ধু সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—"বিহারীবাবু সর্ব্বদাই কবিত্বে মশগুল থাকিতেন। তাঁহার হাড়ে হাড়ে, প্রাণে প্রাণে কবিত্ব ঢালা ছিল। তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহা অপেক্ষাও

তিনি অনেক বড় কবি ছিলেন।" বাঙ্গলা ১৩০১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কবি বিহারীলালের তিরোধান ঘটে।

বিহারীলালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'সারদামঙ্গল কাব্য'। উহা বাঙ্গলা ১২৮১ সালে "আর্য্যদর্শন" নামক পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়া, পরে কাব্যাকারে প্রকাশিত হয়। সারদামঙ্গলের পরে কবি বঙ্গসুন্দরী, সাধের আসন, বন্ধু-বিয়োগ, প্রেমপ্রবাহিনী, নিসর্গ সুন্দরী, মায়াদেবী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ও বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন।

বিহারীলালের সারদামঙ্গল অপূর্ব্ব সুন্দর সুমিষ্ট গীতিকবিতা। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষায় এই জাতীয় কাব্য ছিল না। সারদামঙ্গলে কবি নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিয়াছেন। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে কবির নিজের কথা প্রথম শুনা গিয়াছিল মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে এবং বিহারীলালের কাব্যে। তবে চতুর্দ্দশপদী কবিতা অপেক্ষাও বিহারীলালের কবিতার মধ্য দিয়া কবির নিজস্ব অনুভূতির আনন্দ—কবির লিরিক ভাব অধিকতর সুষ্ঠুভাবে প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের কথায় —"চতুর্দ্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে যে, তাহার বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্ত্তি পায় না।" কিন্তু সারদামঙ্গলে কবির সৌন্দর্য্যোপলব্ধির আনন্দ অপূর্ব্ব গীতোচ্ছ্বাসে উৎসারিত হইয়াছে। তাঁহার সারদামঙ্গলের ভাষা, ছন্দ ও মিল গীতিকাব্যের উপযোগী। মাইকেল, হেম, নবীন প্রভৃতি তাঁহার সমসাময়িক কবিগণ যে ভাষা বা যেরূপ ছন্দ ও মিলবিন্যাস ব্যবহার করিতেছিলেন, বিহারীলালের সারদামঙ্গলের ভাষা, ছন্দ ও মিল তাহা হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহার ভাষা ছন্দ ও মিল কর্ণতৃপ্তিকর ও অভাবিতপূর্ব্ব। সারদামঙ্গলের ছন্দ প্রচলিত ত্রিপদী। কিন্তু কবি এমনই নিপুণতার সহিত উহাকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াছেন যে, এই কাব্যখানির গীতসৌন্দর্য্য অননুকরণীয়, অনবদ্য হইয়াছে।

সারদামঙ্গল কাব্যখানিকে একখানি সমগ্র কাব্যহিসাবে পাঠ করিলে ইহার একটা সুসংলগ্ন অর্থ করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু ইহাকে কতকগুলি খণ্ড-কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে ইহার অর্থবোধ করা দুরূহ হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"সূর্য্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত সারদা-মঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোনো রূপকে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য্যস্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব্ব

রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।" সারদামঙ্গলে কবি যে সরস্বতীর বর্ণনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার সহিত প্রচলিত সরস্বতীর পার্থক্য রহিয়াছে। সারদামঙ্গলে সরস্বতী কখনও দেবী —কখনও জননী, কখনও প্রেয়সী, কখনও কল্যাণরূপিণী। তিনি নানা আকারে, নানা ভাবে নানা লোকের নিকট উদিত হন। কবির সারদা সৌন্দর্য্যরূপিণী,—বিশ্বব্যাপিনী; তিনি Spirit of nature—বিশ্বব্যাপিনী আদর্শ সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী। সৌন্দর্য্যরূপে তিনি জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন এবং দয়া, স্নেহ, প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহঃ বিচলিত করিতেছেন। কবি এই সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীকে তাঁহার অন্তরমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধকের মত তন্ময় হইয়া ভাবাবেগে আত্মবিভোর হইয়া সেই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন। কবি তাঁহার মানসপ্রতিমা সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য ধ্যানস্থ হইয়া দেখিয়াছেন এবং সেই সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর আরাধনা করিয়াছেন তাঁহার মনো-জগতে। মানসলোকে আদর্শ সৌন্দর্য্যজগৎ সৃষ্টি করিয়া অতি সংগোপনে সেইখানেই কবি তাঁহার সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর পূজা সারিয়াছেন। তাই দেখি যে সারদাকে 'সাধকের ধন' বলিয়া উদ্দেশ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন—

মানস-মরালী মম আনন্দ-রূপিণী!
তুমি সাধকের ধন,
জান সাধকের মন,
এখন আমার আর কোন খেদ নাই ম'লে!

সারদা বা কবির সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান কবির মানসলোকে। এই নিমিত্ত বিহারীলালকে মিষ্টিক কবি বলা হয়। মিষ্টিক কবি তাঁহার অন্তরের অন্তস্থলে সৌন্দর্য্যের ধ্যান-ধারণা করেন। উপলব্ধ সৌন্দর্য্যতত্ত্বকে মিষ্টিক কবি সম্যকভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন না। বিহারীলালও তাঁহার সৌন্দর্য্যোপলব্ধি ব্যক্ত করিতে না পারিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

সারদার বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি যে কবির মানসলোকে বিরাজ করিত এবং ধ্যানস্থ অবস্থায় তিনি যে সেই সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর রূপোপলব্ধি করিতেন তাহার কথা সারদামঙ্গলের বহু স্থানেই ব্যক্ত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন—

তোমারে হৃদয়ে রাখি,
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দুই ভাল লাগে।

কবি বারংবার বলিয়াছেন—'হৃদি-কমলবাসিনী কোথা রে আমার' এবং 'মানস-মরালী আমার কোথা গেল বল না!' পাছে এই সাধনার ধনকে হারাইয়া ফেলেন এই আশঙ্কা কবির মনে বারংবার জাগিয়াছে। তাই এই মানসরূপিণী সাধনার ধনকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্ত এবং সেই সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর রূপ প্রতিনিয়ত তাঁহার মনোজগতে ধ্যান করিবার জন্ত কাতরতা প্রকাশ করিয়া কবি বলিয়াছেন—

থাক হৃদে জেগে থাক,
রূপে মন ভোরে রাখ।

সারদামঙ্গল কাব্যখানির মধ্যে কখনও প্রেমিকের ব্যাকুলতা, কখনও অভিমান, কখনও বিরহ, কখনও আনন্দ, কখনও বেদনা, কখনও ভৎর্সনা, কখনও স্তব—এমনি বিভিন্ন অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। দেবী সারদা কবির প্রণয়িনীরূপে উদিত হইয়া বিচিত্র সুখ-দুঃখে শতধারায় কবির সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছেন। সারদামঙ্গলের ভাষা নির্ম্মল, ভাব আবেগময়, কথার সহিত সুরের অপূর্ব্ব মিশ্রণ এই কাব্যের বিশেষত্ব।

বিহারীলালের কাব্যের মূল তত্ত্ব সৌন্দর্য্যপিপাসা এবং ভাববিভোরতা। এইরূপ অতিমাত্রায় ভাববিভোর হওয়ার দরুণ মধ্যে মধ্যে তিনি তাঁহার মানসলোকে যে সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা নিজেই ধ্যান করিয়াছেন, ভাল করিয়া প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। কবি যে সূত্রে 'সারদা-মঙ্গলে'র কবিতাগুলি গাঁথিয়াছেন, সেই সুরের খেই মাঝে হারাইয়া যায়, উচ্ছ্বাস উন্মত্ততায় পরিণত হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বঙ্গসাহিত্যে এই কাব্য প্রেম-সঙ্গীতের সহস্রধার উৎস।

বিহারীলালের Idealism-এ—তাঁহার কবিকল্পনায় একটা বিশেষত্ব ছিল। যে প্রেম ও সৌন্দর্য্যকে বিহারীলাল উপলব্ধি করিবার জন্ত ব্যাকুল ছিলেন, তাহাকে তিনি বাস্তবের সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখিতে পাইয়াছিলেন। যাহা ব্যক্তি-সম্পর্কের বাস্তবপ্রীতিরসে সমুজ্জল, বিহারীলাল তাহাকেই বিশ্বময় দেখিবার প্রয়াসী। ইহাই তাঁহার Idealism-এর বিশেষত্ব এবং ইহাই বাঙলা গীতিকাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ। বিহারীলালে আমরা যে ধরণের ভাবসাধনার পরিচয় পাইয়াছি, তাহা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের বিরোধী। বিহারীলালের ভাবসাধনার মূলে ছিল মর্ত্ত্যমাধুরীলুব্ধ কবিপ্রাণ—মর্ত্ত্যজীবনের মাধুরী পান করিবার ব্যাকুলতাই বিহারীলালে প্রকাশ পাইয়াছিল। যাহা

নাই তাহার উদ্ভাবনা অপেক্ষা, যাহা আছে—যাহা বাস্তব, তাহার দ্বারাই 'আনন্দলোক বিরচণ' বিহারীলালের কাব্যসাধনা ছিল। মর্ত্ত্যজীবনের মাধুরী পান করিবার উদগ্র বাসনা যে ধরণের আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হইয়াছে তাহাই বাঙ্গলা গীতিকাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ। কবির সারদা ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি-সর্ব্বস্ব বিশ্বচেতনা নহে, অথবা শেলীর রূপাতীত রূপময়ী প্রেম-সৌন্দর্য্যের আদর্শ লক্ষ্মীও নহেন। তাঁহার সারদা মানুষের স্বাভাবিক প্রীতি-প্রেমের প্রবাহরূপিণী, বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্য্য ও মানবীয় প্রেমের সমন্বয়রূপিণী। তিনি প্রত্যক্ষে বিরাজমানা, তিনিই বিশ্বরূপিণী।

তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা,
কবির যোগীর ধ্যান
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ—
মানব মনের তুমি উদার সুষমা।

বাস্তবপ্রীতি বা প্রত্যক্ষের প্রতি প্রাণের আকর্ষণ বিহারীলালের ছিল এবং বৈষ্ণব গীতি-কবিগণের সহিত বিহারীলালের কল্পনার বিভিন্নতা এইখানে। বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যসাধনায় একটা গভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণার পরিচয় আছে—শুধু রসসৃষ্টি নয়, প্রাণের গভীরতম পিপাসা-নিবৃত্তির সাধনা আছে। কিন্তু বৈষ্ণব কবির কল্পনায় বিহারীলালের মত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নাই—সে কল্পনা একটি বিশিষ্ট ভাবসাধনার পদ্ধতিকে, একটা সঙ্কীর্ণ সাধনতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়াছে। সে সাধনার মন্ত্র কবিদিগের নিজস্ব কবিদৃষ্টির ফল নহে।

সমগ্র জগৎ ও জীবনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বকীয় কল্পনার অধীন করিয়া, আত্মপ্রত্যয়ের আনন্দে আশ্বস্ত হওয়ার যে গীতি-প্রেরণা তাহাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। বিহারীলালের কল্পনায় এইরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সর্ব্বপ্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উহাই বাঙ্গলা গীতিকাব্যে এক নূতন ধরণের কল্পনাভঙ্গী ও গীতিকাব্য রচনার রীতি সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। কবির নিজের ভাবসাধনা বা উপলব্ধিকে ব্যক্ত করাই পাশ্চাত্য আদর্শের Subjectivity। ভারতীয় সাহিত্যে এই ধরণের কল্পনাভঙ্গী ছিল না। নিজের আত্মগত উপলব্ধি ও প্রাণের সহজ সরল অভিব্যক্তি আমাদের দেশের কাব্যে ছিল না। বৈষ্ণব কবিতা লৌকিক মনোগতির অনুযায়ী সৃষ্ট কাব্য। বৈষ্ণব কবিগণের একটা ভিন্ন দর্শন (Philosophy) ছিল। তাঁহারা বাহিরের একটা তত্ত্বকে কাব্যে রূপ দিয়া গিয়াছেন—একটা বহির্গত আদর্শের অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের কাব্য-

সৃষ্টি। কিন্তু কবির আত্মগত সাধনার দ্বারা কাব্যসৃষ্টি আধুনিক সাহিত্যে আর বিহারীলালেই তাহার প্রথম বিকাশ।

বৈষ্ণব কবিগণ একটা সাধনতন্ত্র মানিয়া কাব্য রচনা করায় তাঁহাদের কল্পনা-ক্ষেত্রের প্রসারটা খুব বেশী ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের উপলব্ধি ছিল গভীর। বিহারীলাল হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরকালে আবির্ভূত আধুনিক কবিদের মধ্যে ভাবগত স্বাধীনতা রহিয়াছে। আধুনিক কবিদের কল্পনা গণ্ডীবদ্ধও নহে—ইঁহাদের ভাব এবং কল্পনা সর্ব্বাশ্রয়ী। কিন্তু কল্পনা সর্ব্বাশ্রয়ী হইলেও ইঁহাদের ভাবগভীরতা বৈষ্ণব কবিগণের অপেক্ষা কম। তাই বৈষ্ণব কবিদের মত ভাবগভীরতা কাব্যে রূপায়িত করিয়া তুলিতে না পারিয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া গাহিয়া গিয়াছেন—

বাঁশরী বাজাতে চাই
বাঁশরী বাজিল কই!

প্রেম, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির গভীর উপলব্ধিতে এবং উহার সুষ্ঠু প্রকাশে বৈষ্ণব কবিগণের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

বিহারীলালের প্রায় সমসাময়িক কালেই হেম নবীনও গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিহারীলালে ভাব, ভাষা ও ছন্দ যেরূপ গীতি কবিতার একান্ত উপযোগী, হেম নবীনের গীতিকাব্যের ভাব, ভাষা বা ছন্দ সেরূপ ছিল না। গীতিকবিতার ভাষা স্বাভাবিক; গীতিকবিতায় খণ্ড খণ্ড অনুভূতি বিবিধ রূপে ও রঙে মণ্ডিত হইয়া উৎসারিত হয়। গীতিকাব্যে ব্যক্তিগত মনোগত স্বাভাবিক ভাব ও কল্পনার প্রকাশ হইয়া থাকে। বিহারীলালে আমরা খাঁটি গীতিকবিতার এই সকল আদর্শের সন্ধান সর্ব্বপ্রথম পাই। কাব্যসৃষ্টিতে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র প্রেরণা বিহারীলালের। কিন্তু হেম নবীনের লিরিক ভাব একটা প্রচলিত আদর্শকে আশ্রয় করিয়া উৎসারিত হইয়াছে,—একটা বহির্গত আদর্শকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা ভাবপ্রকাশ করিয়াছেন। হেম নবীনের কাব্যে কবির মর্ম্মবীণার ধ্বনি যেন পাওয়া যায় না। হেম নবীনে পয়ারের ভঙ্গী থাকার দরুণ উহার দ্বারা Narrative verse বা কাহিনী কাব্য রচনাই তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে। কাহিনী বর্ণনায় উপযুক্ত ছন্দ ব্যবহার করায় তাঁহাদের বর্ণনা, ভাব-ভাবনা এবং আখ্যান কাহিনী-কাব্যের উপযুক্তই হইয়াছে, গীতিকাব্যের উপযোগী হয় নাই। গীতিকাব্যের ছন্দে যে ধরণের অনুরণন বা ঝঙ্কার থাকে তাহা হেম নবীনে

নাই। মধুসূদনেও এই অনুরণনের অভাব। হেম, নবীন যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাও গীতিকাব্যের উপযোগী নহে। কারণ সে ভাষা সংস্কৃত বহুল—সরল, খাঁটি ভাষাই লিরিক ভাব প্রকাশের অনুকূল। যেখানে ভাষার আড়ম্বর অথবা কৃত্রিমতা, লিরিক অনুভূতি সেখানে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইতে পারে না। তাই দেখি, যেখানে যেমন ভাষা ব্যবহার করিলে ছন্দ ও ভাব-ভাবনা এবং অনুভূতির সুষ্ঠু প্রকাশ হইবে, বিহারীলাল সেখানে সেই ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে তিনি কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন নাই।—সারদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের আগন্তই এমনি অনাড়ম্বর ভাষা বর্ত্তমান থাকিয়' কাব্যগুলির অনির্ব্বচনীয়তা সাধন করিয়াছে। যেমন—

সুঠাম শরীর পেলব-লতিকা
আনত সুষমা কুসুম ভরে,
চাঁচর চিকুর নীরদ-মালিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী পরে।

এবং—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুর-নদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।
(বিহারীলাল—বঙ্গসুন্দরী)

মাইকেল অথবা হেম নবীনে এইরূপ ভাষা, ছন্দ ও সুর ছিল না। আধুনিক যুগোপযোগী—আধুনিক আদর্শের গীতিকবিতার উপযোগী ভাষা ও ছন্দের উদ্ভাবক বিহারীলাল। সুন্দর ভাষা কাব্যসৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ এবং বিহারীলালই ইহা প্রথম দেখাইয়া দিয়া যান।

আধুনিক কল্পনাভঙ্গীরও প্রথম উন্মেষ বিহারীলালে। ইংরেজ কবি শেলীর মত আদর্শ-সৌন্দর্য্যের পূজারী হইয়াও মানুষকে যাঁহারা সুন্দর দেখেন বিহারীলাল তাঁহাদেরই একজন। কল্পনায় স্বর্গ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াও তিনি তথায় একবিন্দু সুধা পান নাই। 'সাধের আসন' নামক কাব্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই 'স্বর্গ হইতে বিদায়' মাগিয়াছেন, বলিয়াছেন—

স্বর্গেতে অমৃত সিন্ধু
পাই নাই এক বিন্দু

পৃথিবীর 'অশ্রুকণাটুকু' তাঁহার নিকট 'অমৃত অধিক ধন'। স্বর্গের চিরবসন্ত তাঁহাকে তৃপ্তিদান করিতে অক্ষম—স্বর্গের অনন্ত সুখ তাঁহার প্রাণে ব্যথা জাগায়; বিহারীলালের এই ধরণের কল্পনায় আধুনিকতা। বিহারীলালে প্রথম Subjective Idealism বা স্বানুভাবাত্মক কল্পনায় উন্মেষ। কবি বিহারীলাল তাঁহার নিজের অনুভূতির উপর সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্যকে স্থাপিত করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মত তিনি আপন 'মনের মোহের মাধুরী মিশায়ে' সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি করিয়াছেন। বিহারীলালের কাব্য-সাধনরীতি অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম জীবনের রচনায় বিহারীলালেরই ভাষা ও ছন্দের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং গীতিকবিতা রচনায় একটি সুস্পষ্ট আদর্শ বিহারীলালই বঙ্গসাহিত্যে সর্ব্ব-প্রথম তুলিয়া ধরেন। বিহারীলালই আধুনিক গীতিকবিতা রচনায় অগ্রদূত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। শুধু বাঙ্গলা কেন, তিনি সর্ব্ব দেশের ও সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের শীর্ষে স্থান পাইবার যোগ্য। তাঁহার মত এমন বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভা জগতের আর কোনো দেশের সাহিত্যাকাশকে এমন করিয়া উদ্ভাসিত করিয়া তোলে নাই। তাঁহার প্রতিভা সহস্র-রশ্মিতে দেদীপ্যমান ছিল। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার আলোকসম্পাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের সকল বিভাগ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ—সাহিত্যের যে বিভাগ যখনই তিনি স্পর্শ করিয়াছেন, স্পর্শমণির করস্পর্শে তখনই তাহা স্বর্ণময় হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ছিলেন কবি। তাই তাঁহার সকল সৃষ্টি—এমন কি গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধও কবিত্বধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। কল্পনার আবেগে ও উচ্ছ্বাসে তাঁহার সকল সৃষ্টিই কবিতার মত মনোরম হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের দানে বাঙ্গলা সাহিত্য আজ সুসমৃদ্ধ। বঙ্গভাষা আজ উর্ব্বরা শস্যশ্যামলা। রবীন্দ্রপূর্ব্ব যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে, আর রবীন্দ্রযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রভেদ খুবই সুস্পষ্ট। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের মর্ম্মমূল হইতে তাহার শাখাপ্রশাখায় পত্রপল্লবে যে প্রাণরস সঞ্চারিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই যে তাহার প্রধান অথবা একমাত্র উৎস, এ কথা অত্যুক্তি নহে। রবীন্দ্রনাথ যেন বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তি হইতে শিখর পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিয়া গিয়াছেন। জগতের আর কোনও দেশের সাহিত্যে কোনো একজনের সৃষ্টিশক্তি এতখানি প্রতিভাশালী হইতে দেখা যায় নাই। একমাত্র তাঁহারই প্রভাবে বঙ্গসাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যের আসরে একটি আসন করিয়া লইতে পারিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার মধুর বেণুবীণানিক্বণে আজ বিশ্ববাসী মুগ্ধ ও বিস্মিত।

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা বাঙ্গলার কাব্যসাহিত্যে একটা যুগান্তর আনিয়া দিয়া গিয়াছে। কাব্যসাহিত্যকে বিচিত্রতার আস্বাদন দিয়া তিনি সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন। যে ভাষার কাব্যসাহিত্যে একদিন শুধু ক্ষীণধ্বনি একতারার সুর বাজিত, তাহাতে কবি বীণাযন্ত্রের বিচিত্র সুরলহরী ধ্বনিত করিয়া গিয়াছেন। কোনো একটি বিশেষ বিষয়, সুর বা কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য গড়িয়া উঠে নাই। তাহা যদি উঠিত, তাহা হইলে তাঁহার কাব্য প্রাণহীন হইত, উহা বৈচিত্র্যহীন হইত। গতি এবং বেগ, প্রাণ এবং পরিবর্ত্তন—ইহাই রবীন্দ্র-কাব্যের বিশিষ্টতা। উপমার আশ্রয় লইলে বলা যায় যে, তাঁহার প্রতিভা একটি নির্ঝরের মত—অথবা সূর্য্যের মত বিচিত্র রূপ ও রং সে প্রতিভারশ্মির। নির্ঝর যেমন দুর্ব্বার গতিশীল, নির্ঝরের মত কলকল ছলছল করিয়া কবির প্রতিভা-নির্ঝরিণীও তদ্রূপ বিবিধ বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিতে করিতে বিচিত্র ছন্দে দ্রুততালে উচ্ছ্বসিত আবেগে বিচিত্রতার আস্বাদন দিতে দিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। আর, সূর্য্যের সহিত কবির প্রতিভার তুলনা দিয়াও বলা যায় যে, পূর্ব্বাচল হইতে পশ্চিমাকাশের দিগন্তে বিলীন হইয়া যাইবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যরশ্মি হইতে যেমন বিচিত্র বর্ণসুষমা বিচ্ছুরিত হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভারশ্মি হইতেও সেইরূপ বিচিত্র বর্ণবিন্যাস বিচ্ছুরিত হইয়া তাঁহার কবিতা ও গানে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাই তাঁহার কবিতার বর্ণ বিচিত্র, রূপ বিচিত্র। প্রতিটি সন্ধ্যা কবির কবিতায় নূতন রূপে রূপায়িত—শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ বসন্ত হেমন্ত সকল ঋতু নব

নব রূপে ও রঙে কবির দৃষ্টিতে প্রতিভাত। আর কবিও তাহাতে নব নব রূপ দান করিয়া নব নব সুর ধ্বনিত করিয়া নববেশে সুসজ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সকল রচনাতে বুদ্ধির দীপ্তি পরিলক্ষিত হয়। অধীত বিদ্যা রবীন্দ্রনাথের রচনাকে মার্জ্জিত করিয়াছে—ভাবসম্পদে পরিপূর্ণ করিয়াছে। কবির কবিত্ব-উন্মেষে সহায়তা করিয়াছিল তাঁহার পারিবারিক আবেষ্টন আর বিশ্বপ্রকৃতি। কবির শৈশবে তাঁহাকে বাড়ীর বাহিরে যাইতে দেওয়া হইত না। তিনি একটি ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া ফাঁকে-ফুকরে বাহিরের প্রকৃতির যেটুকু আভাষ পাইতেন তাহাতেই চরিতার্থ হইয়া যাইতেন এবং আকাশ আলো দেখিয়া কল্পনার জাল বুনিতেন। এইরূপে তাঁহার প্রাণ কল্পনা প্রবণ হইয়াছিল। পরে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ভাল করিয়া পরিচয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে কবির কল্পনা অবাধে উৎসারিত হইয়া বাহির হইয়াছিল। সুতরাং বালক-কবির জীবনে প্রকৃতির সামান্য পরিচয়টুকুকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করার উপায় নাই। এ প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল।

পারিবারিক আবেষ্টন কিভাবে কবির প্রতিভা-উন্মেষে সহায়তা করিয়াছিল তাহা এখন বলা আবশ্যক।

ঠাকুর পরিবার জ্ঞানে, বিদ্যায়, অর্থে ও চরিত্রের গুণে সুবিখ্যাত ছিল। ধর্ম্মে-কর্ম্মে, কলায় ও বিদ্যায় এই পরিবারের সবিশেষ খ্যাতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা আর তাঁহার পিতা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বাড়ীতে তাঁহাদের সাহিত্যের আবহাওয়া বহিত—কাব্যপাঠ ও কাব্যালোচনা হইত, সঙ্গীতচর্চ্চা হইত। কবির বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করিতেন—তাঁহার এই "বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষার কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার—বান ডাকিয়া আসিত, নব নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল-উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত"—(জীবনস্মৃতি)। কবি তখন বালক। হয়ত সব সময় কাব্যরস ঠিকমত অনুধাবন করিতে পারিতেন না। কিন্তু বাড়ীর সেই সাহিত্য-স্রোতে মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতেন, তাহারই আনন্দ-আঘাতে কবির শিরা উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত। এইরূপে সাহিত্য, সঙ্গীত, জ্ঞান ও মুক্ত-বুদ্ধির আবেষ্টনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মানুষ হইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাবিকাশে তাঁহার দেশবিদেশ ভ্রমণও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। বিদেশের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার ফলে তাঁহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, চিন্তার খোরাক তিনি পাইয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে ইঁহাদের জমীদারী। জমাদারীর কাজ উপলক্ষ্যে কবি বাঙ্গলার অনেক পল্লীরই বুকে ভ্রমণ করিয়া পল্লীর সৌন্দর্য্য—পদ্মার মাধুর্য্য, পল্লীবাসীর জীবনযাত্রা-প্রণালী প্রভৃতি বেশ ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেশ-বিদেশ ভ্রমণের সুফল কবির জীবনে বেশ ভাল করিয়াই ফলিয়াছিল। কবির বহু ভ্রমণকাহিনীতে এই সকল ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা আছে। তাঁহার বহু গল্প কবিতায় কবির স্বচক্ষে দেখা পল্লীপ্রকৃতির রূপ আর পল্লীজীবনের বৈচিত্র্যের কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এমন একটা সার্ব্বজনীনতা আছে যে জন্য তাঁহার কবিতা ও গান সকল দেশের ও সকল কালের। আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন কবি আবির্ভূত হন নাই, যাঁহার কবিতা রবীন্দ্রনাথের মত এমন করিয়া দেশের ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিয়াছে। শুধু আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে কেন, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেও এইরূপ সার্ব্বজনীন আবেদনমূলক কবিতা বা গান খুব অল্পই আছে। এইখানে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই সার্ব্বজনীনতা পাশ্চাত্য দেশবাসীকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই পাশ্চাত্য সমাজ কবির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ চিরজীবন অক্লান্তভাবে স্বদেশের সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সংখ্যাতীত গান আর কবিতা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল গান আর কবিতার ভিতর দিয়া এত রকম ভাব, এত নূতনত্ব, এত শক্তি আমাদের সাহিত্যে তিনি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন যে, তাহার ফলে বাঙ্গলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উন্মেষ হয় অতি অল্প বয়সেই। ১২৮২ সালে, যখন কবির বয়স ১৪ বৎসর তখনই প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। অল্প বয়সের রচনা হইলেও এই কাব্যে কবির প্রতিভা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। রবীন্দ্রকাব্যে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নিবিড় একাত্মতার যে কথা আছে তাহার উন্মেষ এই 'বনফুল' কাব্যে। উহাই ইউরোপীয় সাহিত্যের Romanticism-এর Interpenetrative affinity between

man and nature। এই অল্প বয়স হইতে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত কবি তাঁহার নানা কাব্যে ও কবিতায় দেখাইয়া গিয়াছেন যে, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানব-সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ—কত নিবিড়।

কবির কবিত্ব উন্মেষের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের কবিতা নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতে করিতে চলিয়াছিল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' নামক কাব্য কবির ২০ বৎসর বয়সের রচনা। সেই সময় পর্য্যন্ত কবির প্রতিভানির্ঝরিণী যেন একটু সঙ্কোচ—বেশ একটু বিষণ্ণতার সহিত মন্দগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাকে কবি 'হৃদয়-অরণ্য' বলিয়াছেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' রচনার কাল পর্য্যন্ত কবির সকল কবিতায়ই যেন একটা বিষাদ-জড়িত হৃদয়ের তীব্র বেদনা অভিব্যক্ত। কারণ বিশ্বের রূপ রস আর বৈচিত্র্যের সঙ্গে কবি তখনও তেমন ভাল করিয়া পরিচয় লাভ করেন নাই। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী কাব্য 'প্রভাতসঙ্গীতে' কবি 'হৃদয়-অরণ্য' হইতে 'নিষ্ক্রমণ' করিয়াছেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' দেখা যায় 'হৃদয়-অরণ্য' হইতে মুক্তির জন্য কবির ব্যাকুলতা—আর 'প্রভাতসঙ্গীতে' হৃদয়-অরণ্য হইতে মুক্তির আনন্দ।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কবি রচনা করেন—বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্ন-হৃদয়—এই কয়খানি কাব্য, আর রুদ্রচণ্ড নামে একখানি নাটিকা। এই সকল রচনাতেই একটা বিষাদের ভাব ফুটিয়াছে।

কিন্তু 'প্রভাত সঙ্গীত' নামক কাব্যে কবি নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। দীর্ঘকাল গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিয়া নির্ঝর যেমন মুক্তি পাইয়া আনন্দচঞ্চল গতিতে প্রবাহিত হইয়া চলে, কবির প্রতিভা, নির্ঝরিণীও সেইরূপ প্রকাশের আনন্দে উচ্ছল হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে 'প্রভাত সঙ্গীতে' এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সকল কাব্যে। 'প্রভাত সঙ্গীতে' কবি মুক্তির আনন্দে একেবারে পাগল, তিনি বলিয়াছেন—

> হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি',
> জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

এই সময় হইতে কবির প্রতিভা-নির্ঝরিণী শতদিকে শতধারে উৎসারিত হইয়া গলিয়া বহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। দুর্ব্বার তাহার গতি, অসীম তাহার আনন্দ-চাঞ্চল্য।

'প্রভাত সঙ্গীত' রচনার পরে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য কাব্য ও কবিতা রচনা করেন। ছবি ও গান, কথা, কাহিনী, কল্পনা, কণিকা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, শিশু,

উৎসর্গ, খেয়া, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, মহুয়া, বনবাণী, পুনশ্চ, পরিশেষ প্রভৃতি কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। কবির জীবনের এক এক সময়কার রচিত কতকগুলি করিয়া কবিতা বা গান একত্রিত করিয়া ঐ সকল কাব্যের এক একটি গ্রথিত হইয়াছে।

প্রত্যেক কাব্যে কবির কল্পনা ও চিন্তাধারার বিশিষ্টতা আছে। আর আছে ক্রমাগত যাত্রা করিয়া চলার আনন্দ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রবীন্দ্রকাব্যের বিশিষ্টতা ও মাধুর্য্যই এই গতি ও পরিবর্ত্তন। কবির প্রায় সকল কাব্য 'অকারণ অবারণ চলা'র আবেগে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রকাব্যে চিরদিনই চলার আনন্দ ঘোষিত হইয়াছে। কবি চিরকাল বলিয়াছেন—"আগে চল্, আগে চল্ ভাই।" নির্ঝর ও নদীর মত ক্রমাগত সীমার বাঁধন অতিক্রম করিয়া কবির প্রতিভা-নির্ঝরিণী অসীমের দিকে যাত্রা করিয়াছে। তাই নির্ঝর ও নদী গতি-উন্মুখ কবি-চিত্তের প্রতীক—বলাকা কবির সমধর্ম্মী—বলাকার পক্ষধ্বনির মধ্যে তিনি শুনিয়াছেন—"হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনোখানে"। গতি এবং পরিবর্ত্তনের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অসীমের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিবার জন্য কবি চিরদিনই উন্মুখ। তাই কবির 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' নামক কবিতায় দেখি যে সীমাবদ্ধ কবিমন সীমার বাঁধন ভাঙিয়া নির্ঝরের মত অনন্ত অসীম পথে যাত্রা করিতে উৎসুক হইয়া বলিয়া উঠিয়াছে—

আমি যাব—আমি যাব—কোথায় সে কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ গাহিব করুণা গান।
উদ্বেগ অধীর হিয়া সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ!

কবির যাত্রা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। একথা তিনি অনেকবার তাঁহার অনেক কবিতাতেই বলিয়াছেন। জীবনে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসা সত্ত্বেও কবির যাত্রা স্থগিত হয় না। তিনি একাকী নূতন নূতন পথে যাত্রা করিতে তখনও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অজানা অসীমে কবিচিত্ত পক্ষ বিস্তার করিয়া চলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,

যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জাগিছে মৌন মন্তরে,
দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

মরুভূমির ঝড় যেমন অবাধে প্রবাহিত হয়, কবিও তেমনি উদ্দাম গতি লাভ করিয়া ক্রমাগত যাত্রা করিতে চাহেন—

ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি',
হৃদয় তলে বহ্নি জ্বালি' চলেছি নিশিদিন,
বরশা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ,—
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।

পরিবর্ত্তনহীন বৈচিত্র্যবিহীন জীবন কবির কাছে দুঃসহ। তাই তিনি বলিয়াছেন—

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।

কবি চিরযুবা। সেইজন্য তিনি সুখে শান্তিতে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। নিজে যেমন তিনি অসীমের উপলব্ধির জন্য ক্রমাগত ভাসিয়া চলিয়াছিলেন, তেমনি এইভাবে ভাসিয়া ক্রমাগত যাত্রা করিয়া চলিবার জন্য তিনি সকলকে তাঁহার নিমন্ত্রণও জানাইয়াছিলেন।—

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙ্‌বারই আনন্দে রে।
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চল্‌বারই আনন্দে রে

আমাদের জীবনের চারিদিকে অনবরত বাধা-বিপত্তির অচলায়তন গড়িয়া উঠিয়া আমাদের গতির বাধা সৃষ্টি করে। কবি সেই বাধা-বিপত্তি কোনোদিনও সহ্য করিতে পারেন নাই। অচলায়তনের গণ্ডী ভাঙিয়া তিনি আমাদিগকে ক্রমাগত চলিবার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

কবির প্রতিভা-নির্ঝরিণী 'প্রভাত সঙ্গীতে'র যুগ হইতে ক্রমাগত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাত্রা করিয়াছে—বলাকা পূরবী মহুয়ার যুগেও সে প্রতিভা-নির্ঝরের যাত্রা স্থগিত হয় নাই। 'বলাকা' নামক কবিতায় কবি নিশ্চলের অন্তরে পর্য্যন্ত পুলকের সঞ্চার ও বেগের আবেগ শুনিতে পাইয়াছেন।—

পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

অন্যত্র —

এই বন চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।

কবি বলেন এই সম্মুখধাবনের উদ্দেশ্য মুক্তি—

আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধ্‌বে।
রৈল যারা পিছুর টানে
কাঁদ্‌বে তারা কাঁদ্‌বে॥

এই সম্মুখধাবনের উদ্দেশ্য মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতে পৌঁছানো।—

মৃত্যুসাগর মথন করে
অমৃতরস আন্‌ব হরে।

কবি যখনই বিরাম অথবা বিশ্রামের আয়োজন করিয়াছেন, তখনই অভয় 'শঙ্খ' তাঁহার কাছে গতির বাণী আনিয়া দিয়াছে। সেই শঙ্খধ্বনি কানে যাওয়াতে কবির বিরাম বিশ্রাম ঘুচিয়া গিয়াছে—একটা গতির উন্মাদনায় কবির চিত্ত পুনরায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তখন কবি নিজে ধাবিত হইয়া চলিতে চাহিয়াছেন, অন্য সকলকেও ধাবিত হইয়া চলিবার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাইয়াছেন—

লড়্‌বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্‌না গেয়ে,
চল্‌বি যারা চল্‌রে ধেয়ে
আয় না রে নিঃশঙ্ক !

কবি অনবরত নূতন সমুদ্রতীরে তরী লইয়া পাড়ি দিবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—পুরানো সঞ্চয় লইয়া কারবার করিতে তিনি চাহেন নাই কোনোদিন।—

নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি—
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হলো শেষ,
পুরাণো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।

স্থিরতাকে ধিকার দিয়া কবি নূতনকে চিরদিন বরণ করিতে সমুৎসুক ছিলেন। পরিবর্ত্তনের গতির দ্বারা কবি তাঁহার মনকে নানান্ সম্পদে ভূষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কারণ চলার অমৃতরস পান করিয়াই মনের যৌবন বিকশিত হইয়া উঠে।

পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।

সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে এই জিনিসটি আমাদের দৃষ্টি খুব বেশী করিয়া আকর্ষণ করে যে, তাঁহার কবিচিত্ত ক্রমাগত বিচিত্রতার সন্ধানে অসীমের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। কবির অনন্ত-প্রসারী প্রগতিশীল মন তাঁহার সকল কাব্যের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ক্রমাগত যাত্রা করার এই যে বাণী রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে উৎসারিত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার কাব্যের বিশেষত্ব এবং মূলকথা।

কবির প্রতিভা-নির্ঝরিণীর এই গতিশীলতার জন্যই তাঁহার কাব্যসৃষ্টি হইয়াছে বিচিত্র। তিনি মানবের অনুভূতিকে, জীবনকে নব নব রূপ ও রূপক দিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আধ্যাত্মিক ভাবের গান ও কবিতা রচনা করিয়াছেন,

অপূর্ব্ব প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টির বৈচিত্র্য বর্ণনা করিয়া শেষ করা দুঃসাধ্য।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রকৃতি-সম্বন্ধীয় কবিতা বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্র-পূর্ব্ব যুগে কবিদিগের নিকট প্রকৃতি ছিল জড়জগতেরই অঙ্গবিশেষ—তাঁহারা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে একটা প্রাণস্পন্দন বা বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের যে একটা আত্মীয়তার যোগ আছে সে জিনিসটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু জলস্থল আকাশের সঙ্গে একটা নিবিড় একাত্মতা ও নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া বিলাইয়া দিবার ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতার বিশেষত্ব। এই জিনিসটুকু রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কবিতায় অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দান করিয়াছে—তাঁহার সৃষ্টিকে অন্য সকল পূর্ব্বজ কবিগণের সৃষ্টি হইতে পৃথক করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতিকে আত্মীয়রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন—

স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।

তিনি আরও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, প্রকৃতির সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা কেবল এ যুগের নহে, এ সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের—'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় কবির এ অনুভূতি বারংবার ব্যক্ত হইয়াছে।

"——আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগ-যুগান্তর ধরি'—" —বসুন্ধরা

রবীন্দ্রনাথের দেশ-সম্বন্ধীয় কবিতাসমূহও বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। দেশপ্রীতিমূলক কোন কবিতাতেই কবির এতটুকু দীনতা বা হীনতা প্রকাশ পায় নাই। তিনি স্বদেশকে মহামানবের মিলনভূমিরূপে অনুভব করিয়াছিলেন —কবির 'ভারত তীর্থ' নামক কবিতাটি তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ—

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।

এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি' মন, ধরো হাত সবাকার ;
এস হে পতিত হোক্ অপনীত সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।

শত অত্যাচারে বাঙ্গালী নিপীড়িত হইতেছে, তথাপি তাহারা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া সেই অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া কবির চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশের অত্যাচারপীড়িত জনগণকে নূতন চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া কবি দৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে !
যার ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"—

বাঙ্গলাকে আর বাঙ্গলার পল্লীকে কবি বড় ভালবাসিতেন। বঙ্গভূমির প্রতি ভালবাসা ব্যক্ত করিয়া তিনি বারংবার বলিয়াছেন—

"আমার সোনার বাঙ্‌লা
আমি তোমায় ভালবাসি,—
চিরদিন তোমার আকাশ,
তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

এবং

"তোমার ধূলামাটি অঙ্গে মাখি'
ধন্য জীবন মানি।"

ভক্তিপূর্ণ চিত্তে কবি দেশ-মাতাকে প্রণাম জানাইয়া বলিয়াছেন—

নমো নমো নমঃ সুন্দরি মম জননী জন্মভূমি।
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি॥

বঙ্গদেশে জন্মিয়া কবি নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন—

"সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে ;
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে !"

মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন আন্দোলন সূচিত হইবার বহু পূর্ব্বে আমাদের কবি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশের উচ্চ-নীচ কৃত্রিম ভেদাভেদ ভুলিতে হইবে। নহিলে স্বাধীনতা-লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এই ভাবটি প্রকাশিত হইয়াছে কবির 'অপমান' শীর্ষক কবিতায়। কবি তাঁহার দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

কবির চক্ষে মরণের ভীষণতা লোপ পাইয়াছে। মরণ তাঁহার নিকট বরণীয়। রবীন্দ্রপূর্ব্ব যুগের কোনো কবি মরণকে বরণীয় মনে করিয়া এমন করিয়া বলিতে পারেন নাই—

'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।'

কবির চিত্তে মরণের রুদ্রতা লোপ পাইয়াছে। তাই কবি গাহিয়াছেন—

"অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ !"

কবি মৃত্যুকে আনন্দদূতরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে নির্ভয়ে আহ্বান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

"মৃত্যু, লও হে বাঁধন ছিঁড়ে,
তুমি আমার আনন্দ।"

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে যেমন নূতন করিয়া আমাদিগকে দেখিতে শিখাইয়া গিয়াছেন, তেমনি তিনি আমাদের দেশের তরুণদিগকে যে বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন তাহাও নূতন, তাহাও মূল্যবান—দেশের পক্ষে কল্যাণকর।—

"বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত-চিত্তে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

সহায় মোর না যদি জুটে,
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।"

কবি বলিয়াছেন—"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"

যাহারা মানুষ হইয়া জন্মিয়া জড় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, তাহাদের আঘাতে আঘাতে কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রণোদিত করাই হইবে তরুণের আজন্মের সাধনা ও ব্রত। দুঃখ-বিপদকে তাহারা যেন ভয় না পায়। তাই নব-বৎসরে কবি তরুণদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

"ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার—
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার;
সে তো নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী,
ঘরছাড়া দিক-হারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী।"

ইংরেজ কবি সেক্সপীয়ার যেমন বলিয়াছেন, "The fire in the flint does not show till it be struck"—আমাদের কবিও আমাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছেন যে দুঃখ-বিরোধ বিপদ-মৃত্যুর বেশেই মানব-জীবনে কল্যাণ ও উন্নতি দেখা দেয়। দুঃখকে ভয় করিয়া আরাম ও বিলাসে লালিত হইয়া উন্নত-জীবনের আস্বাদন পাওয়া যায় না। দুঃখকে জয় করিয়া উন্নত-জীবনের রসাস্বাদন করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের এই সকল বাণী এবং তাঁহার কাব্যের মাধুর্য্য অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের জাতীয়-জীবনে প্রভাব বিস্তার করিয়া কল্যাণ প্রসব করিতে

থাকিবে। তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা—সত্যের পুরোহিত। যে সত্য তিনি উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা কোনকালে পৃথিবীবক্ষ হইতে অবলুপ্ত হইবে না।

কবিতার মত রবীন্দ্রনাথের গান বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। তাঁহার রচিত গানের সংখ্যা প্রায় দুই হাজারের কাছাকাছি। ভাবের দিক দিয়া তাঁহার গানগুলি ত অপূর্ব্বই। কিন্তু শুধু সংখ্যার দিক্ দিয়া দেখিলেও দেখা যায় যে, পৃথিবীতে আর কোনো দেশে আর কোনো সঙ্গীত-রচয়িতা আজ পর্য্যন্ত এত অধিক সংখ্যক গান রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। বসন্ত-কালের অপর্য্যাপ্ত কুসুমের মত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ফুটিয়া উঠিয়া বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংখ্যা প্রচুর। ঐ অসংখ্য গানের প্রত্যেকটিতে কবি বিশেষ বিশেষ ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার গান বিচিত্রতার সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, স্বদেশী গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, গীতাঞ্জলির আধ্যাত্মিক গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা ভিন্ন প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা প্রভৃতির অনুভূতিও তাঁহার গানে ভাষা পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের গানের বিশেষত্ব, উহার মধ্যে কথা ও সুরের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। তাঁহার এক শ্রেণীর গানের কথা বা ভাবটিই প্রধান—সুর সেই কথাকে একটা প্রবহমান ধারাগতি দান করিয়া বহাইয়া লইয়া চলে। আর এক শ্রেণীর গানে সুরটিই প্রধান—কথা নহে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর গানের সুরের মধ্যে এমন একটি মাধুর্য্য আছে যাহার জন্য সুরহীন ঐ গানগুলি মাধুর্য্যহীন বলিয়া মনে হয়। সুর না থাকিলে রবীন্দ্রনাথের অনেক গান নেভানো প্রদীপের মত।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব ও ভাষাসম্পদ্ যেমন অপরূপ, সুরও তেমনি অনির্ব্বচনীয়। তাঁহার গানে সুর ও ভাব ভাষার যেন হরগৌরী মিলন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটি গানে কবি ভাব অনুযায়ী সুর দান করিয়া গানগুলিকে এমন প্রাণবান্ করিয়া তুলিয়া গিয়াছেন যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিলে মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে ছন্দ, আর আছে ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্য্য। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতে এ সবের উপরেও আছে সুর। কথার

ভাব ভাষা ও ছন্দের সহিত সুরের অনির্ব্বচনীয়তা মিলিত হইয়া তাঁহার গান এক অপরূপ মধুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাই বলিতে হয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা সুন্দর—কিন্তু তাঁহার গান সুন্দরতর।

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এ জিনিসটি চোখে পড়িবে যে, সাহিত্যক্ষেত্রে কোন একটি নূতন ভঙ্গী বা আদর্শের প্রবর্ত্তন করিলেই একজন সাহিত্যিক যুগপ্রবর্ত্তক রচয়িতা বলিয়া সমাদৃত হন। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে যে কত নূতন নূতন ভঙ্গী, কত নূতন নূতন রসসৃষ্টির আদর্শ রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার ভাষার কারিগরী অপূর্ব্ব, তাঁহার উদ্ভাবিত ছন্দ বা ধ্বনিমাধুর্য্য বিচিত্র ও বহু প্রকারের। কিন্তু শুধু প্রকাশ-ভঙ্গীতে রবীন্দ্রসাহিত্য অনির্ব্বচনীয় নহে। বিষয়-বৈচিত্র্যে, কল্পনার ঐশ্বর্য্যেও তাঁহার কাব্য অনন্যসাধারণ। এত বিচিত্র সৃষ্টি না করিয়া তিনি যদি শুধুমাত্র প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা অথবা দেশ-সম্বন্ধীয় কবিতা কিংবা সৌন্দর্য্য-বিষয়ক কবিতা রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও বাঙ্গলার কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইতেন। কারণ বিশ্বপ্রকৃতি, দেশ অথবা সৌন্দর্য্য সকল বিষয়ই রবীন্দ্রকল্পনায় নূতন ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সকল সৃষ্টিতেই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর, কল্পনাভঙ্গীর ও প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

অল্প কথায় রবীন্দ্রকাব্যের নিরিখ নির্ণয় করা অসম্ভব। এক কথায় তাঁহার প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে বলিতে হয় যে, তিনি ছিলেন সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসক। তিনি জগৎ ও জীবনকে অপরিসীম শ্রদ্ধার সহিত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং সত্য, শিব ও সৌন্দর্য্যের পাদপদ্মে তাঁহার কাব্যরচনার মধ্য দিয়া বিনম্রচিত্তে প্রণতি জানাইয়া গিয়াছেন।

সমাপ্ত

নিদর্শনী